ভূমিকা।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইল। কিন্তু উপযুক্ত সময়ের মধ্যে প্রকাশ করিতে না পারায় বিশেষ লজ্জিত হইতেছি। এই বিলম্বের কারণ অনুসন্ধান করা নিষ্ফল, এখন কেবল সাধারণের নিকট ত্রুটী স্বীকার করাই আমাদিগের একমাত্র পন্থা।

বিবরণীর অনেক স্থানে লিপিকর-প্রমাদ দৃষ্ট হইবে। সকলগুলি সংশোধন করা অসাধ্য; কতিপয় গুরুতর ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলাম। পাঠকগণ পাঠের পূর্ব্বে সংশোধন করিয়া লইবেন। দুই একটী ভ্রম শুদ্ধিপত্রে প্রদর্শন করা গেল না। একারণ এই স্থলেই তাহার উল্লেখ করিলাম।

৷৷০ আনা পৃষ্ঠায় "সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা" শীর্ষক অভিভাষণ মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ১৸০ পৃষ্ঠায় প্রথম প্যারার পর শোক প্রকাশ প্রস্তাবের পূর্ব্বে সন্নিবেশিত হইবে। আর ২৷৴০ পৃষ্ঠার প্রথম প্যারার পর 'পঞ্চম প্রস্তাব' সন্নিবেশিত হইবে। এইস্থলে "প্রস্তাবক বলেন" এই দুইটী কথার পূর্ব্বে পঞ্চম প্রস্তাবটী পড়িতে হইবে। যথা—

"পঞ্চম প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী উত্থাপন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম-এ সমর্থন করেন,—"বাঙ্গালা ভাষার শব্দ তত্ত্ব সংগ্রহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জেলার বিবিধ উপবিভাগে প্রচলিত বাঙ্গালার সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদের ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি যোগে রূপভেদ সঙ্কলনের ভার গ্রহণের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন শাখা পরিষৎ ও অন্যান্য সাহিত্য-সমিতিকে অনুরোধ করা হউক।"

রঞ্জন-শিল্প প্রবন্ধের ইংরেজী ও বাঙ্গালা অংশে বহুভ্রম রহিয়া গেল, তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টাও করিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। এই প্রবন্ধটী যেরূপ শিক্ষাপ্রদ, তাহাতে এ প্রবন্ধের ভুল পাঠকের চক্ষে বড়ই বাজিবে। কিন্তু আমরা উপায়হীন। যদি কখনও বিবরণীর দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তখনই এই আক্ষেপ দূর হইতে পারে, নচেৎ আর সম্ভাবনা নাই।

সম্মিলনে আঠারটী প্রবন্ধ পঠিত ও গৃহীত হয়, তন্মধ্যে একটী অবাধ্য বালকের ন্যায় কোথায় লুকোচুরি খেলা করিতেছে, এতক বাড়ী ফিরিয়া আইসে

নাই। অনেক চেষ্টাতেও তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। অবশিষ্ট সতের-টীর মধ্যে—।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ১০টী
সাহিত্য বিষয়ক ৪টী
ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক ২টী
এবং ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ১টী

দেখা যাইতেছে যে, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই অধিক সংখ্যক। কেহ কেহ সাহিত্য-সম্মিলনে বিজ্ঞানের প্রাধান্য সহ্য করিতে পারেন না। আমরা বাগ-বিতণ্ডা করিতে বিশেষ নারাজ, কিন্তু সাহিত্য যদি সমাজের মঙ্গলের প্রধান হেতু হয়, তবে তাহা লইয়া আর ক্রীড়া করা চলে না। জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় চরিত্র গঠনের প্রধান উপকরণ সাহিত্য। যে সাহিত্য আলোচনায় এ উদ্দেশ্য অধিকতর রূপে সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে আলোচ্য। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার ইচ্ছা নাই, ভগবান এ জাতিকে উত্তরোত্তর রসিক হইতে সাধকে পরিণত করুন, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা। রস পরিহার্য্য নহে, রস সাধনার অঙ্গ স্বরূপ ব্যবহৃত হউক, তাহার পরিচর্য্যা করুক,—আর যেন প্রভুত্ব করিতে না পায়।

রাজসাহী,
তারিখ ১০ই আষাঢ়,
১৩১৭ সাল।

শ্রীশশধর রায়।
শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।
সম্পাদক।

সূচী পত্র।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৵০	৭	জগদীশ নাথ	জগদীন্দ্রনাথ
"	৯	রাজসাহী	রাজসাহীতে
"	"	ও	;
৶০	১২	উহার	উহা
"	২৬	রামপুর বোয়ালিস্থ	রামপুরবোয়ালিয়াস্থ
।/০	৮	প্রজামণ্ডিত	প্রভামণ্ডিত
"	১০	যে	সে
।৵০	৭	ধয়ী	ধোয়ী
"	৩০	নিবায়	নিবাস
।৶০	১২	অভ্যর্থনায়	অভ্যর্থনায়
"	১৪	অনুপ্রাণিত	অণুপ্রাণিত
॥৵০	১৯	রানমোহন	রামমোহন
"	২২	অনেক	অনেকে
৸০	৬	প্রাচীর	প্রাচীন
৸৶০	৩	Test Book	Text Book
"	১৪	যুগবকগণের	যুবকগণের
১৴	১৪	বিদ্বান	কি বিদ্বান
১/০	১৩	তুলিয়া	ভুলিয়া
১/০	২০-২১	তরুকোটরে ও গিরিগহ্বরে অনন্ত পরিবর্ত্তন-শীল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে জ্ঞান পিপাসুর যে কত প্রকার সম্বন্ধ	জ্ঞান-পিপাসুর যে কত প্রকার সম্বন্ধ

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৸০	১	সভাপতির বক্তৃতা	সভাপতি নির্ব্বাচন (৫পংক্তির পর, ॥০ পৃষ্ঠা হইতে ১৷৶০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা বসিবে। ভ্রমবশতঃ পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছে।
"	৬	সত্ত্যেও	সত্ত্বেও
১৸৴০	১২	তিবিরনাশিনী	তিমিরনাশিনী
১৸৵	৺৪	তাঁহার	তাঁহারা
"	১৮	বোধিসত্ব সেন	বোধিসত্ব সেন
১৸৶০	৪	হইতে পারে	হইতে পারে না
"	৩০	উত্তর হইতে	উত্তর বঙ্গ হইতে
২৲	৪	রিতান্তই	নিতান্তই
"	১৭	অমি	আমি
২৴০	১০	লেঁাড়ার	গেঁাড়ার
২৶০	২	অনর্য্যে	অনার্য্য
"	১১	আধিপাত্যর	আধিপত্যের
২।৴০	১২-১৩	(এই দুই ছত্রের মধ্যে পঞ্চম প্রস্তাব বসিবে কিন্তু ভুলক্রমে মুদ্রিত না হওয়ায় ভূমিকায় তাহা প্রদত্ত হইল।	
২।৶০	২	হইয়াছেন	হইয়াছে
২॥০	১২	ইতিহাসের পরীক্ষায়	ইতিহাসের পরীক্ষা
"	১৩	মধ্যেপরীক্ষায়	মধ্য-পরীক্ষায়
"	১৬	বরিব	করিব
২॥৴০	৭	ঘোসে	ঘোষে
"	১৯	চন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়
২॥৶০	১০	শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়	শ্রীগোবিন্দ রায়

পৃষ্ঠা।	পংক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২৸৵৹	২৯, (ফুটনোটে)	এই প্রবন্ধ	* এই প্রবন্ধ
২৸৶৹	১৬	শেষে	শেষ
,,	২০	করিতে	করিতেই
,,	২৩	তাঃ	তাঃ ২০শে পৌষ, ১৩১৬সাল।
২৸০	২৯	সৈয়দ্র তকজ্জল	সৈয়দ তফজ্জল
,,	৩২	জগদীশচন্দ্র	জগদীশ্বর
২৸৵০	১৮	রজনীকান্ত	রমণীকান্ত
,,	২৯	শরদিন্দুনাথ রায়	শরদিন্দু রায়
	২৩	সারদাচরণ মজুমদার।	সারদাচরণ মজুমদার-নওগাঁ।
২৸৶০	১৫ (প্রথম কলম)	রহিম মজ্জদা নিশীন	রহিস সজ্জদা নিশীন
২৸৶০	৩	বহাদুর	বাহাদুর
,,	,,	কশিমবাজার	কাশিমবাজার
৩৲	১৮	মৈলনসিংহ	মৈমনসিংহ
২	২৯	হউন বা হউন	হউন বা না হউন
৫	হেডিং	রাজশাহীর	রাজসাহীর
,,	৪	লইতেই	হইতেই
,,	১২	সানাতিন্	সালাতিন্
৬	৩	ভাব	ভার
,,	২৩	পুনরক্তি	পুনরুক্তি
,,	,,	কৱি	করি
৮	১৮	পার্শ্বে	পার্শ্বের
,,	২৭	লইতে	হইতে
৯	১৯	বাথার	বাধার
১৩	১৩	রহোল্লাসাদি	রহস্যোল্লাসাদি
১৬	১৭	কেশবী	কেশরী
১৭	২৮	সথন	তথন
২৪	৮	অরতারণা	অবতারণা
২৫	১২	রহস্তাস	রহস্যোল্লাস
২৬	৯	ককিল-কুজিত	কোকিল-কূজিত

পৃষ্ঠা।	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
২৬	১৩	সমাজতত্ত্বগণ	সমাজতত্ত্বজ্ঞগণ
"	১৬	সিতহাস্যের	স্মিতহাস্যের
২৭	৭	ক্ষেত্রেই	ক্ষেত্রে
"	৮	অন্ত	অন্ত
"	২৬	প্রশাখা	শাখা প্রশাখা
২৮	২৩	শাস্ত্রে	শাস্ত্রে
২৮	৩০	ঋগ্বেদে	ঋগ্বেদে
২৯	৭	যইতে	হইতে
"	১০, ১৯, ২৪	ঋগ্বেদ	ঋগ্বেদ
"	২৫	প্রকৃত	প্রকৃতি
৩০	২	ঋগ্বিদের	ঋগ্বেদের
৩২	৩৭	সত্বা	সত্তা
"	৩৯	প্রাণতেই	প্রাণেতেই
৩৩	১৭	এজতে	এজগতে
৩৪	২৭	মহে	নহে
৩৫	১৩	বুঝাইতেছে	বুঝাইতেছে না
"	১৬	ব্রহ্মেরই	ব্রহ্মেরই
"	২৯	সূক্তের	সূক্তে
৩৬	২	সূক্তে	মন্ত্রে
৩৬	৬	জলের	জলে
"	১৪	সম্বন্ধেও	সম্বন্ধেও
"	১৭	করিল	করিব
"	১৮	জাতীয়	জড়ীয়
"	২৬	সুবর্ণ	সুপর্ণ
"	২৮	ব্রহ্মসত্তা	ব্রহ্মসত্তা—অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতির মধ্যে অনুস্যূত। সুতরাং
৩৭	২২	কার্য্যকারে	কার্য্যাকারে
"	৩১	ব্রহ্মমত্তা	ব্রহ্মসত্তা

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৩৯	২০	নাই।	নাই?
৪০	১০	সিদ্দান্ত	সিদ্ধান্ত
„	২০	আছে।	আছে?
৪২	২	বহিয়া	রহিয়া
৪৩	১	বুদ্ধিবৃদ্ধির	বুদ্ধিবৃত্তির
৪৬	১২	যখন যখন	যখন
৪৭	২১	কেহ পড়িবে।	কেহ পড়িবে না।
„	২৪	অসাধারণ	অসাধারণ
„	২৯	প্রাচীন কাল	প্রাচীন কালে
৪৯	২৫	বাড়ী বরফের পর্য্যন্ত	বাড়ী পর্য্যন্ত বরফের
৫৪	১৮	তাহার	তাহা
৬০	৪	পমস্ত	সমস্ত
৬১	৬	চরিত্রোৎকষ	চরিত্রোৎকর্ষ
৬২	১	বিপুপ্ত	বিলুপ্ত
„	১৪	নাই নাই।	নাই।
„	২৮	বাহদুরী	বাহাদুরী
৭১	১৮	অধিকায়ের	অধিকারের
৭২	২৬	সমুলমানি।	মুসলমানি
৭৪	৮	মানি	মানে
„	৯	বুদ্ধিক্ষেত্রে	যুদ্ধক্ষেত্রে
„	১৩	জম্মের	জঙ্গের
„	২৫ (ফুটনোট)	এঞ্জিল	এঞ্জিন
„	২৭ „	সমুহের মড্যে	সমূহের মধ্যে
„	২৮ „	হহতে	হইতে
৭৫	২৭	শস্থ সমূহকে	শাস্ত্র সমূহকে
৭৭	২২	মাতৃভারারূপে	মাতৃভাষারূপে
„	২৪ (ফুটনোট)	importaut	important
„	২৬ „	দীনেশত্র	দীনেশচন্দ্র
৭৮	২৯	দবকারী	দরকারী,

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৮০	৬	চন্দালোহপি	চণ্ডালোহপি
৮৫	৭,৮	আলাওনের	আলাওলের
৮৬	৫	চম্পাগাঞী	চাম্পাগাজী
৮৮	৯	সুললিত পদ	সুললিত যে পদ
"	১৫	বালিঘাট-নিবাসী	বালিঘাটা-নিবাসী
"	২০	এই মুর্শিদাবাদবাসী	মুর্শিদাবাদবাসী
"	২১	প্রচলিত হইল না ;	প্রচলিত হইল ; অথচ তাঁহার জন্মভূমিতে হইল না।
৮৯	২৭	নামাভেদ	নামভেদ
৯৮	২২	সাহাবদি উদ্দীন	সাহাবদ্দীন
"	২৮(ফুটনোট)	মুসলমনে	মুসলমান
১০০	২৪	'নির্ঘ্যয়তত্ত্বের'	'নির্য্যাসতত্ত্বের'
১০২	১	লিখিত হয়, ইহাতে	লিখিতে হয়, ইহাও
১০৪	৫	ও সকলও	ও-সকলও
"	৬	পাবে	পারে
"	৮	মাতবের	মানবের
১০৬	১৫	ত সকলে	মত সকলে
"	২৩	বিগাগের	বিভাগের
১০৭	২৪	কয়েশীয়	ককেশীয়
১০৯	২২	প্রশান্ত	প্রশস্ত
১১৪	৫	ঐতরেয়া ব্রাহ্মণ	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
"	২৫	সিন্ধুসৌধীরা	সিন্ধুসৌবীরা
১১৬	২৭	গঙ্গাস্রোত	গঙ্গাস্রোতে
১১৭	১০	সুক্ষা সুক্ষস্য	সুক্ষ্ম সুক্ষ্মস্য
১১৯	২	বৈদিকের	বৈদিক
"	২৩	দেবতায়	দেবীর
১২১	৪ (ফুটনোট)	গুরু মহাশয়	শুক্ল মহাশয়
"	৭	বাজসাহী	রাজসাহী

পৃষ্ঠা।	পংক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১২২	৪	সুক্তবৈবচ	সুক্তবৈবচ
১২৩	২৭	শব্দায়ম্বর	শব্দাড়ম্বর
১২৪	১,৪	ঐ	ঐ
,,	৬	রাড়ি	রাঢ়ি
,,	১৩	পাচজন	পাঁচজন
১৩৬	১৪	১৪+ক	১৪×ক
১৩৯	১১	রসায়ণের	রসায়নের
,,	২৩	তিমিবে	তিমিরে
১৪১	১৯	উদ্বাবন	উদ্ভাবন
,,	২৯	Woholer	Wöhler
১৪২	৫	Bertholet	Berthelot
১৪৪	২১	বলিয়া	বলিয়া
১৪৭	২৪	ভাব	ভার
১৫২	৪	রহিয়াছে	রহিয়াছে
,,	২২	অপর্থিব	অপার্থিব
১৫৪	১	গ্রহদিগেরে	গ্রহদিগের
,,	১২	একটা একটা মস্ত	একটা মস্ত
,,	১৪	জ্যেতিষের	জ্যোতিষের
,,	২৮	নিটেল	নিটোল
১৫৭	১৮	madant	mordant
,,	২৩	alumal-acetale al-sulphat cr—acetal, cr-chloride,	alum, Al-acetate, Al-sulphate, cr—acetal, cr-chloride,
,,	২৪	fe-acetate,	Fe-acetate,
,,	২৪	Zin, chloride cr-Sulphate,	Zin chloride, cr-sulphate,
,,	২৫	Emetic acid pot--Tartrate	Emetic, acid pot-Tartrate,
১৫৮	৬	উদ্ভিজ্জরং	উদ্ভিজ্জরংএর

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৫৮	৮, ৯, ১০	madda	madder
„	১১, ২৩	al-oxide	Al-oxide
„	১৩	morida	morinda
„	১৪, ১৫, ২০	madant	mordant
১৫৯	৬	Hydro-sulphite	Hypo-sulphite
১৬০	২২	alizarie	alizaride
১৬১	১৫	ব্যবস্থায়	ব্যবহার
„	২৮	প্রতিদ্বন্দিতায়	প্রতিদ্বন্দ্বিতায়
১৬২	২১	Blasic	Basic
„	২৮, ২৯	fibroin	fibrine
১৬৩	২৭	ইয়া	হইয়া
৬৪	১০	Aniline brack	Aniline black
„	১৩	রং হইবার	রং ইহার
„	১৬	পাহতে	পাইতে
„	১৯	চাসের	চাষের
১৬৬	২	Fibroin	Fibrine
„	৩	ফুটন্ত জল গরম	ফুটন্ত গরম জল
„	৬	নিয়া	গিয়া
„	১৬	২য়	হয়
„	১৮	$(H_2\ 5o_4^{"})$	$(H_2\ So_4)$
„	২০	madant	mordant
১৬৮	৯,২১	প্রতিদ্বন্দিতায়	প্রতিদ্বন্দ্বিতায়
১৭১	২০	হইলে	হইতে
১৭৩	২২	আমারে	আমাদের
১৭৮	১	আর চাকা	আর এক চাকা
১৮১	১২	রহস্তে	রহস্য
„	২২	তরূপ	তদ্রূপ
„	২৬	করাও নহে	করাও সঙ্গত নহে।
১৮৩	১৬	তাহা	তাহার
১৮৭	৮	বে	সে
„	১১	তাহারা	তাহা
„	১৫,১৮	tracts	Tracts
„	১৭,১৮	চকমা	চাক্মা
„	২৭	সহিত বিবাহ	বিবাহ
১৮৮	১২	ষ্টৌশনে	ষ্টেসনে

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৮৮	১২	লইল	হইল
১৮৯	হেডিং	ন্তাসলালিটি	ন্তাসনালিটি
১৯০	১১	কথা কথা বলেন	কথা বলেন
১৯১	১৬	তিন, দেসে	তিনদেশে
১৯২	২৫	ভাষাটী	ভাবটী
১৯৩	৩০	শাক্তিশালী	শক্তিশালী
১৯৪	৭	Texation	Taxation
১৯৭	১৭	তখন	যখন
১৯৮	১০	হইতে	হইলে
২০০	১০	আদি	আর্য্য
২০১	১১	আমার	আমরা
২০৮	৫	সক	শাক
„	১৪	চর্চ্চার	চর্চ্চায়
„	২৪	তাহারা তাঁহারা	তাহারা
„	২৯	এনন	এমন
২০৯	২	কির্ণ স্নবর্ণের	কর্ণস্নবর্ণের
২১২	৯	যহৈতে	যাইতে
২১৩	৪	হইন	হউন
„	৭	বিঘ্ন হইলেই	বিঘ্ন না হইলেই
„	১৭	লিখিয়াছেস	লিখিয়াছেন
২১৪	২	India	India"
„	২৭	arrivied	arrived
২১৫	৮	intance	instance
„	১৩	generation.	generation."
„	২০	disappeared.	disappeared."
২১৬	১২	আর কথার	আর এক কথার
২১৭	হেডিং	১১৭ (পত্রাঙ্ক)	২১৭
২১৭	১৫	দামক	নামক
২২০	২২	patiotism	patriotism
২২১	১৭	আমরে	আমার
২২৪	১৫	সংস্থাপত	সংস্থাপিত
„	২৫	বং	রং
„	২৭	তৎদৃশ	তৎসদৃশ

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের

দ্বিতীয় অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ।

রাজসাহী।

সর্ব্বপ্রকার জাতীয় অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই, জাতীয় অভ্যুত্থানের সহায়তা করা। সাহিত্য একদিকে যেমন জাতীয় উন্নতির পরিচায়ক, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় উন্নতির সহায়। মানবীয় সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের লিখিত বিবরণকে সাহিত্য বলি। জ্ঞানের বিস্তার না হইলে সার্থকতা নাই ; কিন্তু বিস্তার একের কর্ম্ম নহে। তাই সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। এতদ্দেশে সাহিত্যিক জ্ঞান বিস্তারের ও কর্ম্ম অনুষ্ঠানের প্রকৃষ্ট পন্থা নিরূপণ করিবার নিমিত্তই সাহিত্য-সম্মিলনের সূচনা। এই উদ্দেশ্যে "বঙ্গের প্রধান সমুদয় সাহিত্যসেবীকে একস্থানে সম্মিলিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা" করিবার নিমিত্ত জাতীয় আগ্রহ নানারূপে প্রকাশ পায়। তাহা হইতেই সাহিত্য-সম্মিলনের জন্ম।

উদ্দেশ্য।

বিগত ১৩১২ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে বরিশাল নগরে সাহিত্য-সম্মিলনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু তথায় ঐ সময়েই বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন নির্দ্দিষ্ট ছিল। রাজ-নিগ্রহে শেষোক্ত সম্মিলন হইতে পারে নাই ; আর তাহার সঙ্গে সঙ্গেই নানা আশঙ্কায় সমবেত সাহিত্যিকগণ সাহিত্য-সম্মিলনও বন্ধ করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন। তৎপর ১৩১৪ সালে স্বনামধন্য সাহিত্য-সেবক শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের অনুপম উৎসাহগুণে কাশিমবাজারে সম্মিলনের অধিবেশন হওয়া স্থির হয়। কিন্তু অকস্মাৎ সম্মিলনের প্রাণ-স্বরূপ মহারাজ কুমার মহিমচন্দ্র পরলোকগত হওয়ায়, এই দ্বিতীয় চেষ্টাও বিফল হয়। অবশেষে সেই অনাসক্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বদেশবৎসল মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের অদম্য অধ্যবসায় ও কঠোর কর্ত্তব্য-জ্ঞান তাঁহাকে আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে দেয় না। কয়েক মাস পরেই, ১৩১৪ সালের ১৭ই কার্ত্তিক, কাশিমবাজার রাজ-ভবনে মহা-

ইতিহাস।

রাজাবাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ অধিবেশনের নবম প্রস্তাব এইরূপ ছিল,—"আগামী বৎসর রাজসাহী জেলায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হউক।" শ্রীযুক্ত শশধর রায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে শ্রীযুক্ত রায় কৃষ্ণচন্দ্র সান্যাল বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত (অধুনা পরলোকগত) গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী মহোদয় তাহার সমর্থন করেন। এই প্রস্তাব সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইয়াছিল এবং রাজসাহী নাটোরের বিদ্যোৎসাহী স্বদেশভক্ত মহারাজ জগদীশনাথ রায় বাহাদুরের সম্মতিসূচক টেলিগ্রাম সভাস্থলে পঠিত হইলে সভ্যমণ্ডলীর পরম আহ্লাদের কারণ হইয়াছিল।

উক্ত প্রস্তাব অনুসারে রাজসাহী একটী অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হইয়াছিল ও সদস্যগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। এই সভা তদীয় কার্য্যে প্রথমতঃ আশানুসারে সহানুভূতি পায় নাই। তথাপি মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় সভার কার্য্য পরিশেষে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

অধ্যক্ষ সভা

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অধ্যক্ষ-সভায় হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্ম-পণ্ডিত মৌলবী, জমীদার প্রজা, চাকুরিয়া ব্যবহারজীবী এবং ব্যবসায়ী প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর ভদ্র মহোদয়গণ যোগ দিয়াছিলেন। ইঁহাদের অনেকেই অধিবেশনের কার্য্য-সাফল্য পক্ষে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত গোবিন্দ রায়, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত কবিরাজ, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসাক, শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল পাঁড়ে, শ্রীযুক্ত রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অধ্যাপক পঞ্চানন নিউগী ও শ্রীযুক্ত মৌলবী এমাদ উদ্দীন সাহেব প্রভৃতির নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

সম্মিলনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে মোট ১১৩৭৲ টাকা সংগ্রহ হয় এবং সভার কার্য্যে সর্ব্ব সমেত ১০০৯৷১৫ টাকা ব্যয় হয়। ইহার জমা খরচ ও দাতৃগণের নাম পরিশিষ্টে লিখিত হইল। উদ্বৃত্ত ১২৭৷৵৫ টাকা দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী মুদ্রিত করিতে ব্যয় হইতে পারে।

আয় ব্যয়

এইরূপ সাহিত্যসম্মিলনের ব্যয় যত অল্প হইতে পারে, ততই বাঞ্ছনীয়। তদনুসারে অধ্যক্ষ-সভা প্রথম হইতেই সংক্ষেপে কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন।

বিগত ১৭।১৮ই মাঘ রামপুর বোয়ালিয়া নগরে বঙ্গের এগারটী জেলার সাহিত্যিকগণ সমবেত হইয়াছিলেন। সমবেত সদস্যগণের সংখ্যা ৪৩ জন।

এই সময়ে বগুড়া-সম্মিলনের অধিবেশন হওয়ায় আশানুরূপ

সমাগম।

সদস্য উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অধিকন্তু বিশেষ কারণে এই সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম নির্দ্ধারিত দিন পরিবর্ত্তন হওয়াতেও সদস্য সংখ্যা ন্যূন হইয়াছিল। সদস্য ও দর্শকে সভাস্থলে প্রতিদিন প্রায় ২৫০০ লোক সমাগম হইত। সভার অধিবেশন ১৮ই, ১৯শে মাঘ, এই দুই দিন হইয়াছিল। সদস্যগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর উৎসাহ ও শ্রম-সহিষ্ণুতা বিশেষ আশাপ্রদ। বিশেষতঃ "মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর পারিবারিক দুর্ঘটনা সত্ত্বেও যেরূপ শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া অনুচরবর্গের সহিত সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। মাতৃভাষার সেবায় মহারাজের এই প্রবল উৎসাহ আর সকলকেই অতিমাত্র উৎসাহিত করিয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যের প্রতি মহারাজের এই অনুরাগ যেমন, অনুকরণীয়, তেমনি উহার ভবিষ্যতের পক্ষেও মঙ্গলজনক।"

সকলের ঐক্যমতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় সভাপতি মনোনীত হন। তাঁহার হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণ ও অমায়িক ব্যবহারে সকলেই

সভাপতি।

অতীব মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জগদ্বিখ্যাত নাম বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের সহিত একান্তভাবে জড়িত। বঙ্গ-সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক শাখা এখনও গঠিত হয় নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সাহিত্য উন্নত না হইলে জাতীয় উন্নতি সুদূরপরাহত। উন্নতি কেন, বর্ত্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক উন্নতি ভিন্ন কোন জাতিই টিকিতে পারে না। এ নিমিত্ত বিজ্ঞান আলোচনার প্রবল আগ্রহ এতদ্দেশে পরিলক্ষিত হইতেছে। এই আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত ও পরিপুষ্ট করিবার নিমিত্ত জ্ঞানযোগী প্রফুল্লচন্দ্রকে, সভাপতি পাইয়া দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মিলন কৃতার্থ হইয়াছে।

যে সকল মহোদয় অর্থ, দ্রব্যসামগ্রী, শ্রম ও উৎসাহ দ্বারা সম্মিলনের কার্য্য সম্পন্ন হইবার সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের অকৃত্রিম

ধন্যবাদ।

ধন্যবাদার্হ। পুঁঠিয়া-নিবাসিনী রাণী শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী তাঁহার রামপুরবোয়ালিস্থ ভবন সম্মিলনের কার্য্যে ছাড়িয়া দেওয়ায় সম্মিলনের অধিবেশন উক্ত ভবনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণেই হইয়াছিল। জেলার জজ শ্রীযুক্ত আবদুল মজিদ সাহেব বার-য়্যাট-ল এবং ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মিঃ বারর্ণস্ সাহেব আমাদিগকে নানারূপে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ নিমিত্ত ইঁহারা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন-কার্য্যালয়,
ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
তাঃ ২০শে পৌষ, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

শ্রীশশধর রায়—সম্পাদক।
শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল—সহকারী সম্পাদক।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন।

দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন।

রাজসাহী।

১৮ই ও ১৯শে মাঘ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

প্রথম দিন।

পূর্ব্বাহ্ন ৭টা হইতে অপরাহ্ন ১টা পর্য্যন্ত।

উদ্বোধন——সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন ও অন্যান্য গায়কের দ্বারা সেন মহাশয়ের রচিত নিম্ন উদ্ধৃত উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয়।

স্বস্তি! স্বাগত! সুধি, অভ্যাগত, জ্ঞান-পরব্রত,
পুণ্য-বিলোকন;
বিদ্যা-দেবী-পদ-যুগ-সেবী, লোকনিরঞ্জন,
মোহ-বিমোচন।
লহ সবশাস্ত্র-বিশারদ বর্গ,
দীন-কুটীরে প্রীতির অর্ঘ্য;
দেব-প্রভাময় অতিথি-সমাগমে, জীর্ণ উটজ, মরি,
আজি কি শোভন!
হে শুভ-দরশন, ভারত-আশা!
মুগধপ্রাণে নাহিক ভাষা;
ধন্য, কৃতার্থ, প্রসন্ন, বিমোহিত, দীন হৃদয় লহ,
হৃদয়-বিরোচন।

তৎপর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রাজসাহীর প্রধান গৌরব দিঘাপতিয়া-রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম-এ মহাশয় সমবেত সাহিত্যিক ও ভদ্র-গণকে সাদরে আহ্বান করতঃ যে বক্তৃতা পাঠ করেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা।

"আজ আমাদের বড়ই আনন্দের দিন। আজ রাজসাহীর আহ্বানে বঙ্গের সাহিত্য-সেবী পণ্ডিতগণ এই নগরে সম্মিলিত হইয়াছেন। হয়তো রাজসাহী তাঁহাদের সমুচিত সমাদর করিতে পারিবে না, কিন্তু আশা করে, রাজসাহীর বহুক্রটীর মধ্যে আন্তরিকতার অভাব লক্ষিত হইবে না—আপনারা আমাদের সকল ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন। রাজসাহী এক্ষণে দীন, তাহার পূর্ব্ব সম্পদ বিলুপ্তপ্রায়, রাজসাহীতে সে শরৎসুন্দরী, ভবানী, সর্ব্বাণী জীবিতা নাই, রাজা কংসনারায়ণের প্রভায় আজ রাজসাহী প্রভামণ্ডিত নহে, তাঁহাদিগের নাম লইয়া এখনও আমরা আমাদিগকে ধন্য মনে করিয়া থাকি, তাঁহাদিগের প্রদত্ত নিষ্করভূমি হইতে এখনও আমরা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু যে সকল নামের সম্যক গৌরব রক্ষা করিতে আমরা পারি নাই, সেই সকল ভূমি হইতে আর রাজসাহীর বিদ্যাচর্চ্চার সমুচিত পরিপুষ্টি হইতেছে না, রাজসাহীর সে প্রাচীন বিদ্যা-গৌরব কোথায়? রাজসাহী এতদিন বুঝি নিদ্রিত থাকিয়া সে প্রাচীন স্মৃতির স্বপ্ন দেখিতেছিল, আজ রাজসাহী বুঝি কিঞ্চিৎ প্রবুদ্ধ হইয়াছে, তাই রাজসাহীর আহ্বানে আজ এই সুধী-সমাগম! আপনারা আজ যে চেতনা রাজসাহীতে আনয়ন করিয়াছেন, তাহা কখনই ব্যর্থ হইবে না, আজ রাজসাহী জাগরিত হইয়া তাহার সেই প্রাচীন গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান হইবে, অবশ্যই তাহার এই মোহ পরিহার করিবে। আপনারা সকলে স্বস্তি বলুন, তেহি নো দিবসাগতাঃ—আমরা, সেই দিন আবার যেন ফিরিয়া পাই।

রাজসাহী অতি প্রাচীন দেশ, ইহা প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের একখণ্ড। এই পৌণ্ড্রদেশ ইক্ষুগুড়ের ও সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্রের নিমিত্ত এককালে যেরূপ বিখ্যাত ছিল, সেইরূপ বিদ্যাচর্চ্চার নিমিত্তও তাহার যশঃ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এখনও সেই প্রাচীন শিল্প বর্ত্তমান আছে, সেই বিদ্যার কি আর অভ্যুদয় হইবে না? প্রাচ্য ভূমি গৌড়ের বিদ্যালোক প্রতিচ্যভূমি উজ্জয়িনী কান্যকুব্জ প্রভৃতির নিকটেও অনাদরের ছিল না। তুষার-সমাচ্ছন্ন হিমালয়ের অঙ্কনিহিত সুদূর কাশ্মীরেও এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের বিদ্যালোক প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এককালে কাশ্মীরের অধিপতি এতদ্দেশীয় ললনার রূপ গুণেই শুধু মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এমন নহে, এতদ্দেশীয় বিদ্যার প্রতিও তিনি সমধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শনে উপেক্ষা করেন নাই। শুধু তাহাই নহে, পৌণ্ড্রদেশীয় পণ্ডিতগণ দুস্তর হিমপ্রস্থ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের বহির্দ্দেশেও এই জ্ঞানালোকের বিস্তার করিতে পশ্চাৎপদ

হয়েন নাই এবং এই পৌণ্ড্রদেশের কলাবিৎই যে ভারতবর্ষের বহির্দ্দেশে সুকুমার কলা বিস্তারও প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তান্ত্রিক নেপাল রাজ্যের সহিতও তান্ত্রিক পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের বিস্তার আদান প্রদান চলিত, রাজসাহীতে এখনও তন্ত্রশাস্ত্রের আদর রহিয়াছে, তন্ত্র-সাহিত্য এই প্রদেশে বহু পরিমাণে পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাতে জয়দেব ও ধয়ী প্রভৃতি কবিগণ গৌড়ের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তৎপর তাহির-পুরের মহারাজ কংসনারায়ণের সভায় মহাকবি কীর্ত্তিবাস অমৃতময়ী রামায়ণী কথা গ্রথিত করিয়া পুরস্কারলাভ করিয়াছিলেন। স্মার্ত্ত কুল্লুক ভট্ট এখানেই মনুসংহিতার টীকা প্রণয়নে নিযুক্ত ছিলেন। গৌড়াধিপ হুসেন সাহের সাহিত্যানুরাগের কথা কে না জানেন। মুসলমান সুলতান হইয়াও তাঁহার সভাতে শুধু বৈষ্ণবচূড়ামণি রূপ সনাতনের ন্যায় প্রগাঢ় সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান ছিলেন, এমন নহে। ভাষা সাহিত্যও তাঁহার প্রযত্নে অপূর্ব্ব গরিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যে নরোত্তম ঠাকুরের স্থান অতি উচ্চে, তাঁহার সুললিত প্রেমভক্তিপূর্ণ কবিতাবলী এখনও বঙ্গের গৃহে গৃহে প্রচলিত রহিয়াছে। আরও আধুনিক কালে পণ্ডিত শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত মহাশয় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক রাজসাহীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাসস্থলী বেলঘরিয়া গ্রামে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রালোচনারও অভাব ছিল না, যে যশে আকৃষ্ট হইয়া গঙ্গাধরের ন্যায় মেধাবী ছাত্র আসিয়া অধ্যয়ন করতঃ যশস্বী হইয়া গিয়াছেন এবং তদীয় ছাত্র উক্তগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র এখনও রাজ-সাহীর গৌরবের স্থল। যেদেশে সরস্বতীর এই সকল বরপুত্র জন্মলাভ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, সেদেশ কি চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকিবে? ইহা কখনই দেবতার অভিপ্রায় হইতে পারে না। আজি এই সম্মিলন হইতে যে স্বপ্নভঙ্গ আরব্ধ হইল, আশা করি, তাহা পূর্ণ জাগরণে পরিণত হইবে। রাজসাহী-বাসীগণ এই অঙ্কুরকে উপেক্ষা না করিয়া জলসেচনের দ্বারা সজীব রাখিবেন, এদেশ পুনরায় বিদ্বৎসমাজের মধ্যে যথোচিত স্থান প্রাপ্ত হইবেন।

আজি এত আনন্দের মধ্যেও আমাদের হৃদয় শোকসন্তপ্ত। গিরীশ লাহিড়ী মহাশয় আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সেও সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি বালকের ন্যায় উৎসাহী ছিলেন, গতবার যখন মহারাজ কাশীমবাজারের লক্ষ্মীর নিবাস প্রাসাদ সরস্বতীর বীণা নিক্বণে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল, তখন

তিনি এই রাজসাহীর প্রতিনিধিস্বরূপ উপস্থিত থাকিয়া এই সভা এখানে আহ্বান করিবার পক্ষে একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। সেই সভা অদ্য এখানে সম্মিলিত, কিন্তু তিনি তাহা দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। রাজসাহী-সংসৃষ্ট আরও দুই মহাত্মা সম্প্রতি আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, একজন কালীনারায়ণ সান্যাল ও অপর শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।* আমাদের দুরদৃষ্টক্রমে মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ও সমগ্র বঙ্গবাসীগণকে কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। মহানন্দের মধ্যে গভীর শোক নিহিত রহিয়া আমাদিগকে বিচলিত করিতেছে, সংযোগের মধ্যে বিয়োগ আসিয়া, এইরূপে, আমাদের চিত্তকে কেন বিক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, তাহা দার্শনিকগণ মীমাংসা করিবেন, আমরা কেবল তীক্ষ্ণ বেদনাটুকু অনুভব করিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে কঠোর কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইব।

আমি ক্ষুদ্র, আমার উপর রাজসাহী আপনাদিগের অভ্যর্থনায় এই যে বিপুল ভার অর্পণ করিয়াছেন, আমি তাহার নিতান্ত অযোগ্য। একমাত্র তাঁহাদের স্নেহে অনুপ্রাণিত হইয়াই আমি এই আস্পর্দ্ধা প্রকাশে দুঃসাহসী হইয়াছি। আমার ক্ষীণকণ্ঠের এই স্বল্প সম্ভাষণেই আপনাদিগকে তৃপ্ত হইতে হইবে। আমি আপনাদের জন্য যথোচিত অর্ঘ্য আনিতে পারি নাই। আমার অর্ঘ্য শুধু ভক্তি, ভক্তিপূর্ণ অভিবাদন পূর্ব্বক আমি আজ রাজসাহীর পক্ষ হইতে করযোড়ে আপনাদিগকে স্বাগত কহিতেছি। আপনারা রাজসাহীকে আশীর্ব্বাদ করুন। আর দুইটী কথা না বলিয়া আমি বসিতে পারিতেছি না। একটী কথা, মহারাজ কাশীমবাজারের মহাপ্রাণতা, বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি একমাত্র অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি বিবিধ কর্ত্তব্য বর্ত্তমানেও এবং পারিবারিক দুর্ঘটনা-সত্বেও এই সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় কথা, রাজসাহীর আহ্বানে অধ্যাপক ডাক্তার রায় মহাশয়ের সভাপতিত্ব স্বীকার, তাঁহার ন্যায় পুণ্যশীল, স্বার্থত্যাগী, জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানযোগী মহাপণ্ডিত, যাঁহার যশে ভারতবর্ষ যশস্বী, তিনি আজ এই সভার সভাপতি। ইহা নিশ্চয়ই আমাদের পূর্ব্বপুণ্য এবং পিতৃপুরুষগণের আশীর্ব্বাদের ফল। ইহাতে রাজসাহী কৃতার্থ নহে, সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্য ধন্য। আমি এই দুই মহাত্মাকে পুনরায় অভিবাদন পুরঃসর স্বাগত কহিতেছি।

---

* ইহারা উভয়েই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা।

ওরে বাছা! মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?

শ্রীমধুসূদন।

"Ours is a noble language······He who
uses a French word where an English
word would do just as well is
guilty of high treason against
his mother-tongue."—Southey ("The Doctor").

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় যখন আপনাদের প্রতিনিধিস্বরূপ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া সাহিত্য-সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন, তখন আমি যুগপৎ বিস্ময় ও আতঙ্কে অভিভূত হইলাম। প্রথমতঃ মনে হইল, নাম বা ঠিকানা ভুলিয়া হয়ত তাঁহারা আমার নিকট আসিয়াছেন। আমি সাহিত্যসেবা করি নাই। বলিতে লজ্জা হয়, মাতৃভাষায় দুইটি কথা সংযোগ করিতে হইলে আমার হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ যে আসনে সাহিত্যরথী রবীন্দ্রনাথকে আপনারা একবার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সে আসন গ্রহণ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, বাতুলতা মাত্র। তার পর আমি একপ্রকার চিররুগ্ন। দূর প্রদেশে আসিয়া কোন প্রকার শ্রমসাধ্য কাজ করা আমার শক্তি ও সামর্থ্যের অতীত। এই সকল কারণ প্রদর্শন করিয়া আমি এই সম্মান প্রত্যাখ্যান করি। কিন্তু শশধর বাবু যখন পরদিন সাহিত্যপরিষদের দুই প্রধান স্তম্ভস্বরূপ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়দ্বয়কে সঙ্গে করিয়া পুনরায় এই ক্ষুদ্র ও ক্ষীণদেহ মশককে ধৃত করিবার জন্য জাল বিস্তার করিলেন, তখন পরাভূত হইয়া আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলাম। আমি এক প্রকার বন্দিভাবে আপনাদের সমক্ষে আনীত। এই গুরুভার আমার স্কন্ধে চাপাইয়া আপনারা কতদূর সফলতা লাভ করিবেন, জানি না, তবে "কর্ম্মণ্যে-বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" এই শাস্ত্রোক্ত বচনের উপর নির্ভর করিয়া আজ সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ করিতেছি।

স্থানীয় কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে বঙ্গসাহিত্যে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের প্রসার হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

জাতীয় সাহিত্য জাতির মানসিক অবস্থার পরিচায়ক ও পরিমাপক। যে কোন দেশের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের সাহিত্য নিবিষ্টভাবে পর্য্যালোচনা করিলে সে দেশের তৎকালীন লৌকিক চরিত্র সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। কারণ, সাহিত্য জাতীয় চরিত্র ও প্রবৃত্তির শাব্দিক বিকাশ মাত্র। যেমন চিত্রকর নীরব ভাষায় চিত্রিত বিষয়ে কেমন এক প্রকার সজীবতা প্রদান করেন, যদ্দ্বারা আলেখ্যবিশেষের মনোগত ভাব অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়, তেমনি সাহিত্য-চিত্রে জাতীয় চরিত্র মুখরিত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের সূচনা হইতেই তাহাতে ধর্ম্মপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। মাণিকচাঁদ ও গোবিন্দচন্দ্রের গীতাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীত ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত কেবল এই একই সুর। এই ভাবের চরম বিকাশ হইয়াছে বৈষ্ণব সাহিত্যে। প্রেমের জয়, নামে রুচি যে সাহিত্যের মূলমন্ত্র, সেই বৈষ্ণব সাহিত্যের উন্মাদন স্রোতে দেখিতে পাই সেই এক ভাব—ধর্ম্মপ্রবণতা। এই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রসাদেই আমরা আজ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বীণা-নিক্কণ শুনিয়া মাতৃভাষাকে ও স্বদেশকে গৌরবান্বিত মনে করি। চণ্ডীদাস তাঁহার প্রেম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাঁহার পদাবলী সম্বন্ধেও সেই উক্তি প্রয়োগ করিব। ইহার আদ্যোপান্ত "নিকষিত হেম"।

এই ধর্ম্মসাহিত্যের স্রোত মাণিচাঁদের সময় অর্থাৎ খ্রীঃ একাদশ শতাব্দী হইতে প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার উৎপাদন, পুষ্টিসাধন ও কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। সেই স্রোত আজও প্রবাহিত হইতেছে। এমন কি, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গুরুস্থানীয় (inspirer) জয়দেবের সময় হইতে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর সময় পর্য্যন্ত—এই সাতশত বৎসর—একই প্রসঙ্গ চলিতেছে। গীতগোবিন্দে যে তরঙ্গ আলোড়িত, 'রাই উন্মাদিনী'তেও তাহারই সংঘাত দেখি। এমন কি, ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী গ্রন্থকারেরাও এই সংক্রামকতা এড়াইতে পারেন নাই। পদাবলী সাহিত্যের ভণিতায় ৭৪।৭৫ জন মুসলমান কবির নাম পাওয়া যায়। গত কয় বৎসর বাঙ্গালা ভাষায় যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই ধর্ম্মবিষয়ক। (পরিশিষ্ট দেখ)

বাঙ্গালা সাহিত্যে কোন্ সময়ে গদ্যের প্রথম আবির্ভাব হয়, তাহার

২

আলোচনা করিবার আমাদের সময় নাই। তবে মোটামুটি ইহা ধরা যাইতে পারে যে, গদ্য সাহিত্যের বয়স শতবর্ষ মাত্র। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ স্থাপন সময় হইতে বঙ্গসাহিত্যের নবযুগে পদার্পণ করিয়াছে। কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতি শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ, রাজীবলোচন এবং মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, রাম রাম বসু, রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই যুগের প্রবর্ত্তক। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইংরেজ প্রভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইতিহাস সবিস্তারে বিবৃত করিয়া নিম্নলিখিত কথা কয়টী বলিয়া তাঁহার সারবান গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন :—

"ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সামাজিক জীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে নূতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে; নূতন আদর্শ, নূতন উন্নতি, নূতন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমস্ত জাতি অভ্যুত্থান করিয়াছে। সাহিত্যে এই নবভাবের ফলে গদ্য সাহিত্যের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। বাঙ্গালা এখন বাঙ্গালা ভাষাকে মান্য করিতে শিখিতেছে; এ বড় শুভ লক্ষণ। ক্রীড়াশীল শিশু যেমন সমুদ্র-তীরে খেলা করিতে করিতে একান্ত মনে গভীর উর্ম্মিরাশির অস্ফুট ধ্বনি শুনিয়া চমকিত হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রসঙ্গে ব্যাপৃত থাকিয়া আমিও সেইরূপ বঙ্গসাহিত্যের অদূরবর্ত্তী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির কথা কল্পনা করিয়া বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছি। অর্দ্ধ শতাব্দীতে বঙ্গীয় গদ্য যেরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কাহার মনে ভাবী উন্নতির উচ্চ আশা অঙ্কুরিত না হয়?"

আজ আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসামান্য প্রতিভা-প্রভাবে তাহার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। এমন কি, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যকে অনেক বিদ্যাসাগরীয় যুগের সাহিত্য এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা সাহিত্যের শব্দবিন্যাস বর্ত্তমান হইতে অনেকটা বিভিন্ন। তাঁহার বেতাল পঞ্চবিংশতি সংস্কৃত সমাসবদ্ধপদে পরিপূর্ণ। এক পংক্তি রচনার মধ্যে ৩।৪টী দুরূহ সমাসবদ্ধ পদের অস্তিত্ব বর্ত্তমান পাঠকদিগের নিকট কিরূপ সুখপাঠ্য হইবে, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের শৈশবে ইহাই রীতি ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক "প্রবোধচন্দ্রিকা" তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। "কোকিল-কলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে-উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছনির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে" ইহাই তখনকার আদর্শ ভাষা ছিল। এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র

"আলালের ঘরের দুলালে"র মুখবন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপকেরা ঘিকে "আজ্য" বলিতেন, কদাচ "ঘৃতে" নামিতেন। খইকে "লাজ", চিনিকে "শর্করা" ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া ভাষার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিতেছিলেন। যাহা হউক, নূতন বন্যায় সে ঢেউ চলিয়া গেল। বসন্তের অতৃপ্ত কোকিল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে যেমন একদিকে বিরহের উচ্ছ্বাস-গীতিকা গাহিতে লাগিল, আবার 'আনন্দমঠে' স্বদেশপ্রেমিকতার ভৈরবনিনাদ, অপরদিকে সংযম, আত্মনিবৃত্তি, যোগ, অনুশীলন, সুখ, দুঃখ, ইত্যাদির উচ্ছ্বাসে 'বঙ্গদর্শন' বঙ্গদেশে নূতন যুগ আনয়ন করিল। সেই অলোকসামান্ত প্রতিভায় উদ্ভাসিত হইয়া আজ বাঙ্গালা সাহিত্য সমগ্র ভারতসাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অক্ষয়কুমার, দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রতিভাবারি সিঞ্চন করিয়া উর্ব্বরতা সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত, শ্রীমধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্র নাথ, এই সাহিত্যের কাব্যাংশ কনকাভরণে সাজাইয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। কিন্তু এসমস্ত সত্ত্বেও আজ আমাদের সম্মুখে একটি ভীষণ বিপদ উপস্থিত। আমাদের সাহিত্যের আংশিক উন্নতি হইয়াছে বটে, সাহিত্যের উপন্যাস ও কাব্যাংশের পূর্ণ বিকাশ হইতেছে, ইহাও সত্য বটে, কিন্তু একটি মাত্র কারণে ভাষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারিতেছে না। শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, যে অঙ্গের চালনা হয়, সেই অঙ্গ দৃঢ় ও সবল হইতে থাকে, আবার যে অঙ্গের চালনা হয় না, তাহা ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণতর হইয়া পরে একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। আমাদের সাহিত্যে বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকের একান্তই অভাব।

প্রাচীন ভারতে সত্যের ও নূতন তত্ত্বের অনুসন্ধানের জন্য ঋষিরা ব্যস্ত থাকিতেন। কিন্তু মধ্যযুগে এ সমস্ত লুপ্ত হইল। চৌষট্টি কলার অন্তর্ভুক্ত যিনি যত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতেন, তিনি শিক্ষিত সমাজে তত জ্ঞানবান বলিয়া আদৃত হইতেন। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থ পাঠে জানা যায় ধাতুবাদ (Chemistry and Metallurgy) ঐ সকল কলার মধ্যে পরিগণিত হইত। চরকে বনৌষধি চিনিয়া ও বাছিয়া লইবার জন্য উদ্ভিদ্-বিদ্যালাভের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং সুশ্রুতে শবব্যবচ্ছেদ করিয়া অস্থিবিদ্যা শিখিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে শল্যতন্ত্র (Surgery) একটি প্রধান অঙ্গ। সুশ্রুতে যে ক্ষারপাকবিধি

বর্ণিত আছে, তাহা নব্য রসায়ন শাস্ত্রের এক অধ্যায় বলিয়া অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু হায়, যে ভারতের পূর্ব্বকালীন ঋষিগণ জ্ঞানে ও ধর্ম্মে বর্ত্তমান জগতেরও আদর্শ,যাঁহাদের কাব্য ও দর্শন আজও সভ্য জগতের সাহিত্য মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে, যে সামগান একদিন ভারতের বন-ভবনে উচ্চারিত ও গীত হইয়া ভারতে ধর্ম্মের যুগ আনয়ন করিয়াছিল, যে তটশালিনী গঙ্গাযমুনা আবহমানকাল হইতে কুলু কুলু নিনাদে বহিয়া, বক্ষে প্রাচীর ইতিহাস ধারণ করিয়া আজও হিন্দুস্থান পবিত্র করিয়া সাগর সঙ্গমে ধাইতেছে, সেই ভারতের, সেই পুণ্যদেশ আর্য্যাবর্ত্তের জ্ঞানরবি, দুর্ভাগ্য বংশধর আমাদিগের দোষে, অস্তমিত হইল! সত্যই কবি গাহিয়াছেন :—

"অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।"

অনুসন্ধিৎসা তিরোহিত হইল, ঔষধ সংগ্রহের জন্য উদ্ভিদ-পরিচয়ের ভার বেদিয়া জাতির উপর সমর্পিত হইল। অস্ত্র চালনার দুঃসাধ্য ভার নরসুন্দরের উপর ন্যস্ত হইল। যাহা হউক, অতীতের আলোচনা ও অনুশোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আর প্রয়োজন নাই। এখন সময় আসিয়াছে।

গত কয় বৎসর বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তগুলিই পাঠ্যপুস্তকশ্রেণীভুক্ত। দুই একখানি মাত্র সাধারণ পাঠোপযোগী। ইহা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য হইতে বিজ্ঞান স্থানচ্যুত হইয়াছে। বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ইউরোপখণ্ডে ও আসিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে আশ্রয় লইয়াছেন। বাস্তবিক ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের এপ্রকার দুর্গতি হয় নাই। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকায় তখন বিজ্ঞান স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় পদার্থ বিদ্যা বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল "বিবিধার্থ সংগ্রহে" ভূতত্ত্ব,প্রাণিবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন,তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অস্থিমজ্জাগত হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিজ্ঞানের যাহা কিছু সমাবেশ হইয়াছে, তজ্জন্য এই দুই মহাত্মার নিকট আমরা চিরঋণী থাকিব। ইহাদের কিছু পূর্ব্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লর্ড হার্ডিঞ্জের আনুকূল্যে Encyclopœdia Bengalensis অথবা"বিদ্যাকল্পদ্রুম" আখ্যা দিয়া কয়েক খণ্ড পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও

দর্শনতত্ত্ব সকল প্রকাশিত হইত। রাজেন্দ্রলাল ও কৃষ্ণমোহন উভয়েই অশেষ-শাস্ত্রবিৎ নানা ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। যদিও তাঁহাদের রচনা অক্ষয়কুমারের রচনার ন্যায় স্থায়ী প্রচলিত সাহিত্যের (Classics) মধ্যে গণ্য হইবে না, তথাপি তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের অভিনব পথপ্রদর্শক বলিয়া চিরকাল মান্য হইবেন। কিন্তু ইঁহাদের পূর্ব্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণকে বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তাঁহারাই আবার বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারেরও প্রথম প্রবর্ত্তক। আমাদের জাতীয় অভিমান আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলিয়া একথা আমাদের ভুলিয়া যাইলে, কিম্বা 'খ্রীষ্টানী বাঙ্গালা' বলিয়া তাঁহাদের কৃতকার্য্যকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ঐতিহাসিক, ন্যায়ের ও সত্যের তুলাদণ্ড হস্তে করিয়া যাহার যে সম্মান প্রাপ্য, তাহাকে তাহা প্রদান করিবেন।

১৮২৫ খ্রীঃ অং উইলিয়ম ইয়েটস প্রথমে 'পদার্থ বিদ্যা সার' বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত করেন। ইহাতে পদার্থ বিদ্যা ভিন্ন মৎস্য, পতঙ্গ, পক্ষী ও অন্যান্য জীবের বর্ণনা আছে। এতদ্ভিন্ন "কিমিয়া বিদ্যাসার" নামক রসায়নবিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ শ্রীরামপুর হইতে প্রচারিত হয়। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই পুস্তকের সবিস্তার সমালোচনা করিয়াছেন। ১৮১৮ খ্রীঃ শ্রীরামপুরের মিশনরীগণ সমাচার-দর্পণ নামে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন এবং তাঁহারাই আবার 'দিগদর্শন' নামক নানাতত্ত্ব-বিষয়িনী পত্রিকা পরিচালিত করিতেন। এই পত্রিকাতেই বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রথম সূত্রপাত হয়।

ইহার পর ১৮২৮ খ্রীঃ বিজ্ঞান অনুবাদ সমিতি (Society for translating European Sciences) নামে একটী সমিতি স্থাপিত হয়। প্রফেসর উইলসন্ এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন ও উক্ত সমিতির চেষ্টায় 'বিজ্ঞান সেবধি' নামক গ্রন্থের ১৫ খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৮৫১ খ্রীঃ অঃ (Vernacular Literary Society) নামে আর এক সমিতি স্থাপিত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও যাহাতে বাঙ্গালীর অন্তঃ-পুরে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে ইহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মহাত্মা বেথুন ও বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট মাসিক ১৫০৲ চাঁদা দিয়া ইহার আনুকূল্য করিতেন। এই

সভার উদযোগেই ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ" প্রকাশ করেন। মহামতি হজসন প্রাট এই সমিতির স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে অন্যতম উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। তিনি উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই :—

"বাঙ্গালার অধিবাসীদিগকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে ব্যুৎপন্ন করার আশা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং জাতীয় ভাষায় ইহাদিগের শিক্ষার পথ প্রসরতর করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। * * ইহাদের নিমিত্ত সরল সুখপাঠ্য গ্রন্থ প্রচার করিয়া পাঠলিপ্সার সৃষ্টি করিতে হইবে। জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিতে হইবে। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে অল্প মূল্যের গ্রন্থ প্রচার করিতে হইবে। সেই সকল গ্রন্থে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও মানব শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সহজ ও চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধ থাকিবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধেও প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রচার করিতে হইবে। নীতিপ্রভৃতি উপদেশসূচক গ্রন্থ প্রচারও অতি প্রয়োজনীয়, ইহাতে সমাজের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। এই সকল প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত সহজ ও সরল সাহিত্য প্রচার অতি আবশ্যক। এই সমিতিকে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে।" (বিশ্বকোষ)

বিজ্ঞান প্রচার সম্বন্ধে এই সমিতির আশা তাদৃশী ফলবতী হয় নাই। ১৭ খানি পুস্তক প্রকাশের পর সমিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, গল্প ও আমোদজনক পুস্তকই এদেশের পাঠকসাধারণের অধিকতর প্রিয়। এতদ্‌ব্যতীত অপর শ্রেণীর পুস্তক আদৌ আদরে গৃহীত হয় না।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে কলিকাতা, হুগলী ও ঢাকা, এই তিন স্থানে তিনটী নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ পদার্থ-বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, জ্যামিতি, ভূগোল, প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণীত হয়। ইহা ভিন্ন ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষার উপযোগী পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা বিষয়ক অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মেডিক্যাল স্কুল সমূহের পাঠ্য অস্থিবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা-ঘটিত অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ প্রচারেও যে বাঙ্গালা ভাষার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

এখন আলোচনার বিষয় এই যে, অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া বাঙ্গালা

তাঁহার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু ফললাভ হইয়াছে কি না। বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল পুস্তকের কিছু কাট্‌তি আছে, তাহা Test Book Committee নির্ব্বাচিত তালিকাভুক্ত, সুতরাং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সোপানস্বরূপ। একাদশ বা দ্বাদশ বর্ষীয় বালকদিগের গলাধঃকরণের জন্য যে সকল বিজ্ঞানপাঠ প্রচারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা সঠিক বলা যায় না। আসল কথা এই, আমাদের দেশ হইতে প্রকৃত জ্ঞান-স্পৃহা চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানের প্রতি একটা আন্তরিক টান না থাকিলে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২।৩টী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বিশেষ ফললাভ হয় না। এই জ্ঞান-স্পৃহার অভাবেই যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বিদ্যালয় সমূহে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান-অধ্যাপন ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ-সম্পন্ন ব্যুৎপন্ন ছাত্র আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না; কেননা ইংরাজীতে একটী কথা আছে, ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকট আনিলে কি হইবে? উহার যে তৃষ্ণা নাই। এক্‌-জামিন পাশই যেখানকার ছাত্রগণের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানকার যুগবকগণের দ্বারা অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্যার শাখা প্রশাখাদির উন্নতি হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্তই বৃথা। সেই সকল মৃতকল্প, স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণের যত্নে জাতীয় ভাষার উন্নতিবিধান কিম্বা যে কোন প্রকার দুরূহ ও অধ্যবসায়মূলক কার্য্যের সাফল্য সম্পাদনের আশা নিতান্তই সুদূরপরাহত। বস্তুতঃ একজামিন পাশ করিবার নিমিত্ত এরূপ হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ করিয়া সরস্বতীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ,—শিক্ষিতের এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তি আর কোন দেশেই নাই। আমরা এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যা-লয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জ্ঞানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া আত্মাদরে স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চার কাল আরম্ভ হয়। কারণ যে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে, তাঁহারা একথা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই জ্ঞান সমুদ্র-মন্থনের প্রশস্ত সময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি দৃষ্টিগোচর না করিয়াই ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পঞ্জিকা পরীক্ষোত্তীর্ণগণের নামে পরিপূর্ণ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। একবৎসর হয়ত উদ্ভিদ্ বিদ্যায় ১০ জন প্রথম শ্রেণীতে এম্-এ

পাশ হইলেন। কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এখানেই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল; সে সমুদায় যুবকগণকে ২।১ বৎসর পর আর বিদ্যামন্দিরের প্রাঙ্গণেও দেখিতে পাওয়া যায় না। পিপাসাশূন্য জ্ঞানালোচনার এইত পরিণাম! জাপানের জ্ঞানতৃষ্ণা আর আমাদের যুবকগণের জ্ঞানতৃষ্ণা, এই দুই তুলনা করিলে অবাক্ হইতে হয়। প্রায় চারিবৎসর হইল, আমি লণ্ডন নগরে একটী জাপ রসায়নবিৎ এর সহিত পরিচিত হই। তিনি অনেক কষ্টকৃচ্ছ্র সহ্য করিয়া দুঃসহ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া লণ্ডনের কোন রসায়নাগারে মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অসামান্য দৃঢ়তার গুণে মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন" এই জাতীয় চরিত্রের প্রভাবে (সত্বরই) তিনটী নূতন ধাতু আবিষ্কার করিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি আহরণ করিয়াছেন। সম্প্রতি সঞ্জীবনীতে কোন বাঙ্গালীযুবক জাপানে পদার্পণ করিয়াই যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল :—

"জাপানীদের জ্ঞানতৃষ্ণা যেরূপ, অন্য কোন জাতির সেরূপ আছে কি না সন্দেহ। কিঁ ছোট, কি বড়, কি ধনী, কি নির্ধন, বিদ্বান, কি মূর্খ, সকলেই নূতন বিষয় জানিতে এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে যে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। জাহাজ হইতে জাপানে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে যে আভাস পাইয়াছিলাম, তাহাতেই মনে করিয়াছিলাম, এরূপ জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

*   *   *   *   *

চাকরাণীগুলি পর্য্যন্ত বাহিরের বিষয় সম্বন্ধে যতটা খোঁজ রাখে, আমাদের দেশের অধিকাংশ ভদ্রমহিলাই তাহা জানেন না।"

বস্তুতঃ একটু তলাইয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই সংগ্রাম—দুঃখ দারিদ্র্য অতিক্রম করিয়া জ্ঞানানুধাবনের প্রবৃত্তি, দুইটি মহীয়সী আসক্তি দ্বারা পরিপুষ্ট। এই দুইটি প্রবৃত্তির কোনটি প্রথম এবং দ্বিতীয়, ইহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। জ্ঞানস্পৃহা প্রবৃত্তিদ্বয়ের একটি, জাতীয়জীবন প্রতিষ্ঠা অপরটি। এই দুইটির সমন্বয়েতেই জাপান আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞানের সংগ্রামে অটুট। 'আমি উপলক্ষ্যমাত্র, দেশের ও মানব সমাজের কল্যাণ আমার মুখ্য উদ্দেশ্য, স্বদেশ আমার জগতের ইতিহাসে শীর্ষস্থান অধিকার করুক' এই বাণী জাপানযুবকহৃদয়ের ধমনীতে তাড়িতপ্রবাহ সঞ্চার করিয়াছে। এই ভাব জাতীয় জীবনে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। বাঙ্গালার যুবক! সমগ্র ভারতের যুবক! তোমাদের হৃদয়তন্ত্রী কি এ সঙ্গীতে বাজিয়া উঠে

না ? তোমাদের কি জগতের জ্ঞানকোষে অর্পণ করিবার কিছুই নাই ? তোমরা কি চিরকাল পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে ?

এখন একবার ফ্রান্সের দিকে তাকাইয়া দেখা যাউক। ফরাসীবিপ্লবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই জ্ঞানপিপাসা কি প্রকারে বলবতী হইয়াছিল, তাহা বাকল (Buckle) সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। যখন লাবোয়াসিয়ে, লালাণ্ড, বাঁফো প্রভৃতি মনীষিগণ প্রকৃতির নবতত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া সরল ও সরস ভাষায় জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন ফরাসী সমাজে ধনীর রম্য হর্ম্ম্যে ও দরিদ্রের পর্ণকুটীরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে বিজ্ঞান সমিতিতে যে সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচিত হইত, তাহা শুনিবার জন্য দুই চারিজন বিশেষজ্ঞ মাত্র উপস্থিত হইতেন। কিন্তু এই নূতন বার্ত্তা শুনিবার জন্য সকল শ্রেণীর লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ ইতর লোকের সংস্পর্শে আসিলে নিজকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন, তাঁহারাই পদমর্য্যাদা তুলিয়া লেকচার শুনিবার জন্য নগণ্য লোকের সহিত ঘেসাঘেসি করিয়া বসিবার একটু স্থান পাইলেই চরিতার্থ হইতেন।

সম্প্রতি এক ধূয়া উঠিয়াছে যে, বহু অর্থব্যয়ে যন্ত্রাগার (Laboratory) প্রস্তুত না হইলে বিজ্ঞান শিখা হয় না। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের গ্রামে ও নগরে, উদ্যানে ও বনে, জলে ও স্থলে, প্রান্তরে ও ভগ্নস্তূপে, নদী ও সরোবরে, তরুকোটরে ও গিরিগহ্বরে, অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে, তরুকোটরে ও গিরিগহ্বরে, অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে জ্ঞান-পিপাসুর যে কত প্রকার সম্বন্ধবিষয় ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে ? বাঙ্গালার দয়েল, বাঙ্গালার পাপিয়া, বাঙ্গালার ছাতারের জীবনের কথা কে লিখিবে ? বাঙ্গালার মশা, বাঙ্গালার সাপ, বাঙ্গালার মাছ, বাঙ্গালার কুকুর, ইহাদের সম্বন্ধে কি আমাদের জানিবার কিছুই বাকী নাই ? এদেশের সোদাল, বেল, বাবলা ও শ্যেওড়ার কাহিনী শুধু কি ইউরোপীয় লেখকদিগের কেতাব পড়িয়াই আমাদিগকে শিখিতে হইবে ? বনে, জঙ্গলে ও উপবনে যে সকল তরু লতা ও গুল্ম জন্মে, তাহার গ্রাম্য নাম ও পরিচয় পাইতে হইলে শতাধিক বর্ষের লিখিত রক্সবর্গের (Roxburgh) "ফ্লোরা ইণ্ডিকা" (Flora Indica) এখনও আমাদিগকে উদ্‌ঘাটন করিতে হয়। ইহা কি আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় নহে ? এদেশে ভিন্ন ভিন্ন কৃষিপ্রণালী, প্রাচীন

ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়া-পদ্ধতি, এ সবের ভিতরে কি আমাদের জ্ঞাতব্য কিছুই থাকিতে পারে না ?

রসায়ন, পদার্থবিদ্যাদি শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা এবং ভূতত্ত্ববিদ্যার মৌলিক গবেষণা যে বিরাট যন্ত্রাগারের অভাবে কতক দূর চলিতে পারে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ছুরি, কাঁচি, অণুবীক্ষণ ইত্যাদি সরঞ্জাম কিনিতে ১০০৲ টাকার অধিক মূল্য লাগে না; কিন্তু গোড়াইতেই গলদ, জ্ঞানের পুণ্য-পিপাসা কোথায় ?

এদেশের প্রকৃতিবিদ্যার্থী যুবক দেখিয়াছেন, এখন একবার ইউরোপের প্রকৃতিবিদ্যার্থী যুবকের কথা শুনুন। বিদ্যাবিষয়ক উপকরণ আহরণের জন্য জ্ঞানপিপাসু ইউরোপীয় যুবক আফ্রিকার নিবিড় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে প্রাণ হাতে করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আহার নিদ্রা ভুলিয়া কার্য্য করিতে থাকেন, ভোগলালসা তখন তাঁহাদিগের বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানপিপাসা তাঁহাদের হৃদয়ের একমাত্র আসক্তি। আপনারা অনেকেই জানেন, উদ্ভিদনিচয় আহরণের জন্য হুকার (Sir Joseph Hooker) ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে কত বিপদ আলিঙ্গন করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের বহু উচ্চদেশ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে দর্জিলিং-হিমালয়ান্ রেলওয়ে হয় নাই। সেজন্য তখন হিমাচলারোহণ এখনকার মত সুগম ছিল না। তুষারমণ্ডিত মেরুপ্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জানিবার জন্য কত অর্থব্যয়ে কতবার অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছে; কত বৈজ্ঞানিক তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশের কি অদম্য উৎসাহ! কি অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা! যখন ন্যানসেন (Nansen) ফিরিয়া আসিলেন, সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা তাহার ভ্রমণকাহিনী শুনিবার জন্য ব্যাকুল।

অতঃপর আমাদের আলোচ্য বিষয় বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য,—ইহার বর্ত্তমান অবস্থা ও ইহার ভাবী উন্নতি বিধানের উপায়-নির্দ্দেশ। তিনটী দেশের সাহিত্যের ইতিহাস এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিবে। কারণ ইতিহাসে সদৃশ ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। যাহা জর্ম্মানীতে সম্ভবপর হইয়াছিল, যাহা রুষিয়া দেশে সম্ভবপর হইয়াছিল, যাহা জাপানেও সম্প্রতি সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালাদেশেও সম্ভবপর হইবে। এই তিন দেশই অল্পসময়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মান সাহিত্যের কি দুর্গতি ছিল! সত্য বটে, মার্টিন লুথার মাতৃভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিয়া

জনসাধারণের মধ্যে ইহার আদর ও চর্চ্চা বাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যালয়ে লাটীন ও গ্রীকই অধীত হইত এবং রাজসভায় ফরাসী ভাষা চলিত ছিল। এমন কি, ফ্রেডরিক্ দি গ্রেট মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করিতেন। তিনি ফরাসী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া বলটেয়ারের সমক্ষে আবৃত্তি করিতেন এবং তাঁহার নিকট একটু বাহবা পাইলে নিজকে ধন্য মনে করিতেন।

কিন্তু ফ্রেডরিকের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই Schiller, Goethe, Kant, Hegel প্রভৃতি একদিকে, আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে Liebig Wohler প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ অপরদিকে, জর্ম্মান ভাষাকে মহাশক্তিশালিনী করিয়া তুলিলেন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে রুষিয়ার যে কি দুরবস্থা ছিল, তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মহামতি বাকল্ ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় এই দেশকে সুসভ্য আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই অনার্য্য জাতির ভাষা আজ আদর্শ-স্থানীয়। যে ভাষা রুষ ভল্লুকের উপযুক্ত বলিয়া উপহসিত হইত, টল্‌ষ্টয়ের ন্যায় ঔপন্যাসিক সে ভাষাকে বিবিধ আভরণে সাজাইয়া জগতের সম্মুখে সমুপস্থিত করিয়াছেন। সেই ভাষাতেই বিখ্যাত রুষ রসায়নশাস্ত্রবিৎ মেণ্ডেলীফ (Mendeleef) স্বীয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সমুদায় লিপিবদ্ধ করিয়া ইউরোপীয় অপরাপর পণ্ডিতদিগকে রুষ ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই ত মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

অধিক কি, এসিয়া খণ্ডেই ইহার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে জাপান কি ছিল, আর আজ কি হইয়াছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যে সমুদায় স্বদেশ-প্রেমিক বর্ত্তমান জাপান গঠন করিয়াছেন, তাঁহারা উৎসাহী, আশাস্থল যুবক-বৃন্দকে প্রতীচ্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত ইউরোপে পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তৎতৎ দেশীয় পণ্ডিতদিগকে জাপানে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আনয়ন করেন। বলা বাহুল্য, যদিও উক্ত পণ্ডিতগণ স্ব স্ব ভাষার সাহায্যেই শিক্ষা প্রদান করিতেন, তথাপি শীঘ্রই সে সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। জাপান নিজের ভাষার আদর বুঝিল; বুঝিল বৈদেশিক ভাষাতে শিক্ষা কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না, বুঝিল মাতৃভাষার সৌষ্ঠবসাধন অবশ্যকর্ত্তব্য।

ফল কথা এই যে, আমরা যতদিন স্বাধীনভাবে নূতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব, ততদিন আমাদের ভাষার এই দারিদ্র্য ঘুচিবে না। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি এক প্রকার মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। যেমন ধনীর সন্তান পৈতৃক বিষয়বিভব হারা-

ইয়া নিঃস্বভাবে কালাতিপাত করেন, অথচ পূর্ব্ব-পুরুষগণের ঐশ্বর্য্যের দোহাই দিয়া গর্ব্বে স্ফীত হন, আমাদেরও দশা সেইরূপ। লেকি বলেন যে, দ্বাদশ খ্রীঃ শতাব্দী হইতে ইয়োরোপখণ্ডে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রথম প্রবাহিত হয়; প্রায় সেই সময় হইতেই ভারতগগন তিমিরাচ্ছন্ন হইল। অধ্যাপক বেবর (Weber) যথার্থই বলিয়াছেন, ভাস্করাচার্য্য ভারতগগনের শেষ নক্ষত্র। সত্য বটে আমরা নব্যস্মৃতি ও নব্যন্যায়ের দোহাই দিয়া বাঙ্গালীমস্তিষ্কের প্রখরতার শ্লাঘা করিয়া থাকি; কিন্তু ইহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে সময়ে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি মন্থন ও আলোড়ন করিয়া নবমবর্ষীয়া বিধবা নির্জ্জলা উপবাস না করিলে তাহার পিতৃ ও মাতৃ কুলের উর্দ্ধতন ও অধস্তন কয় পুরুষ নিরয়গামী হইবে, ইত্যাকার গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, যে সময়ে রঘুনাথ, গদাধর ও জগদীশ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ বিবিধ জটিল টীকা টিপ্পনী রচনা করিয়া টোলের ছাত্রদিগের আতঙ্ক উৎপাদন করিতেছিলেন, যে সময়ে এখানকার জ্যোতির্ব্বিদবৃন্দ প্রাতে দুই দণ্ড দশপল গতে নৈঋতকোণে বায়স কা কা রব করিলে সেদিন কিপ্রকারে যাইবে ইত্যাদি বিষয় নির্ণয় পূর্ব্বক কাকচরিত্র রচনা করিতেছিলেন, যে সময়ে এদেশের অধ্যাপকবৃন্দ "তাল পড়িয়া ঢিপ করে কি ঢিপ করিয়া পড়ে" ইত্যাকার তর্কের মীমাংসায় সভাস্থলে ভীতি উৎপাদন করিয়া সমবেত জনগণের অন্তরে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা উৎপাদন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইয়োরোপখণ্ডে গ্যালিলিও, কেপ্লার, নিউটন প্রভৃতি মনস্বিগণ উদীয়মান হইয়া প্রকৃতির নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক জ্ঞান-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছিলেন। তাই বলি, আজ সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি নিস্পন্দ ও অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, বিধাতার কৃপায় হাওয়া ফিরিয়াছে; মরা গাঙে সত্য সত্যই বাণ ডাকিয়াছে। আজ বাঙ্গালী জাতি ও সমগ্র ভারত নূতন উৎসাহে, নূতন উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত। যে দিন রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনই ভারতের সমৃদ্ধিসোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, সেই দিনই বুঝি বিধাতা ভারতের প্রতি পুনরায় শুভদৃষ্টিপাত করিলেন। জগতের ইতিহাস পর্য্যা-লোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল জাতি পুরাতন আচার ব্যবহার, জ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে নিতান্তই গোঁড়া, যাঁহারা প্রাচীন শিক্ষার ও প্রাচীন প্রথার নামে আত্মহারা হন, যাঁহারা বর্ত্তমান জগতের জীবন্তভাব জাতীয় জীবনে সংবেশিত করা হঠকারিতা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান কালের

ইতিহাসে নগণ্য ও মৃতপ্রায়; এমন কি, এই সমস্ত জাতি নূতনের প্রবল সংঘর্ষণে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই যে, বর্ত্তমান ইউরোপের শিক্ষা অত্যল্পকাল হইল আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু আমরা ইহা যেন না ভুলি যে বর্ত্তমান অবস্থায় ইয়োরোপ আমাদিগকে যোজনাধিক পশ্চাতে ফেলিয়া বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পূর্ণোন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। আমার স্বতঃই মনে হয়, আমাদের এই অধোগতির কারণ পুরাতনের প্রতি এক অস্বাভাবিক ও অনেক সময়ে অহেতুক আসক্তি এবং অপরাপর গুণাবলীর প্রতি বিদ্বেষ ও তাচ্ছিল্যের ভাব। এস্থানে অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আচারপদ্ধতি ও শিক্ষা অনেক সময়ে বর্ত্তমান সভ্যজাতিগণের আচার পদ্ধতি হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিল এবং সে সমুদায়ের প্রতি ভক্তিবিহীন হওয়া মূঢ়তার লক্ষণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে অনেক বিষয়ের আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে—যেমন বাহ্য জগতে, তেমনই মানসিক রাজ্যে। এস্থানে প্রশ্নটি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমি আশঙ্কিত হইতেছি, পাছে কাহারও মনে অপ্রীতি সঞ্চার করিয়া ফেলি; কিন্তু যদি স্বাধীন চিন্তা মানবমাত্রেরই পৈত্রিক সম্পত্তি হয়, তাহা হইলে আমাকে বলিতে হইবে যে, পরকীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের গ্রহণেচ্ছা আমাদের আদৌ নাই, যদি থাকিত, তাহা হইলে অন্ততঃ বিজ্ঞান বিষয়ে বর্ত্তমান ইউরোপ ও আমেরিকা আমাদের অনুকরণীয় হইত। এই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য শিক্ষার সংমিশ্রণের উপরেই আমার মতে ভাবী ভারতের সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। যে জাপান ত্রিংশ বর্ষ পূর্ব্বে ঘোর তমসাচ্ছন্ন ছিল, জগতে যাহার অস্তিত্ব (ঐতিহাসিক হিসাবে) সন্দেহের বিষয় ছিল, সেই জাপান পাশ্চাত্য শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার সহিত সংযোজন করিয়া আজ কি এক অভিনব ক্ষমতাশালী জাতি হইয়া আসিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে বিরাজ করিতেছে!

এখন জ্ঞানজগতে যেমন তুমুল সংগ্রাম, পার্থিব জগতেও ততোধিক। নূতনের দ্বারা পুরাতনের সংস্কার করিতেই হইবে, নচেৎ ভয় হয়, ভারতভাগ্য-রবি প্রভাতাকাশে উঠিয়াই অস্তমিত হইবে।

দেশের দুর্গতি ও দুরবস্থার বিষয় এখন চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন যে, যতদিন একদিকে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং অন্যদিকে কোটী কোটী নরনারী অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিবে, ততদিন আমাদের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার আশা খুব

কম। যাঁহারা ইংরাজী ভাষা অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান শিখিতেছেন, তাঁহারা অগাধ জলরাশি মধ্যে শিশিরবিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। মহামতি বাকল ইংলণ্ড ও জর্ম্মান দেশের শিক্ষাবিস্তার তুলনা করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে,জর্ম্মানদেশে সর্ব্ববিদ্যায় অসামান্য প্রতিভাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথচ রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে ইংলণ্ড অপেক্ষা পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ এই যে, জর্ম্মানদেশীয় পণ্ডিতগণ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া এমন এক "পণ্ডিতী" ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহা কেবল সঙ্কীর্ণ "গণ্ডীর" মধ্যে সীমাবদ্ধ; সে সমস্ত উচ্চভাব সমাজের নিম্নতর স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না। ইহার ফল এই হইয়াছে যে,মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে একরূপ একটী অনতিক্রম্য প্রাচীর স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান-বিষয়ক সাধারণের বোধগম্য অনেক সরল পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে তাহার ভাব ও স্থূলমর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। এই প্রকার শ্রেণী-গত পার্থক্য আমাদের দেশে অত্যধিক প্রবল। আরও একটী কথা, আমরা এতক্ষণ ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ও নীরেট অজ্ঞদলের কথা বলিলাম। ইহার মাঝামাঝি একদল পড়িয়া রহিলেন। অর্থাৎ যাঁহারা কেবলমাত্র সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যানে ব্রতী। ইঁহারা কলাপ ও পাণিনি; কালিদাস, মাঘ ও ভারবী; জটিল ন্যায় শাস্ত্র,এতদ্ভিন্ন বেদ,বেদান্ত ও দর্শন লইয়াই ব্যস্ত। মোটামুটী বলিতে গেলে তাঁহারা ১৫০০ হইতে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ভারতে বাস করেন। ইঁহাদিগকে আমরা অবশ্য আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে গণনা করিতে কুণ্ঠিত হই; কিন্তু আবার ইঁহারাই সমাজে "পণ্ডিত" উপাধিধারী এবং ইঁহাদের আধিপত্য জনসাধারণের উপর ব্রিটীশসাসন অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত ও কঠোর। এই শ্রেণীকে একেবারে বাদ দিলে চলিবে না।

কেহ কেহ বলিবেন যে, ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণী লোপ প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। গবর্ণমেণ্ট হইতে "উপাধি" প্রদানের যে পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহার "আদ্য" "মধ্য" ও "উপাধি" এই তিন বিভাগে কেবল বঙ্গদেশে প্রতিবৎসর অন্যূন ৪৫০০ পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়া থাকেন। সমগ্র টোলের ছাত্র সংখ্যা ইহাপেক্ষা অনেক অধিক। অতএব দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানের গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইলে এমত সহস্র সহস্র ইংরাজী অনভিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণের হাতে পৌছিবে, যাহা ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের পক্ষে কদাচ সম্ভব নয়। অবশ্য যাঁহারা

বিজ্ঞান চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিয়া মৌলিকতত্ত্ব নির্ণয় ও গবেষণায় সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিবেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা ইংরাজী কেন, জর্ম্মান ও ফরাসী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীও পাঠ করিতে বাধ্য হন।

আমাদের বলার উদ্দেশ্য এই যে, যাঁহারা "শিক্ষিত" বলিয়া অভিহিত, তাঁহাদের বিজ্ঞানের মূল তাৎপর্য্যগুলি জানা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অর্থাৎ আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই বিজ্ঞানশাস্ত্রসম্বন্ধীয় সাধারণ বিষয়গুলি মোটামুটি জানা বিশেষ আবশ্যক।

এখন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিব। জাপানিরা জর্ম্মানি ও রুষিয়ার ন্যায় যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মাতৃভাষায় প্রচার করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা মধ্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন, অর্থাৎ মৌলিক গবেষণা সমূহ ইংরাজি ও জর্ম্মান ভাষায় প্রকাশিত করেন, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে বিজ্ঞানের নানাবিধ মূলতত্ত্ব প্রচার হইতে পারে, তজ্জন্য মাতৃভাষা অবলম্বন করিয়াছেন। ইয়োপীয় জাতিদিগের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য থাকিলেও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রায় একই; সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগতে একই পরিভাষা হইলে যে কতদূর সুবিধা হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। জাপানিরা এই সুবিধা টুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়াই মধ্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন; আমাদেরও তাহাই অবলম্বনীয়, কেননা, উক্ত জাতির অবস্থার সহিত আমাদের অবস্থার বিশেষ সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান।

ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃজন করা সাহিত্যসম্মিলনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আহ্লাদের বিষয়, কয়েক বৎসর যাবৎ সাহিত্য-পরিষৎ এ বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহোদয়গণ তজ্জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় সাময়িক পত্রিকায় যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন, তাহাতেও এ বিষয়ে সহায়তা হইতেছে। নাগরীপ্রচারিণী সভা ভূগোল, খগোল, অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি ঘটিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলন করিয়াছেন। পরলোকগত জগন্নাথ স্বামী তেলেগু ভাষায় রসায়নশাস্ত্র বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন ও তাহাতে সংস্কৃতমূলক অনেক পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। সম্প্রতি Vernacular Text Book Committee বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংকলন করিয়াছেন এবং আশা করা যায়, সাহিত্য সম্মিলনও এই অধিবেশনে একটি বিশেষজ্ঞের সমিতি

(Committee of Experts) নিয়োজিত করিয়া কি ভাবে পরিভাষা গৃহীত হইবে, তাহার নিষ্পত্তির উপায় বিধান করিবেন।

বর্ত্তমান সাহিত্য সম্মিলনের অনুষ্ঠাতাগণ বাঙ্গালা সাহিত্যকে সাধারণ সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্য, এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া শেষোক্ত বিভাগের কার্য্যক্ষেত্র British Associatiou for the Advancement of Learning and Scienceএর আদর্শে যে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহা সদ্‌যুক্তি বলিয়া বোধ হয়। মানবতত্ব (Anthropology) পুরাতত্ব, (Ethnology) ভূগোল, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা, ভূ-বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হইয়া যাহাতে তৎ তৎ বিষয়ক গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হয়, তজ্জন্য আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। আশা করি, এই অধিবেশনে রাজসাহী বিভাগের লোকতত্ব সম্বন্ধে দুই একটী সারবান প্রবন্ধ পঠিত হইয়া ইহার সূচনা হইবে। অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় এই যে রাজসাহীর কয়েকজন কৃতবিদ্য সন্তান পুরাতত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে নূতন পথ দেখাইয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের পাত্র হইয়াছেন। বাঙ্গালী যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া ইতিহাস রচনা করিতে সক্ষম, সিরাজদ্দৌলা-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। আমার বন্ধু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ইয়োরোপ ও ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে বহু দুর্লভ পারসী পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেই সকল মন্থন করিয়া রত্নাবলী আহরণ করিতেছেন। তিনি যে সমুদায় বিবরণ লিখিতেছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আমি অনেক সময়ে আত্মবিস্মৃতি লাভ করিয়াছি এবং নিজকে কল্পনায় অনেক সময়ে ঔরঙ্গজেব বাদসাহের সমকালীন বলিয়া মনে করিয়াছি। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ মহৎকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন এবং মোগলরাজ্যের বিশাল ইতিহাস লিখিয়া মাতৃভাষার সৌষ্ঠব সাধন করেন, ঈশ্বরের নিকট ইহাই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল বহুপরিশ্রমে মুসলমান বৈষ্ণবদিগের প্রাচীন পদাবলী সংগ্রহ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন।

আজ আমরা নূতন জাতীয় জীবনের প্রাসাদের প্রথম সোপানে দণ্ডায়মান। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে দেশে 'জাতীয় জীবন' ইত্যাদি আশা ও উৎসাহের কথা অলীক ও কবিকল্পনা-প্রসূত উন্মাদোক্তি বলিয়া বিবেচিত হইত, যে দেশ স্বদেশপ্রেম বলিয়া কথা বহু শতাব্দী যাবৎ বিস্মৃত ছিল, যে দেশ মাতৃভাষা

ভুলিয়া এতদিন বৈদেশিক ভাষাকে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বার বিবেচনা করিত, সেই দেশে আজ কি এক অপূর্ব্ব ভাব আসিয়া মৃত প্রাণে কি অমৃত বারি সিঞ্চন করিয়া সঞ্জীবিত করিল। যে যুবকগণের কাষ্ঠহাসি দর্শনে পূর্ব্বে আশঙ্কার উদ্রেক হইত, যে দেশের প্রৌঢ়গণের মিতব্যয়িতা আত্মপ্রবঞ্চনামূলক বলিলে অত্যুক্তি হইত না, আজ কি এক অপূর্ব্ব ঈশ্বরপ্রেরিতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই যুবক সরসবদনে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি লোকসেবায় জাতীয় শিক্ষায় অকাতরে বহুকষ্টসঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করিল। ইহা কি আশার কথা নহে—ইহা ভাবিলেও কি প্রাণে শক্তি সঞ্চারিত হয় না? দুই বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গালী যুবক পিতামাতার স্নেহক্রোড় ত্যাগ করিয়া অথবা নবপরিনীতা ভার্য্যাকে ছাড়িয়া বৈদেশিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য দূরদেশে যাইতে কুণ্ঠিত হইত, আজ জানি না কি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব, অচিন্ত্যপূর্ব্ব ভাবে প্রোৎসাহিত হইয়া জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিতে সেই যুবক বিদেশযাত্রা করিল। তাই বলিতেছিলাম, আজ আমরা জাতীয় জীবনের সোপানে দণ্ডায়মান—আজ নূতন আশা, নূতন উদ্দীপনার দিন!

বাঙ্গালায় এমন দীন হীন কাঙ্গাল হতভাগ্য কে আছ ভাই, যে আজ বিধাতার মঙ্গলময় আহ্বানে আহূত হইয়া মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার আরতির জন্য নৈবেদ্যোপচার লইয়া সমুপস্থিত না হইবে? ধনি! তুমি তোমার অর্থ লইয়া, বলি! তুমি তোমার বল লইয়া, বিদ্বান! তুমি তোমার অর্জ্জিতবিদ্যা লইয়া—সকলে সমবেত হও।

আজ আমরা যুগসন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। সমস্ত ভারত আজ আমাদিগের দিকে সোৎসাহনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে, স্বর্গ হইতে পিতৃপুরুষ আমাদের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিতেছেন। আজ আমরা জাতীয় জীবনের এমন একস্তরে দণ্ডায়মান, যেখানে আমাদের সম্মুখে দুইটী মাত্র পথ, একটী অনন্ত অমরত্বের, অপরটি অনন্ত অকীর্ত্তির, মধ্যপথে আর কিছুই নাই। আজ যদি আমরা তুচ্ছ আয়াসে মজিয়া ভবিষ্যৎ প্রেরিত এই মহাভাব উপেক্ষা করি, ভবিষ্যৎ বংশাবলী আমাদিগকে বিশ্বাসঘাতক উপাধিতে কলঙ্কিত করিবে, ভারতাকাশের উদীয়মান রবি উষার উন্মেষেই, হায়, আবার অস্তমিত হইবে।

কিন্তু আজ আশার দিন, আজ উদ্দীপনার যুগ। বাঙ্গালা এ আহ্বান উপেক্ষা করে নাই—সতীশচন্দ্র ও রাধাকুমুদের ন্যায় বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী যুবক, সুবোধচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রকিশোর, সূর্য্যকান্ত, মণীন্দ্রচন্দ্র, তারকনাথ, যোগেন্দ্র

নারায়ণ প্রভৃতি ধনাঢ্যগণ যে দেশের জাতীয় শিক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর ও মুক্তহস্ত,সে দেশ নিশ্চয়ই উঠিবে—সে দেশের ভাষা ও বিজ্ঞান কখন উপেক্ষিত থাকিবে না। যাহাতে অধীতবিদ্য, বিজ্ঞানবিদ্ ছাত্রগণ বৃত্তিলাভ করিয়া অন্নচিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ও অনন্যমনে বিজ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা দেশের সেবায় মনপ্রাণ নিয়োগ করিতে পারে, এমন উপায় নির্দ্ধারণ করুন। সৌভাগ্যক্রমে এখন কৃতবিদ্য ও নিষ্ঠাবান ছাত্রের অভাব নাই। তাহারা বিলাসবিভ্রমের প্রত্যাশী নহে। যাহাতে তাহাদের সাংসারিক অভাব মোচন হয় ও তাহারা একান্ত মনে বিজ্ঞান সেবায় ব্রতী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করুন। জ্ঞান জাতীয় জীবনের উৎস। এই উৎসের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য আবার ভারতে নিষ্কাম জ্ঞানচর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হউক।”

পরিশিষ্ট।

ইং ১৯০১—১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ।

বিষয়	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬	১৯০৭
জীবনী	২৫	১৮	১৯	২২	১৫	১৫	২০
ইতিহাস	২০	৪১	১৮	৪২	২৭	২৬	৩১
ভাষা ও ব্যাকরণ	২১২	২১৮	১৭৭	১৫১	১১১	১০১	৬৪
দর্শন ও নীতিবিজ্ঞান	২	৪	৩	৩	১	৩	৩
Arts	১১	২৫	১৪	১৯	১৬	৩০	২২
নাটক	৬২	৬৭	৪৭	৬৩	৬২	৭৪	৩৯
উপন্যাস	৮৪	১১০	১০২	৮৫	৯১	১১০	১২৩
পদ্য	১২০	১২০	৮৭	৮৪	৭৫	৯৩	৫৫
ধর্ম্ম	৩৪৮	৪০০	৩০১	২৮৯	২২৩	২৯৪	২৩৩
চিকিৎসা	৫০	৬৮	৪১	৬০	৬০	৭৩	৬১
আইন	১৬	২৭	১৬	১৫	১৩	৭	১১
রাজনীতি	...	...	...	১	...	...	...
বিজ্ঞান	৩২	২৩	১৯	১৩	১৭	১৩	১০
বিজ্ঞান (গণিত বিভাগ)	৪২	৬২	৪৫	৪৪	২৫	১৮	৩৩
ভ্রমণ	১	১	৪	৪	৩	৩	...
বিবিধ	৫১১	৫৭৭	৪৬৩	৫৭৪	৬৪৫	৬৪৭	৪৮৪
মোট	১৫৩৬	১৭৬১	১৩৫৬	১৪৬৯	১৩৮৪	১৫০৭	১১৮৯

২

ইং ১৯০১—১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত মুসলমানী বাঙ্গালা পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ।

বিষয়	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬	১৯০৭
জীবনী	১	...	...	...	...	...	...
ইতিহাস	...	১	...	৩	২	১	...
উপন্যাস	১৭	১৭	১১	১৪	৪	৫	...
ধর্ম্ম	১৯	১৭	১১	১৯	৯	৬	৭
ভাষা ও ব্যাকরণ	...	...	...	১	...	...	...
বিবিধ	২৭	১৫	৫	১২	১	৫	১
মোট	৬৪	৫০	২৭	৪৯	১৬	১৭	৮

৩

	সমগ্র প্রকাশিত পুস্তক	বাঙ্গালা পুস্তক	শতকরা বাঙ্গালা পুস্তক	শতকরা বাঙ্গালা ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক	বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক পুস্তক	স্কুলপাঠ্য বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক পুস্তক	শতকরা স্কুলপাঠ্য বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক পুস্তক
১৯০১	৩০৬৯	১৫৩৬	৫০.০৪	২২.৬৫	৭৪	৬২	৮৩.৭৮
১৯০২	৩৩৬৬	১৭৬১	৫২.৩১	২২.৭১	৮৫	৭৪	৮৭.০৫
১৯০৩	২৮৮৭	১৩৫৬	৪৬.৯৬	২২.১৯	৬৪	৬৪	১০০
১৯০৪	৩০৫৪	১৪৬৯	৪৮.১০	১৯.৬৭	৫৭	৫৭	১০০
১৯০৫	২৮০০	১৩৮৪	৪৯.৪০	১৬.১১	৪২	৪২	১০০
১৯০৬	৩৪৪০	১৫০৭	৪৩.৪০	১৯.৫০	৩১	২৯	৯৩.৫৫
১৯০৭	২৯৯৫	১১৮৯	৩৯.৬৯	১৯.৫৯	৪৩	৪১	৯৯.৯৯

সভাপতির বক্তৃতা।

অনন্তর রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের প্রস্তাব ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সমর্থন ও সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এম-এ, ডি-এস্-সি, পি-এচ-ডি মহাশয় সভাপতি পদে বরিত হইয়া অভিভাষণ পাঠ করেন।

তৎপর যে সকল মহোদয় ইচ্ছা সত্ত্বেও অনিবার্য্য কারণ বশতঃ সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, অথচ পত্র বা টেলিগ্রাম দ্বারা স্ব স্ব সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন, সম্পাদক কর্ত্তৃক তাঁহাদের নাম সভাক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত হয়। নিম্নে কতিপয় মহাত্মার নাম লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর।

„ রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর—সম্পাদক সাহিত্য-সভা।

„ মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন--সম্পাদক ঢাকা-সারস্বত-সমাজ।

„ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

„ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

„ বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

„ রাজা ঘনদানাথ রায় বাহাদুর—দুবলহাটী রাজবাটী।

„ পণ্ডিত রজনীকান্ত তর্করত্ন—ধানুকা চতুষ্পাঠী।

„ মতিলাল ঘোষ।

„ গিরীশচন্দ্র ঘোষ।

„ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

„ অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

„ যোগীন্দ্রনাথ বসু।

„ যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রভৃতি।

অতঃপর নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট টেলিগ্রাম ও পত্র প্রেরিত হয়। সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে সম্মিলনের ঐক্যমতে পরিগৃহীত হয়।

মৃত সাহিত্যিকগণের নাম যথা,—

নবীনচন্দ্র সেন।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী।

শ্যামলাল গোস্বামী।

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

মহারাজা শুার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর।

মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর

পূর্ণচন্দ্র বসু।

মন্মথনাথ সেন।

মন্মথনাথ দত্ত।

রায় রামব্রহ্ম সান্ন্যাল বাহাদুর।

কালীনারায়ণ সান্ন্যাল।

অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।

প্রারম্ভে পূর্ব্ববৎ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন মহাশয় কর্ত্তৃক তদ্রচিত নীচের সঙ্গীতটী গান করা হয়।

তিমিরনাশিনী, মা আমার!
হৃদয়-কমলোপরি, চরণ কমল ধরি',
চিন্ময়ী-মূরতি অখিল-আধার!
নিন্দি' তুষার-কুমুদ-শশি-শঙ্খ,
শুভ্র-বিবেক-বরণ অকলঙ্ক,
মুক্ত-শূন্য-ময়, শ্বেত রশ্মি-চয়,
দূর করে তমঃ-তর্ক-বিচার।
ওই করিল করুণাময়ী দৃষ্টি,
সম্ভব হইল জ্ঞানময়ীসৃষ্টি ;
আদি-রাগ-ধর, বীণ-সুধা-স্বর,
জাগ্রত করিছে নিখিল সংসার।
কালিদাস-ভবভূতি, মহাকবি,
বাল্মীকি, ব্যাস, ভাগবত ভারবি,
ও পদ-ধূলি-বলে, লভিল ধরাতলে,
অক্ষয় কীর্ত্তি, পরম সৎকার।
জ্যোতিষ-গণিত-কাব্য-শুভ-হস্তে!
ভগবতি! ভারতি! দেবি! নমস্তে!
দেহি বরপ্রদে! জ্ঞানমত্তর পদে,
ত্বরিতে দূর কর মোহ-আঁধার।

তৎপর সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম-এ মহাশয়ের সমর্থনে প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদ্যথা—

"বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের একটী সমিতি গঠিত হউক। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঐ সমিতির কার্য্য করিবেন। তাঁহার আবশ্যকমত সমিতির সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।"

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতি।
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।
পঞ্চানন নিয়োগী।
হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত—সম্পাদক।
নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
যোগেশচন্দ্র রায়।
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
জগদানন্দ রায়।
দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী।
শশধর রায়।
বোধিসত্ত্ব সেন।
বিধুভূষণ দত্ত।
প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সুবোধচন্দ্র মহালানবিশ।
জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী।
গোপালচন্দ্র সেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম-এ মহাশয় উপস্থিত করেন ও শ্রীযুক্ত আবদুল মজিদ সাহেব সমর্থন করেন। তদ্যথা—

"বাঙ্গালা সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রচলিত শব্দই যথা-যোগ্যরূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। সম্মিলনের অনুরোধ যে,গ্রন্থকারগণ এবিষয়ে অবহিত হইবেন।"

সমর্থনকারী বলেন,—"বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালীর সাহিত্য। ইহাতে হিন্দুধর্ম্ম বা মুসলমানধর্ম্ম বা অন্য কোন ধর্ম্মের বিশেষত্ব যে সকল স্থান ব্যক্ত

বা আলোচিত হইবে, তাহাতে ঐ ঐ ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ অর্থবোধক শব্দ ও প্রয়োগ ব্যবহার করা সঙ্গত হইতে পারে; কিন্তু অন্যত্র তদ্রূপ হইবার কোন কারণ নাই। বাঙ্গলা ভাষা মুসলমানগণেরও মাতৃভাষা, সুতরাং মুসলমানী বাঙ্গালা পৃথক বাঙ্গলা হইতে পারে। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মে পৃথক, ভাষাতে নহে। সুতরাং উভয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যই এক প্রকার হওয়া উচিত। যাঁহারা বিপরীত মত পোষণ করেন, তাঁহারা বাঙ্গালী খ্রীষ্টানগণের কি ভাষায় সাহিত্য প্রণয়নের ব্যবস্থা দিবেন? ভাষার একতায় ব্যক্তিগত একত্ব; আবার ব্যক্তিগত একত্বেই ভাষার একত্ব, একথা এস্থলে বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। কেবল ধর্ম্ম বা আচার সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ ভাবব্যঞ্জক শব্দ প্রয়োগ বিভিন্ন রাখিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। এ নিমিত্ত উভয় সম্প্রদায়ের প্রচলিত শব্দই বঙ্গসাহিত্যে ব্যবহৃত হওয়া উচিত।"

তৃতীয় প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় উত্থাপন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ সমর্থন করেন। তদ্যথা,—

"বাঙ্গালার মানবতত্ত্বালোচনার উদ্দেশ্যে আপাততঃ রাজসাহী জেলার বিভিন্ন ধর্ম্ম, বর্ণ, জাতি ও ব্যবসায় ভুক্ত-জনগণের বংশহানি ও বংশবৃদ্ধির গতি পর্য্যবেক্ষণ ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত রাজসাহীকে অনুরোধ করা হউক।"

চতুর্থ প্রস্তাব—প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এম-এ উত্থাপন এবং শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি-এল ও শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত সমর্থন করেন। তদ্যথা,—

"বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে উত্তর বঙ্গ হইতে উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক গ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য ভারগ্রহণে রাজসাহীকে অনুরোধ করা হউক। সংগৃহীত তথ্য আগামী বৎসরের সম্মিলনে উপস্থিত করিতে হইবে।"

প্রস্তাবক বলেন,—

"রাজসাহী-নিবাসী ভদ্র মহোদয়গণ,—

আপনারা দেশভক্তি-প্রণোদিত হইয়া এ বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত সাহিত্যসেবকগণের পরিচর্য্যার গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন; আমরা আপনাদের সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি, এবং রাজসাহীর রাজোচিত আতিথ্য-ভাবের উপর আর একটা গুরুভার চাপাইতে সাহসী হইতেছি; তাহা এই:—

বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি-তত্ত্ব-নিরূপণের জন্য উত্তর হইতে উপকরণ সংগ্রহ

করিয়া গ্রন্থ প্রচার আবশ্যক—এতদর্থে রাজসাহীকে অনুরোধ করা হউক, এবং আগামী বৎসরের সাহিত্য-সম্মিলনে সংগৃহীত তথ্য উপস্থিত করা হউক।

নিমন্ত্রিত অতিথিগণের বোঝার উপর এই নূতন আর একটা বোঝাকে আপনারা নিতান্তই শাকের আটি করিয়া গ্রহণ করিবেন কিনা, জানি না; কিন্তু সভাপতি মহোদয়ের আদেশ লঙ্ঘনে আমার ক্ষমতা নাই। আজ যাঁহাকে আপনারা সভাপতির পদে বরণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন, আমি আমাকে তাঁহার একান্ত অনুবর্ত্তী অনুচর মধ্যে গণ্য করিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করিয়া থাকি। তাঁহার আদেশেই আমাকে বাধ্য হইয়া এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার প্রতি যে কঠোর আদেশ হইয়াছে, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সভাপতি মহোদয় সেই আদেশ পালনে আমার যোগ্যতা টুকুও বিস্মৃত হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং আলোক-বর্ত্তিকা হাতে লইয়া বিজ্ঞান শাস্ত্রের অজ্ঞানাচ্ছাদিত যে পথে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন, আমিও অতি দূরে থাকিয়া সেই পথে তাঁহার পশ্চাতে অনুসরণ করি; সেই পথের উপযুক্ত কোন একটা আদেশ দিলে বরং আমি সাহস করিয়া দুইটা কথা বলিতে পারিতাম, কিন্তু সহসা তিনি আমাকে পথে ঠেলিয়া দিয়াছেন, যেখানে কোন কথা উচ্চারণ করিতে গেলে আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চার ধৃষ্টতা আসিয়া পড়ে। কাজেই অমি অতি সভয়ে ও অতি সংক্ষেপে আমার উদ্দেশ্যই আপনাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিয়া আপনাদের নিকট বিদায় লইব।

এই উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিবার পক্ষে আমার সামান্য একটু অধিকার আছে। কলিকাতা হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে কতিপয় সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী বন্ধুর সহিত আমি আপনাদের আহ্বানে এখানে উপস্থিত হইয়াছি; সেই সাহিত্য-পরিষৎ সভা এক্ষণে আপনাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে। এই রাজসাহী নগরে সেই সাহিত্য-পরিষদের একটী শাখা আছে, এবং আপনাদেরই মান্য ব্যক্তিগণ সেই শাখার পরিচালনা করিতেছেন। সেই সাহিত্য-পরিষদের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য—বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের পথ দিয়া বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালী জাতির বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন বিভাগ মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বন্ধন স্থাপন দ্বারা জাতীয় ঐক্য স্থাপন। আমরা আমাদের দেশকে ও আমাদের জাতিকে নিতান্ত আত্মীয় ভাবে জানিতে চাই। বাঙ্গালা দেশের কোথায় কি আছে ও কোথায় কি ছিল, বাঙ্গালী জাতির সম্পৎ কোথায় কি আছে, কোথায় কি ছিল,

তাহা আমরা জানিতে চাই। এই জন্ত আমাদের মনে একটা আকাঙ্ক্ষা, একটা আগ্রহ জন্মিয়াছে, এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলে আমাদের তৃপ্তি হইবে না। সকল জ্ঞানের মূলে আত্মজ্ঞান! আমরা কে, আমরা কি, আমরা কোথা হইতে কিরূপে কোন সময়ে কি জন্ত আসিয়াছি, এই জ্ঞান লাভ আমাদের পক্ষে আবশ্যক, বিধাতা কি উদ্দেশ্যে পৃথিবীর কোন্ কার্য্য সাধনের জন্ত আমাদিগকে এই ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা সেই জ্ঞান লাভ হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব এবং তখনই আমরা আমাদের সামর্থ্য বুঝিয়া আমাদের যোগ্যতা নিরূপণ করিয়া জগতে আমাদের সাধ্যমত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইব। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ যে উদ্দেশ্ত লইয়া জন্মিয়াছে, আমি এই গোঁড়ার তত্ত্বনিরূপণকেই তন্মধ্যে উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্তই আমাদের ব্যগ্রতা, এই জন্ত আমরা এই সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষ করিয়া বঙ্গভূমির জেলায় জেলায় ছুটাছুটি করিতে প্রস্তুত হইয়াছি এবং এ বৎসর আপনাদের শান্তি ভঙ্গ করিতেছি। আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে,আমরা যে দেশের পরিচর্য্যা করিতে ইচ্ছুক,সেই মহাদেশের—সেই হিন্দু মুসলমানের মহাদেশের—আমরা যে জাতির জাতীয় ভাবের প্রতিষ্ঠার জন্ত চেষ্টা করিতেছি, সেই মহাজাতির—সেই হিন্দুমুসলমান মহা-জাতির—সম্যক্ পরিচয় জানি না—আমাদের কোথায় কোন্ রত্ন নিহিত আছে, আমাদের কোথায় কি বল আছে, তাহা আমরা জানি না—পৃথিবীর নিকট আমাদের আত্মপরিচয় পুরা সাহসের সহিত আমরা দিতে পারি না। আমরা কোথা হইতে এদেশে আসিলাম, আমাদের আদিপুরুষ কে ছিলেন, তাঁহারা কবে কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তাহা আমরা জানি না—আমাদের নিজের পরিচয় জানিবার জন্ত আমাদিগকে বৈদেশিকের মুখের দিকে চাহিতে হয়—হণ্টার সাহেবের ষ্ট্যাটিষ্টিকাল্ গ্রন্থ খুঁজিতে হয়—বিদেশী রাজপুরুষের সংগৃহীত সেন্সাসের খাতার পাতা উল্টাইতে হয়। ইহা পরিতাপের বিষয়—ইহা লজ্জার বিষয়। এই লজ্জা দূর করা আবশ্যক—আমাদের জাতীয়ত্বের মূল কোথায় প্রতিষ্ঠিত, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে, সেই মূল হইতে কিরূপে মহীরুহ নির্গত হইয়া শাখাপ্রশাখা প্রসারিত করিয়াছে, তাহা জানিতে হইবে ; তবে আমরা আমাদের জাতীয়তা লইয়া জগতের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইব। নতুবা আমাদের জাতীয়তার স্পর্দ্ধা কেবল বৃথা বাগাড়ম্বর ও উপহাস্ত আস্ফালনমাত্র হইবে। আমরা স্বদেশের মরমকে

দাঁড়াইয়া স্বদেশের ভাবের অভিনয় করিলে—বাহিরের জগৎ আমাদের অভিনয় দেখিয়া হাসিবে ও করতালি দিবে।

রাজসাহীর নিকট আমরা কি প্রার্থনা করিতেছি, একটা দৃষ্টান্তে বুঝা যাইবে। আমার পরম স্নেহভাজন আপনাদের আদরের পাত্র শ্রীমান্ কুমার শরৎকুমার রায় আজ প্রাতে আপনাদিগকে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়াছেন। এই রাজসাহী সেই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের এক খণ্ড মাত্র।

স্থূলতঃ এখন বরেন্দ্রভূমি বলিলে যাহা বুঝি, এককালে তাহা পৌণ্ড্রভূমি ছিল। সেই পৌণ্ড্ররাজের রাজধানী পাণ্ডুয়ায় ছিল, কি মহাস্থানে ছিল, তাহা লইয়া ঐতিহাসিকেরা বিতণ্ডা করিতেছেন; কিন্তু এই দেশ যে এক কালে পুণ্ড্রজাতির দেশ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, এই পুণ্ড্রজাতি এখন কোথায়? আধুনিক পুঁড়ো, পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকাক্ষ কি তাঁহাদেরই বংশধর? পুণ্ড্রজাতি এখন লুপ্ত হইয়াছেন, অথবা এই বরেন্দ্র জনপদ এখনও পৌণ্ড্রজাতিরই ভূমি রহিয়াছে, কি পৌণ্ড্রক রীতি নীতি উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা না জানিলে আমরা বরেন্দ্রভূমি ও বরেন্দ্রসমাজ চিনিব কিরূপে?

এখনকার রাজসাহী মুসলমানপ্রধান বা হিন্দুপ্রধান—তাহা লইয়া তর্ক করিয়া আপাততঃ লাভ নাই। আমরা সাহিত্য-সম্মিলনে আসিয়া রাজসাহীকে হিন্দুমুসলমান প্রধান বলিয়াই দেখিব এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনকে হিন্দু মুসলমানের অন্যতম সম্মিলনোপায় বলিয়াই জানিব। কিন্তু এমন দিন ছিল, তখন রাজসাহীতে মুসলমান ছিলেন না, হিন্দুও ছিলেন না। সে বহুদিনের কথা; তখন এই ভূমি অনার্য্যভূমি ছিল—অনার্য্যভূমিতে আর্য্যাধিকার প্রসারের পরে ইহা হিন্দুর দেশ এবং আরও পরে হিন্দু মুসলমানের দেশ হইয়াছে! কিন্তু সেই অনার্য্য আদিম নিবাসী এখনকার হিন্দু মুসলমান সমাজের মধ্যে কি চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন?—এই হিন্দু মুসলমান সমাজের মধ্যে কতটুকু অনার্য্যত্ব কতটুকু আর্য্যত্ব মিশ্রিত আছে? এককালে যে পুণ্ড্রজাতির এখানে অবিসংবাদী অধিকার ছিল, তাঁহারা অনার্য্য ছিলেন কি আর্য্য ছিলেন?

ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ও সমাজতাত্ত্বিকগণের সকল মত আমরা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহি, কিন্তু তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তকে উপহাসে উড়াইতে সম্প্রতি আমাদের অধিকার নাই। অন্ততঃ যতদিন হাণ্টারের গেজেটিয়ার ও রিজলির সেন্সাস্ বহির পাতাই আমাদের আত্মপরিচয় লাভের একমাত্র অবলম্বন

থাকিবে, ততদিন সেইরূপ উপহাসে আমাদিগের অধিকার নাই। ইংরেজ লেখকেরা বলিতে চাহেন, বঙ্গদেশের সমাজ মুখ্যতঃ অনর্য্যে সমাজ—বাঙ্গালীর শোণিতের চৌদ্দ আনা অনার্য্যরক্ত। এমন কি, অনেকে ইহাও বলিতে চাহেন যে, আধুনিক বাঙ্গালী যে ভাষায় কথা কহেন, সে ভাষা সংস্কৃত আর্য্যভাষার পরিচ্ছদ পরিয়া থাকিলেও উহা মূলে অনার্য্য ভাষা; উহার অস্থিমাংস আর্য্য উপকরণে গঠিত হইলেও উহার মজ্জামধ্যে অনার্য্যত্ব প্রচ্ছন্ন আছে। বিদেশী পণ্ডিতদের এই সকল সিদ্ধান্ত আমাদের রুচিকর হয় না। অথচ এই সকল সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ জন্য যে প্রমাণের প্রয়োজন, অবশ্য সে সকল প্রমাণ আমাদের হাতে নাই, আমরা সেই প্রমাণ সংগ্রহের জন্য কোন চেষ্টা করি নাই। প্রাচীন পৌণ্ড্র জাতিই অনার্য্য ছিল, কি আর্য্য ছিল, তাহা আমরা ঠিক জানি না। অতি প্রাচীনকালে আমরা পৌণ্ড্রক জাতির আধিপাত্যর নিদর্শন পাই। বৈদিক সাহিত্যে এই জাতির উল্লেখ আছে, মহাভারতে পুরাণে, ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাদের উল্লেখ আছে। পৌণ্ড্রক নরপতি বাসুদেব ভগবান দ্বারকাপতি বাসুদেবের রাজচিহ্ন ধারণে সাহসী হইয়া তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতার স্পর্দ্ধা করিতেন, এই কাহিনী পুরাণমধ্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে জাতির এক সময়ে এইরূপ প্রভাব ছিল, তাঁহারা আর্য্য না অনার্য্য? আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহাদের সভ্যতার অধিকার পাইয়াছি, না বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিজস্ব অপহরণ করিয়াছি, এই মূল তথ্যের এখনও মীমাংসা হয় নাই। বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ পিতৃকর্ত্তৃক নির্ব্বাসনের পর পূর্ব্বদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া দস্যুর সংখ্যা বাড়াইয়াছিলেন, এই আখ্যায়িকার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে? আর্য্যবংশীয়েরা আর্য্যজাতির মধ্যদেশের আর্য্য-সমাজ হইতে দূরে সরিয়া শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়া-লোপহেতু নিন্দিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই উক্তির মধ্যেই বা কতটুকু সত্য আছে? ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা হয়ত একবাক্যে বলিবেন, পৌণ্ড্র জাতি অনার্য্য জাতি, কিন্তু আমরা এই সকল প্রাচীন কিংবদন্তীকে একবারে উপেক্ষা করিতে পারি না। সাহিত্য-সম্মিলনের বৈজ্ঞানিক সভাপতি মহাশয় আমাকে সমর্থন করিবেন যে, বৈজ্ঞানিক বিচার-পদ্ধতি কোন পণ্ডিতেরই বাক্যকে অভ্রান্ত বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে—সেই পণ্ডিতের গায়ের চামড়া কালই হউক আর ধ'লই হউক।

আমরা রাজসাহীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা এই প্রশ্নের মীমাংসার পথ একটু প্রশস্ত করিয়া দিন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দেশের ইতিহাস,

লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু ইতিহাসের প্রচুর উপকরণ এখনও দেশের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ক্রমে সেই উপকরণ সংগৃহীত হইলে তাহা হইতে দেশের ইতিহাস আবিষ্কৃত হইবে। সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি মহাশয় কিমিয়া বিদ্যাকে আপনার বশীভূত করিয়াছেন; তিনি আমাদিগকে শিখাইতেছেন, কিরূপে উৎকট যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষণ দ্বারা তাহার অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন মূল উপকরণগুলি বাহির করিতে পারা যায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কেবল কিমিয়া বিদ্যার একচেটিয়া নহে। ঐতিহাসিকেরাও সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আশ্রয় করিয়া আমাদের এই যৌগিক সমাজকে বিশ্লেষণ দ্বারা তাহার অন্তর্গত মূল উপাদান গুলি আবিষ্কারে সমর্থ হইতে পারেন। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত, যিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিনিধি স্বরূপে এই সভায় উপস্থিত আছেন, তিনি আমাদিগকে বুঝাইবেন, কিরূপে পদ্মা মহানদীর তীরদেশের মাটি খুঁড়িয়া প্রচ্ছন্ন জীবাস্থির বা উদ্ভিজ্জদেহের আবিষ্কার দ্বারা দেখান যাইতে পারে, পদ্মাদেবী কিরূপে এবং কত বৎসরে হিমালয়ের বুক চিরিয়া হিমাদ্রি পাষাণকে দ্রবীভূত করিয়া সেই দ্রবীভূত পাষাণের স্তরের উপর স্তর গাঁথিয়া এই সুজলা সুফলা বরেন্দ্র ভূমিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। কোন ইতিহাস লেখক এই পদ্মাদেবীর এই বিচিত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই, কিন্তু আমার ভূতত্ত্ববিৎ বন্ধু পদ্মাদেবীর কত লক্ষ বৎসরের ইতিবৃত্ত এক নিশ্বাসে আপনাদিগকে শুনাইয়া দিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিবেন না। সেইরূপ, আমি বলিতে চাহি, আপনাদের বর্ত্তমান এই বরেন্দ্র সমাজের অভ্যন্তরে প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন ভাষা, প্রাচীন রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, গ্রাম্য গীত ও লৌকিক বচন উপকথা ও ব্রতকথা ছেলে ভুলান ছড়া ও দিদি মায়ের রূপকথা মধ্যে যে সকল প্রাচীন নিদর্শনের ভগ্নাবশেষ প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত আছে, তাহার আবিষ্কার দ্বারা শত শতাব্দ ধরিয়া স্তরের উপর স্তর গাঁথিয়া যে মানব সমাজ গঠিত হইয়াছে, তাহার ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের আশা দুরাশা নহে।

এই ইতিহাস সঙ্কলনে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আমরা অতিথি ও ভিক্ষুকরূপে আপনাদের দ্বারদেশে আজ আঘাত করিতেছি, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন যেথায় যে জেলায় উপস্থিত হইয়া গৃহস্থের দ্বারে করাঘাত করিবে, তখন সেই দ্বারে দাঁড়াইয়া আমরা আমাদের প্রার্থনা জানাইব। সকলের সমবেত চেষ্টায় আমাদের, অর্থাৎ এই নবজীবনের স্পন্দনে স্পন্দমান বাঙ্গালী জাতির, জাতীয়-

তার মূল উৎস আবিষ্কৃত হইবে ও ইহার মূল ভিত্তি প্রকাশিত হইবে। সেই উৎস হইতে ধারাসেচনে ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিয়া আমাদের জাতীয়তা কলনাদিনী স্রোতস্বতী তরঙ্গিণী পদ্মার প্রাবৃট্‌কালের বিপুলকায় ধারণ করিবে, সেই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের জাতীয় ভাবের সুরম্য হর্ম্ম্য গগনমূলে উঠিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দিবে। এক বৎসরে এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন যদি শতবৎসর জীবিত থাকে, তবে সেই শতবৎসর পরে আমাদের প্রপৌত্রগণ এই রাজসাহী নগরে পুনরায় সম্মিলিত হইয়া এই কার্য্যের আংশিক সফলতা দেখিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। আমরা সেই কার্য্যের আরম্ভ করিয়া যাইতে পারিলেই চরিতার্থ হইব এবং বঙ্গদেশের সাহিত্যিক সমাজের মুখপাত্রস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমরা যে কয়জন আপনাদের সাদর আহ্বানে উপস্থিত হইয়া, আপনাদের বোঝার উপর এই শাকের আঁটি চাপাইতে বসিয়াছি, তাঁহারাও কৃতার্থম্মন্য হইবেন।"

প্রস্তাবক বলেন,—

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় ও মাননীয় সাহিত্য-সেবিগণ, এই পঠিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে, আমাদের সময় যেরূপ সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে অতি অল্পের মধ্যে এ বিষয়ে আমার বক্তব্য শেষ করিতে হইবে। এই প্রস্তাবটির কিরূপ গুরুত্ব আছে, তাহা অপর কোন যোগ্যতর ব্যক্তি বিবৃত করিলে ভাল হইত। তথাপি আমার উপর যখন ভার পড়িয়াছে, তখন যাহা পারি আমাকে বলিতেই হইবে।

আপনারা সকলেই ইহা বিশেষরূপে জানেন যে, কোন ভাষাকে সম্যক প্রকারে জানিতে ও বুঝিতে হইলে তাহার ভাষাতত্ত্ব আলোচনা নিতান্ত আবশ্যক। ভাষাতত্ত্ব না জানিলে তাহার অন্তস্তলে প্রবেশ করা যায় না। বঙ্গসাহিত্যে "বিহান" কথা প্রচলিত আছে এবং আমরা জানি যে তাহার অর্থ প্রাতঃকাল। কিন্তু কিরূপে তাহার অর্থ প্রাতঃকাল হইল, তাহা অনেকেই অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই। এখানে আমাদিগকে ভাষাতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তখন জানিতে পারিব যে, তাহা সংস্কৃত "বিভান" শব্দ হইতে হইয়াছে। সংস্কৃতে "বিভাত" শব্দ অতি প্রসিদ্ধ এবং ভ স্থানে প্রাকৃতে—হ অনেক স্থানেই হইয়া থাকে। রাজসাহীতে "গাভার" বলিয়া একটা কথা আছে এবং ইহা গর্ত্তকে বুঝাইয়া থাকে। ভাষাতত্ত্বের দ্বারাই আমরা জানিতে পারি যে, সংস্কৃত "গহ্বর" ক্রমশঃ "গাভার" হইয়াছে (গহ্বর—গব্‌হর—গব্ভর—গাভার)।

এখানে কোথায় এই অর্থে "কো" শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইহা সংস্কৃত "ক" হইতে হইয়াছে। এরূপ অসংখ্য উদাহরণ দিতে পারা যায়।

আমরা যদি নানা স্থানের প্রাদেশিক সর্ব্বনাম শব্দগুলি সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাদের মূল নির্দ্ধারণ করা সুন্দর হইয়া উঠিবে এবং এই-রূপে বঙ্গভাষাকে সম্যকরূপে জানিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে।

এই প্রসঙ্গে আমি আর একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমাদের বঙ্গভাষার সহিত সংস্কৃতের কত নিকট সম্বন্ধ, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু ঠিক বলিতে হইলে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, খাঁটি বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃতের সম্বন্ধ অধিকতর সন্নিকৃষ্ট। অতএব যদি বাঙ্গালার সম্যক্ আলোচনা করিতে হয়, তবে আমাদিগকে প্রাকৃত ভাষা রীতিমত আলোচনা করিতে হইবে। কেবল ভাষাতত্ত্বের জন্যই নহে, প্রাকৃত ভাষার যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা বাঙ্গালায় আনিতে পারিলে ইহার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইবে। প্রাকৃত প্রসঙ্গে আমি জৈনগণের প্রাকৃত (আর্য্য) ও বৌদ্ধগণের প্রাকৃত পালির কথা বিশেষভাবে বলিতেছি। বঙ্গসাহিত্য সেবিগণের এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক, ইহাই আমি প্রার্থনা করিতেছি।"

সমর্থক বলিলেন :—

"এই প্রস্তাব সমর্থনের ভার এক অতি অসমর্থের উপর পড়িয়াছে—ইহা বিনয়ের কথা নহে।

প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করা বাহুল্য, বক্তৃতা অনেক হইতেছে ; উহার আর কাজ নাই। এখন কার্য্য করিতে হইবে। বক্তৃতায় আমরা পঞ্চমুখ কিন্তু কাজে সততই পরাঙ্মুখ ; আমাদের এই দুর্নাম কি দূর হইবে না ?

আমরা আজ একরূপ ত্যাগী কর্ম্মবীর সভাপতিরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছি, তাঁহার আদর্শে আশা করি, আমরা কর্ম্মে উৎসাহিত হইব।

বঙ্গের নানা স্থানে প্রচলিত শব্দের (অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণ সর্ব্বনাম ক্রিয়া ইত্যাদির) যে সকল ভিন্ন ভিন্ন আকার, ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিযোগে—দেখা যায়, তাহা সংগ্রহার্থ সাহিত্যিক সভাগুলির যোগে শিক্ষিত সমাজকে আহ্বান করা হইতেছে। সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন, সাহেবেরা আমাদিগকে বাঙ্গালা ভাষা সম্পর্কীয় নানা বিষয়ে পথপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন—প্রস্তাবিত বিষয়েও তাঁহারাই আমাদিগকে পথ দেখাইয়া রাখিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রণো-দিত হইয়া ডাঃ গ্রিয়ারসন Linguistic Survey of India উপলক্ষে বঙ্গের

ভিন্ন ভিন্ন জিলার ভিন্ন ভিন্ন শব্দের বিভক্তি সম্প্রতি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থকারে মুদ্রিত হইয়াছেন। ইহাতে যে সকল অসম্পূর্ণতা আছে, তাহা সারিয়া নিতে হইবে। কিন্তু কাজ অতিশয় সুগম হইয়া আছে।

এই সকল সংগ্রহের উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে বঙ্গভাষার ইতিবৃত্তানুসন্ধানে সহায়তা হইবে। বিশেষতঃ প্রাচীন কবিগণ স্বীয় রচনায় জন্মস্থানের গ্রাম্য-ভাষার বহুল আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ সংগ্রহদ্বারা তাঁহাদের লিখিত কাব্যের অর্থাবোধের সাহায্য হইবে।

নচেৎ অধুনা ভাষার একতা সাধনই সাহিত্যিক মাত্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এমন কি, যাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষ মধ্যে আমরা পরস্পরের ভাষা অনায়াসে বা অল্পায়াসে বুঝিতে পারি, তজ্জন্য আপন আপন মাতৃভাষাকে তৈয়ার করিতে হইবে। সেই নিমিত্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে গ্রাম্য অপভাষা বা শব্দের অপপ্রয়োগ বর্জ্জন করিতেই হইবে।

কিন্তু বর্জ্জনের পূর্ব্বে তাহাদের হিসাব নিকাশ করাটা মন্দ নয়। তজ্জন্যও প্রস্তারটী সমর্থনীয় বটে।

আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম-এ উত্থাপন এবং শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় সমর্থন করেন। তদ্যথা—

"বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যপ্রণালী স্থির করণের নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপর ভার অর্পিত হউক।"

শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সভাপতি।
" মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।
" কুমার শরৎকুমার রায়।
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

সপ্তম প্রস্তাব—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ উত্থাপন এবং প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম-এ সমর্থন করেন। তদ্যথা,—

"বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা ও মধ্য পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর ইচ্ছানুসারে ইতিহাস, ভূগোল ও গণিত শাস্ত্রে মাতৃভাষায় অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণ হইতে পারে, তজ্জন্য সম্মিলন বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করিতেছেন।"

প্রস্তাবক বলেন,—

"বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী আশানুরূপ ফল প্রদান করিতেছে না—গবর্ণমেণ্ট এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় ইহার উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। মাতৃভাষার ভিত্তির উপর প্রোথিত না হইলে কোন শিক্ষাই শিক্ষা নামের উপযুক্ত হইতে পারে না। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট ইংরেজি স্কুলের নিম্নশ্রেণী সমূহে যাহাতে বঙ্গভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয় উচ্চ পরীক্ষা সমূহে বাঙ্গালাকে একটী স্বতন্ত্র সম্মানের স্থান দিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বঙ্গভাষা যেরূপ উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহাতে ভারতবর্ষীয় আধুনিক ভাষা সমূহের মধ্যে বাঙ্গালাই যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয় বাঙ্গালার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিলে অচিরকালে ইহা বিভবশালিনী হইয়া উঠিবে। বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাঙ্গালার সাহায্যে ইতিহাসের পরীক্ষার গ্রহণের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, মধ্যে পরীক্ষায় গণিত ও ইতিহাসের অধ্যাপনা ও পরীক্ষার পক্ষে সেইরূপ বিকল্প-ব্যবস্থা করিলে বঙ্গভাষার প্রসার বৃদ্ধি হইবে এবং শিক্ষাপদ্ধতি ও আশানুরূপ ফলপ্রসূ হইবে। এই অধিবেশন শিক্ষা ও মাতৃভাষা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করিবার ভার আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে, আমি সে প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব।"

পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়।

দ্বিতীয় দিবস।

১৯শে মাঘ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

পূর্ব্বাহ্ন ৮টা হইতে অপরাহ্ন ২টা পর্য্যন্ত।

প্রারম্ভে পূর্ব্ববৎ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন মহাশয় ও অন্যান্যে তদ্রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী গান করেন।

জ্ঞান শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সেব্য জ্ঞান পুরুষকার,
জ্ঞান কুশল-সার;
জ্ঞান ধর্ম্ম, জ্ঞান মোক্ষ, জ্ঞান অমৃত-ধার,
জড় জীবন যায়, অলস অন্ধকার,
জ্ঞান [illegible]।

ঐ মত্ত বিপুলনীর, চঞ্চল, সুগভীর,
ঊর্ম্মি চির-অধীর, কোথায় ভরসা-তীর ?
মুগ্ধ জড়ধী, মোহ-জলধি কেমনে হইবে পার ?
সান্ত্বনা কোথা আর ? শরণ লইবে কার,
বিনা জ্ঞান-কর্ণধার ?

ঐ মুক্ত-ব্যোমময় জ্ঞান ব্যাপিয়া রয়,
শূন্যে গ্রহনিচয়, ঘোসে জ্ঞান-জয় !
জ্ঞান ঊর্দ্ধে, মধ্য, নিম্নে জ্ঞান নিখিলাধার,
জ্ঞান সৃজন-দ্বার জ্ঞান স্থিতি-ভাণ্ডার,
জ্ঞানে লয়-সংহার।

হের, বিশ্ব-কুসুমবন, করি, ফুলে ফুলে বিচরণ,
ওহে জ্ঞান-মধুপগণ, কর, জ্ঞান-মধু আহরণ,
করহ পান, করহ দান, যুগে যুগে অনিবার
জ্ঞান-চরণে তাঁর দেহ জ্ঞান উপহার
লভ, মুকতি-পুরস্কার।

সংগীত অন্তে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ গুলি সম্মিলনে পঠিত হয়।

১। বঙ্গীয় মুসলমানগণের ভাষা—লেখক শ্রীযুক্ত আবদুল মইদ খাঁ চৌধুরী।
২। বাঙ্গালীর জাতিতত্ত্ব— „ „ রমাপ্রসাদ চন্দ।
৩। বাঙ্গালা সুকুমার সাহিত্য— „ „ যজ্ঞেশ্বর চন্দ্যোপাধ্যায়।
৪। উদ্ভিদের আহার— „ „ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
৫। শিক্ষা ও মাতৃভাষা— „ „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র।
৬। রঞ্জন শিল্প— „ „ গোপালচন্দ্র সেন।
৭। পরমাণুবাদ— „ „ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৮। ফলিত রসায়ন— „ „ বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৯। স্বয়ংবহ যন্ত্র— „ „ যোগেশচন্দ্র রায় (শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কর্ত্তৃক পঠিত।)
১০। জ্যোতিষের রহস্য— „ „ অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।
১১। লোকতত্ত্ব— „ „ বেণওয়ারীলাল চৌধুরী।

সময়াভাব প্রযুক্ত নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

১২। সমালোচনা— লেখক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী।
১৩। বিজ্ঞান শিক্ষার আবশ্যকতা „ „ শশধর রায়।
১৪। রাজসাহীর ঐতিহাসিক বিবরণ „ „ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৫। মুসলমান বৈষ্ণব কবি— „ „ ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।
১৬। জাতিতত্ত্ব— „ „ শশিভূষণ বসু।
১৭। মানবতত্ত্ব— „ „ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।*
১৮। বৈদিক সাহিত্য— „ „ কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম-এ বি-এল মহাশয় সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে শ্রীযুক্ত শশধর রায়, শ্রীযুক্ত শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায় বি-এল ও শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মৈত্রেয় প্রভৃতি সমর্থন করেন এবং উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা গ্রহণ করিলে সভা ভঙ্গ হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় এবং সমাগত সদস্যমণ্ডলী স্থানীয় অধ্যক্ষসভার অশেষ ত্রুটী উপেক্ষা করতঃ ধন্যবাদ দিবার ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন।

তৎপর পূর্ব্বোক্ত সেন মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত সংগীত পূর্ব্ববৎ গীত হয়।

প্রসাদী সুর।

সুখের হাট কি ভেঙ্গে দিলে!
মোদের মর্ম্মে মর্ম্মে রইল গাঁথা,
(এই) ভাঙ্গাবীণায় কিসুর দিলে!
দুঃখ দৈন্য ভুলে ছিলাম,
ডুবে আনন্দ সলিলে;
(ওগো) দুদিন এসে দীনের বাসে,
আঁধার ক'রে আজ চলিলে।
(মোদের) কাঙ্গাল দেখে দয়া ক'রে
নয়নধারা মুছাইলে;
(আমরা) জ্ঞান-দরিদ্র দেখে বুঝি;
দুহাতে জ্ঞান বিলাইলে!

---

* এই প্রবন্ধটী হস্তগত না হওয়ায় মুদ্রিত হইলনা।

(এই) শ্রেষ্ঠ দানের বিনিময়ে,
কি পাইবে, ভেবেছিলে ?
(ওগো) আমরা ভাবি দেবতা তুষ্ট,
প্রীতিভরা প্রাণ সঁপিলে !
পাওনি যত্ন, পাওনি সেবা,
কষ্ট পে'তে এসেছিলে ;
(মোদের) প্রাণের ব্যাকুলতা বুঝে,
ক্ষমা ক'রো সবাই মিলে।
কি দিয়ে আর রাখ্‌বো বেঁধে,
রইবেনা হাজার কাঁদিলে ;
(সুধু) এই প্রবোধ যে হর্ষবিষাদ,
চিরপ্রথা এই নিখিলে !

উপসংহার।—কার্য্য বিবরণী শেষ হইল, কিন্তু আমাদের বক্তব্য এখনও শেষ হয় নাই। অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগী মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অর্থানুকূল্যে এবং উৎসাহে যে সম্মিলনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা অকালে শুষ্ক হইয়া না যায়, এই উদ্দেশ্যেই আমরা এই শেষে বক্তব্যটুকু লিপিবদ্ধ করিলাম। এতদ্দেশে সাহিত্য ক্ষেত্রেও মিলনের অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণও উদার হৃদয়ে সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এ ভাব সাহিত্যিকগণের মধ্য হইতে দূর করিতে হইবে। তাহা হইলে সাহিত্য সম্মিলন সবল ও সুস্থদেহে তাহার আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া কৃতার্থ হইবে। অলমিতি বিস্তরেণ—

রাজসাহী
তাঃ

শ্রীশশধর রায়—সম্পাদক।
শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল—সহকারী সম্পাদক।

'ক' পরিশিষ্ট।

অধ্যক্ষ-সভার সভ্যগণের নাম।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, এম-এ।
সম্পাদক— " শশধর রায়,এম-এ বি-এল।
সহকারী সম্পাদক— " ব্রজসুন্দর সান্যাল এম, আর, এ, এস্।

সদর।

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামতনু তর্করত্ন।
২। " " বামনদাস বিদ্যারত্ন।
৩। " " গুরুচরণ তর্কতীর্থ।
৪। " মৌলবী হায়দর আমিন।
৫। " " খলিল উল্লা।
৬। " কিশোরীমোহন চৌধুরী।
৭। " ভুবনমোহন মৈত্রেয়।
৮। " মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য।
৯। " সুরেন্দ্রনাথ ভায়া।
১০। " পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী।
১১। " রাজকুমার সেন।
১২। " ললিতমোহন মৈত্রেয়।
১৩। " কুঞ্জমোহন মৈত্রেয়।
১৪। " তারণকৃষ্ণ মণ্ডল।
১৫। " রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর।
১৬। " রাজমোহন সেন।
১৭। " অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।
১৮। " পঞ্চানন নিউগী।
১৯। " রায় কৃষ্ণচন্দ্র সান্যাল বাহাদুর।
২০। " নিশিনাথ সান্যাল।
২১। " হারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবিরাজ।
২২। " মৌলবী এমাদ উদ্দীন।
২৩। " সৈয়দ তকজ্জল হোসেন।
২৪। " নৃত্যগোপাল পাঁড়ে।
২৫। " সুরেন্দ্রমোহন মৈত্রেয়।
২৬। " জগদীশচন্দ্র সেন।
২৭। " বরদাকান্ত চক্রবর্ত্তী কবিরাজ।

২৮। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসাক।
২৯। " রামচন্দ্র রায়।
৩০। " কুঞ্জবিহারী কর।
৩১। " চন্দ্রনাথ চৌধুরী।
৩২। " অক্ষয়কুমার ভাদুড়ী।
৩৩। " ব্রজবল্লভ দত্ত।
৩৪। " রমাপ্রসাদ চন্দ।
৩৫। " চন্দ্রকিশোর সেন।
৩৬। " মহম্মদ আমিন।
৩৭। " বিনোদবিহারী রায়।
৩৮। " ব্রজগোপাল পাঁড়ে।
৩৯। " তারণকৃষ্ণ ভৌমিক।
৪০। " রজনীকান্ত সেন।

মফঃস্বল।

৪১। শ্রীযুক্ত মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, নাটোর।
৪২। " রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়—তাহেরপুর।
৪৩। " " ঘনদানাথ রায়—দুবলহাটী।
৪৪। " " রজনীকান্ত রায়—চৌগাঁ।
৪৫। " " শরদিন্দুনাথ রায়—বলিহার।
৪৬। " কুমার বসন্তকুমার রায়—দিঘাপতিয়া।
৪৭। " রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী—কাশিমপুর।
৪৮। " জগদীশ্বর রায়—নাটোর।
৪৯। " সারদাচরণ মজুমদার।
৫০। " পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী—মালদহ।
৫১। " " বিধুভূষণ শাস্ত্রী—মালদহ।
৫২। " যদুনাথ সরকার—পাটনা।
৫৩। " রাজা ক্রিঙ্কারীনাথ রায়—দুবলহাটী।

প্রভৃতি মোট ১২২ জন সভ্য।

'খ' পরিশিষ্ট।

আয় ব্যয়।

জমা—

চাঁদা আদায়

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, কাশিমবাজার রাজবাটী	৫০০৲
মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, নাটোর রাজবাটী	২৫০৲
রাণী হেমাঙ্গিনী দেবী নটোর ছোট তরফ	১০০৲
রাজা শরদিন্দু রায় বলিহার রাজবাটী	১০০৲
রাজা ষনদানাথ রায় ডুবলহাটী রাজবাটী	১০০৲
রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়-বাহাদুর, লালগোলা রাজবাটী	৫০৲
শ্রীযুক্ত রহিম মজ্জদানিশীন কস্‌বে বাঘা	২০৲
ডাক্তার কালীকৃষ্ণ বাগচী	১০৲
শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন মৈত্রেয় জমীদার, তালন্দ	৫৲
জনৈক হিতৈষী	২৲
	১১৩৭৲
মিনাহা	১০০৯৲১৫
	১২৭৸৶৫

খরচ—

সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ ও সজ্জিকরণ খরচ	২৩১৸১০
আলোক, মুদ্রাঙ্কন এবং কাগজাদি	৯২৷৶০
আহারাদির খরচ	৪৭৭৷৴০
বাজে খরচ— (ডাক মাশুল, গাড়ী ভাড়া, বাসা মেরামতি, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি)	২০৭/৫
	১০০৯৲১৫

মন্তব্য—এই উদ্বৃত্ত টাকা হইতে দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্য বিবরণী মুদ্রিত হইল। ইতি

শ্রীশশধর রায়—সম্পাদক।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল—সহকারী সম্পাদক।

'গ' পরিশিষ্ট।

উপস্থিত প্রতিনিধিগণের নাম।

১। শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বহাদুর, কশিমবাজার (শাখাপরিষৎ)
২। " নৃত্যগোপাল সরকার—বহরমপুর।
৩। " নীলমণি ভট্টাচার্য্য, বি-এ—ঐ
৪। " কালীদাস রায়—সৈদাবাদ।
৫। " কালীদাস সরকার—কাশিমবাজার।
৬। " হীরালাল চক্রবর্ত্তী— বহরমপুর।
৭। " বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ঐ
৮। " যোগেন্দ্র দে সরকার— ঐ
৯। " মহিতোষ রায় চৌধুরী— ঐ
১০। " ভূষণচন্দ্র দাস, এম-এ— ঐ
১১। " বৈকুণ্ঠনাথ রায়, এম-এ— ঐ
১২। " উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, এম-এ—গোরাবাজার।
১৩। " শিশিরকুমার ভদ্র, এম-এ— ঐ
১৪। " হরিপদ ঘোষ— বহরমপুর।
১৫। " শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য, বি-এ—ঐ
১৬। " যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—কাশিমবাজার।
১৭। " বনওয়ারীলাল গোস্বামী—সৈদাবাদ।
১৮। " লোহারাম চট্টোপাধ্যায়—কাশিমবাজার।
১৯। " মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়—খাগড়া।
২০। " নিখিলনাথ রায় বি-এল—বহরমপুর।
২১। " রমণীমোহন ঘোষ বি-এল—রাণাঘাট, নদীয়া।
২২। " পণ্ডিত রাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ—কাশিমবাজার।
২৩। " নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ—কলিকাতা (সাহিত্য-পরিষৎ)
২৪। " সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম এবি, এস, সি—কলিকাতা।
২৫। " বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাপাধ্যায়, এম্-এ—রূপুনুপুর, বীরভূম।

২৬। „ গোপালচন্দ্র সেন,এম-এ বি-এল—কলিকাতা।
২৭। „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,এম-এ— ঐ
২৮। „ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,এম-এ— ঐ
২৯। „ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এম-এ— ঐ
৩০। „ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত,এম-এ— ঐ
৩১। „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র,এম-এ— ঐ যশোর
৩২। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত— ঐ হুগলী।
৩৩। „ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়,বি-এ ঐ
৩৪। „ বাণীনাথ নন্দী— ঐ
৩৫। „ নীরদচন্দ্র রায়, এম-এ ভাগলপুর (শাখা-পরিষৎ)
৩৬। „ তারণকৃষ্ণ ভৌমিক রাজসাহী (কলিকাতা সাহিত্য-সভা)
৩৭। „ প্রিয়নাথ চৌধুরী.রায়কালী,বগুড়া (বগুড়া শাখা সাহিত্য-সমিতি)
৩৮। „ বরদাকান্ত চৌধুরী বগুড়া (সাহিত্য-সমিতি)
৩৯। „ রাধেশচন্দ্র সেট্,বি-এল, মালদহ।
৪০। „ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য,এম-এ গৌহাটী আসাম।
৪১। „ বিধুশেখর শাস্ত্রী, বোলপুর।
৪২। „ অনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিলমাড়িয়া, রাজসাহী।
৪৩। „ অতুলচন্দ্র ভাদুড়ী, মৈমনসিংহ (শাখা-পরিষৎ)

সমাপ্ত।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন।
(২য় বর্ষ) রাজসাহী

২৬। „ গোপালচন্দ্র সেন,এম-এ বি-এল—কলিকাতা।

২৭। „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,এম-এ— ঐ

২৮। „ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,এম-এ— ঐ

২৯। „ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এম-এ— ঐ

৩০। „ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত,এম-এ— ঐ

৩১। „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র,এম-এ— ঐ যশোর

৩২। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত— ঐ হুগলী।

৩৩। „ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়,বি-এ ঐ

৩৪। „ বাণীনাথ নন্দী— ঐ

৩৫। „ নীরদচন্দ্র রায়, এম-এ ভাগলপুর (শাখা-পরিষৎ)

৩৬। „ তারণকৃষ্ণ ভৌমিক রাজসাহী (কলিকাতা সাহিত্য-সভা)

৩৭। „ প্রিয়নাথ চৌধুরী.রায়কালী,বগুড়া (বগুড়া শাখা সাহিত্য-সমিতি)

৩৮। „ বরদাকান্ত চৌধুরী বগুড়া (সাহিত্য-সমিতি)

৩৯। „ রাধেশচন্দ্র সেট্‌,বি-এল, মালদহ।

৪০। „ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য,এম-এ গৌহাটী আসাম।

৪১। „ বিধুশেখর শাস্ত্রী, বোলপুর।

৪২। „ অনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিলমাড়িয়া, রাজসাহী।

৪৩। „ অতুলচন্দ্র ভাদুড়ী, মৈমনসিংহ (শাখা-পরিষৎ)

সমাপ্ত।

বঙ্গীয়

সাহিত্য সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ।

রাজশাহীর ঐতিহাসিক বিবরণ।

দেশীয় প্রবাদে সাধারণের বিশ্বাস যে, রাজশাহীর উত্তরাংশ মহাভারতের মৎস্যদেশ। রাজশাহীর ইতিহাস-লেখকও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তর-বঙ্গ রেলের পাঁচবিবি নামক ষ্টেশন হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণে বিরানগর নামে গ্রাম আছে; ঐ স্থানেই মৎস্যরাজ বিরাটের রাজধানী ছিল, বলা হয়। এই বিরাট নগরের এক ক্রোশ দক্ষিণে এক স্থানে লোকে কীচকের ভবন, এবং তাহার নিকটেই পাণ্ডবের ধনুর্ব্বাণ-রক্ষার শমী-বৃক্ষের স্থান বলিয়া দেখাইয়া থাকে। কিন্তু মহাভারত-বর্ণিত বিষয়ের আলোচনা করিয়া পণ্ডিতেরা রাজপুতানার উত্তরাংশে বিরাটের প্রাচীন মৎস্যদেশের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেখানে এখনও বিরাটের রাজধানী বিরাট নামক স্থান আছে। এ রাজশাহীর 'মৎস্য' সাধারণ মৎস্য কি না, বৈজ্ঞানিকেরা তাহার বিচার করুন। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, রাজশাহীর অধিকাংশই অধুনাতন কালে নদীবাহিত মৃত্তিকার দ্বারা উদ্ভূত। কিন্তু তাঁহাদের কাল নরলোকের কালের মত নহে; দশ বিশ, হাজার, বা লক্ষ বৎসর তাঁহারা বড় একটা গ্রাহ্যই করেন না। রাজশাহীর বরিন্দা অংশ অন্ততঃ প্রাচীনকালে গঠিত, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু এ ভাগেও রামায়ণ, মহাভারত, বা পুরাণাদিতে বর্ণিত অন্য কোনও স্থান নাই—এ কথা বিবেচনা করিতে হইবে।

উল্লিখিত ব্যাপার যাহাই হউক, রাজশাহীর পশ্চিমোত্তর ভাগ যে প্রাচীন পৌণ্ড্র জনপদের অন্তর্ভূত ছিল, এ কথা আমরা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের তমোময় অরণ্যে কণ্টকজাল-পরিবৃত নানা জটিল সমস্যার মধ্য হইতেও স্থির করিয়া

লইতে পারি। মহাভারত, হরিবংশ ও পুরাণে কয়েক স্থানে পুণ্ড্র ও পৌণ্ড্রের নির্দ্দেশ পাওয়া গিয়াছে; ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দাঃ' না হয় অন্য স্থানের লোক, স্বীকার করা গেল। বিষ্ণুপুরাণে এক পুণ্ড্র দক্ষিণাপথের দেশসমূহের সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। আবার অন্যত্র বলি রাজার ক্ষেত্রে দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, এই পঞ্চ পুত্রের কথা, এবং তাঁহারাই ঐ সকল রাজ্যের স্থাপয়িতা,—এই আখ্যায়িকা আছে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আর এক পৌণ্ড্রদেশ হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরাংশে স্থান পাইয়াছে। অন্যত্র 'জ্যোতিষ্মান্ পৌণ্ড্রান্' প্রাচ্য প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া কথিত আছে। মনু-সংহিতায় নির্দ্দেশ আছে, পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রবিড় প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতিরা ক্রিয়ালোপের এবং ব্রাহ্মণাদর্শনের হেতু অর্থাৎ সর্ব্ববিধ সংস্কারের অভাবে বৃষলত্ব (শূদ্রতা) প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বচনটি বর্ত্তমানে মুদ্রিত মনুসংহিতা গ্রন্থে নাই বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, কিন্তু পরবর্ত্তী স্মৃতিনিবন্ধ গ্রন্থে যখন ইহা মনুর বচন বলিয়া ধৃত হইয়াছে, তখন ইহা মনুতে ছিল, বা বৃহন্মনুর বচন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে মনুর সময়ে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়েরা 'ব্রাত্য' বলিয়া আংশিক ম্লেচ্ছ-ভাষাভাষী—'দস্যু' নামে কথিত হইয়াছেন, দেখা গেল। কিন্তু মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে লিখিত আছে যে, পৌণ্ড্র, মগধ ও কলিঙ্গ দেশের মহাত্মারা সকলেই শাশ্বত পুরাতনধর্ম্ম অবগত আছেন। মহাভারতের এই উক্তি মনুর পরবর্ত্তী, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় কোনরূপ ভ্রমের আশঙ্কা নাই। তাহা হইলে, পুণ্ড্রদেশ মনুর সময়ে অসভ্যের দেশ ছিল, কিন্তু মহাভারতের সময়ে সুসভ্য হইয়া আর্য্য সমাজে বরণীয় হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। মহাভারতের সভাপর্ব্বে উল্লিখিত মহাবল পুণ্ড্রক বাসুদেব যে এই প্রাচ্য পুণ্ড্রের অধীশ্বর, এ কথায় বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। প্রাচীন পুরাণেতিহাস প্রভৃতির উক্তির সহিত বর্ত্তমান পুণ্ড্র বা পুঁড়ো জাতির বাসভূমি লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিতেরা পুণ্ড্র জনপদের যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই মত এক্ষণে সাধারণে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন সংহিতাকারের দোহাই দিয়া বর্ত্তমান পুঁড়ো বা পুণ্ডরীক মহাশয়েরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ত্বের কথা সপ্রমাণ করিতে সক্ষম হউন বা হউন, তাঁহারাই যে পুণ্ড্র দেশের প্রাচীন লোক, তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কোনও

কারণ নাই। (১) বর্ত্তমান রাজশাহী বিভাগ সেই লোকবিশ্রুত পুণ্ড্রের অধিকাংশ অধিকার করিয়াছে।

এই পুণ্ড্রের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের কথা লইয়াও নানা তর্কের অবতারণা হইয়াছে। কেহ বা বগুড়ার মহাস্থান গড়কে এই প্রাচীন রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চান, কিন্তু অনেকেই বড় পেঁড়োর—হজরৎ পাণ্ডুয়ার পক্ষপাতী। রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত আছে যে, গৌড়বিজয়ী কাশ্মীররাজ জয়াপীড় গঙ্গাতীরে সৈন্য সামন্ত রাখিয়া ছদ্মবেশে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। চীন পরিব্রাজক হুয়েন্ সাংএর বিবরণীর যথাযথ সমালোচনা করিলেও পাণ্ডুয়া নগরই পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির রাজধানী ছিল বলিয়া মনে হয়। এখনও উহা প্রাচীন হিন্দু কীর্ত্তির এবং ভাস্কর-শিল্পের ধ্বংসাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। পরবর্ত্তী রাজধানী গৌড় নগর ইহার অনতিদূরে অবস্থিত। বর্ত্তমানে গঙ্গা পাণ্ডুয়া ও গৌড় হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু ভাগীরথীর প্রবাহলীলা লক্ষ্য করিলে পূর্ব্বকালে গতি যে অন্যরূপ ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। এই পুণ্ড্র নাম হইতেই পুঁড়ি বা পুরী ইক্ষুর নাম হইয়াছে, এবং বৈদ্যক গ্রন্থে সমাদৃত 'পুণ্ড্র-শর্করা' ও এখানকার বস্তু, ইত্যাদি মতও প্রচারিত হইতেছে। কেহ বা আর একটু অগ্রসর হইয়া 'গুড়' হইতে গৌড় নাম হইয়াছে বলিতে চান। সে কালে এ প্রদেশ ইক্ষুর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল কি না, বর্ত্তমানে তাহার মীমাংসা করা সুকঠিন। কিন্তু অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে এই পৌণ্ড্র জনপদ সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, এই তিন সম্প্রদায়ের নানা পুণ্যস্থান এই প্রদেশে সংস্থাপিত ছিল। জৈনগণের তৃতীয় শাখা 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া, এই পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতেই নাম গ্রহণ করিয়াছে। এখনও ভাগীরথী হইতে করতোয়াতীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে গৌড়ের পুরাতন কাহিনীর আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমির অধিকাংশ যে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এ কথা

---

(১) শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোক ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
প্রচ্ছাবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥

সর্ব্ববাদিসম্মত। রাজশাহী যে পূর্ব্বে 'গৌড় বিষয়ে'র মধ্যে ছিল, ইহা স্মরণ করাইয়া দিলেই আমাদের উপস্থিত কার্য্যসাধন হইল। নিকটবর্ত্তী বলিয়া বরেন্দ্রভূমি পূর্ব্বাহ্নেই গৌড়ীয় সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

করতোয়া, আত্রেয়ী ও বারাহী নদী বহু দিন হইতে পুণ্যতীর্থ বলিয়া হিন্দুদিগের মধ্যে পরিজ্ঞাত হইলেও, প্রাচীন গ্রন্থে ইহাদের নাম নাই। বৈদিক 'সদানীরা' করতোয়া—এই করতোয়া কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। (১) তবে তীর্থ উপলক্ষেই এই সকল নদীতীরে স্থানে স্থানে পরবর্ত্তী বৌদ্ধ ও হিন্দু-রাজাদিগের উৎসাহে বিহার বা হিন্দু দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। নাটোর হইতে ১৮ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে ভবানীপুর নামক গ্রাম আছে। পূর্ব্বে এখানে করতোয়া, আত্রেয়ী ও যমুনার সঙ্গমস্থল ছিল। ইহা ভবানী দেবীর অন্যতম পীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উপাসকেরা বলেন, এই স্থানে সতীর তল্প বা বাম কর্ণ পতিত হইয়াছিল। (২) প্রথম যুগের মুসলমান শাসনে এই তীর্থ লুপ্ত হয় বলিয়া কথিত আছে। জন-প্রবাদ এই যে, জনপ্রিয় গৌড়-বাদশা হোসেন শাহের সময়ে মোহন মিশ্র নামক সাধু এই পীঠের উদ্ধার করেন। জনৈক মুসলমান সেনাপতি দেবীর কৃপায় আরোগ্যলাভ করিয়া এখানে এক জোড়-বাঙ্গালা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সেই বাঙ্গালা ১২৯২ সালের ভূমিকম্পে নষ্ট হইয়াছে, ইত্যাদি কথাও প্রচলিত আছে। বারেন্দ্র-সমাজে প্রবাদ এই যে, উক্ত মোহন মিশ্র ভবানীর আজ্ঞায় কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করেন; এই বিবাহ লইয়া একটী ছড়া আছে।

"কোথা হ'তে এলো বামুন পাকুড়তলা বাড়ী,
কেহ বলে কামরূপী কেহ বলে রাঢ়ী।"

প্রকৃত কথা এই যে, কুমুদানন্দ এই অজ্ঞাতকুলশীল মিশ্রকে কন্যাদান করায় সমাজে কিছু দিন পতিত ছিলেন। পরে বারেন্দ্র-সমাজপতি তাহিরপুর-রাজ

---

(১) স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত করতোয়া-মাহাত্ম্যে নির্দ্দেশ আছে,—

করতোয়া-সদানীরে সরিৎশ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে।

এ বচন আধুনিক বলিলেও, রঘুনন্দনের কৃত বলিয়া তত আধুনিক বলা যায় না।

(২) করতোয়াতটে তল্পং বামে বামনভৈরবঃ।
অর্পণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা।—(পীঠমালা)

কংসনারায়ণ তাঁহাকে ও মোহন মিশ্রকে সমাজে তুলিয়া লন। এইরূপে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে 'ভবানীপুর পটি'র উৎপত্তি হয়। সান্তোষের রাণী শর্ব্বাণী এবং রাণী ভবানী এই পীঠের সংস্কার ও দেবসেবার নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, এবং এই সময় লইতেই এই পীঠের নাম লোক-প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে।

সুপ্রসিদ্ধ রাজা গণেশ—যিনি গৌড়ের স্বাধীন মুসলমান বাদশার হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া হিন্দুরাজ্য পুনঃস্থাপন করিয়া হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সমগ্র বাঙ্গালীর অনুরাগভাজন হইয়া আদর্শ নরপতি হইয়াছিলেন, সেই গণেশ বারেন্দ্রভূমির হিন্দু ভূস্বামী ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে দিনাজপুরনিবাসী বলিয়াছেন; কিন্তু প্রামাণিক ইতিহাস রিয়াজ উস্ সানাতিন্ গ্রন্থে তিনি ভাতুড়িয়ার রাজা বলিয়া উল্লিখিত। ভাতুড়িয়া পরগণা বর্ত্তমান রাজশাহীর উত্তরাংশে। কেহ কেহ মুসলমান ইতিহাসে 'কংস' নাম পড়িয়া তাহেরপুরের প্রসিদ্ধ রাজা কংসনারায়ণের সহিত গণেশের গোলযোগ বাধাইয়াছেন। কিন্তু ঈশান নাগর রচিত প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে স্পষ্ট "শ্রীগণেশ রাজা" গৌড়িয়া বাদশাহ মারিয়া রাজা হইয়াছিলেন, এই উল্লেখ থাকায়, এই তর্কের সম্পূর্ণ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ পরবর্ত্তী সময়ের এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাহেরপুরের প্রাচীন রাজবংশ পূর্ব্বকালের ভৌমিক। বারাহী নদীর পূর্ব্ব-তীরে তাঁহাদের গড়-বেষ্টিত রাজধানীর চিহ্ন রামারামা গ্রামে এখনও দৃষ্ট হয় বলিয়া কথিত আছে। সম্প্রতি মহাকবি কৃত্তিবাসের যে আত্মপরিচয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, কবি বড়গঙ্গা-পারে পাঠ শেষ করিয়া গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়া শ্লোক পাঠ করিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই বর্ণনায় রাজপারিষদবর্গের অনেকে যে কংসনারায়ণের আত্মীয় বা সমসাময়িক, বারেন্দ্র ঘটক গ্রন্থের সাহায্যে তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। সেই জন্য রাজা কংসনারায়ণ এক সময়ে প্রবল হইয়া গৌড়েশ্বর উপাধি লইয়া থাকিবেন, এই মত আমরা কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে সমর্থন করিয়াছি (বঙ্গদর্শন; ১৩১০)। রাজা কংসনারায়ণ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের সংস্কারসাধন করেন। বর্ত্তমান তাহেরপুর রাজবংশ পূর্ব্ব-রাজবংশের দৌহিত্র সন্তান।

সান্তোল বা সাঁতুল রাজ্য।—আত্রেয়ী ও করতোয়া নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে প্রাচীন সান্তোল বা সাঁতুল রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই সাঁতুল

রাজ্য বা জমিদারী রাজা গণেশের সমকালীন বলিয়া প্রবাদ আছে। প্রথমে তপ্পে ভাতুড়িয়া ও তাহার অন্তর্ভূত ১৩টি পরগণা এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর হস্তে আইসে। এই রাজবংশের বিলোপসাধনের বিবরণ রাজশাহীর জমিদারী সনন্দ হইতে আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত করিয়াছি (১)। কথিত আছে, সান্তোলরাজ সীতানাথ বৃদ্ধাবস্থায় নিজ কনিষ্ঠ রামেশ্বরের হস্তে বিষয়কর্ম্মের ভাব ন্যস্ত করেন। শেষে রামেশ্বরের দারুণ অবিশ্বাসের কার্য্যে শোকসন্তপ্ত হইয়া সীতানাথের মৃত্যু হয়। রামেশ্বরের 'পঞ্চ পাতকী' বলিয়া প্রবাদ আছে, এবং লোকের বিশ্বাস যে, তাঁহার পাপেই সাঁতুল রাজ্যের ধ্বংস হয়। রামেশ্বরের পুত্র রামকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা পত্নী ধর্ম্মশীলা রাণী শর্ব্বাণী পুণ্যকীর্ত্তির জন্য উত্তর-বঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি করতোয়া-তীরে ভবানী মাতার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কেহ কেহ বলেন, তিনিই এই পীঠের উদ্ধার সাধন করেন। যাহা হউক, তাঁহার সময়ে যে এই তীর্থ বিশেষ জাগ্রত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার অন্যান্য কীর্ত্তিও অনেক ছিল। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পরে রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র বলরাম জন্মান্ধ ও বধির উল্লেখে জমিদারী কার্য্য পরিচালনে অসমর্থ বলিয়া বিস্তীর্ণ ভাতুড়িয়া জমিদারীর কার্য্যভার তৎকালের একমাত্র সমর্থ নাটোরবংশ-স্থাপয়িতা রঘুনন্দন তাঁহার ভ্রাতা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন (২)। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী করতোয়া-তটের মন্দির প্রভৃতির সংস্কার করাইয়া দেবসেবার সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কালক্রমে পুনরায় এই পীঠের অবস্থা হীন হইয়া পড়িয়াছে।

পুঁটিয়া-রাজবংশের অনুগ্রহে নাটোর-বংশ-স্থাপয়িতা রঘুনন্দনের অভ্যুদয়ের কথায় এবং নাটোরের অনুগৃহীত দিঘাপাতিয়ার প্রতিষ্ঠাতা দয়ারামের বিবরণে আমার বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক স্থান পূর্ণ হইয়াছে। সেই সমস্ত কথা লইয়া পুনরায় আপনাদের কর্ণজ্বালা উৎপাদন করিতে চাহি না। তবে একটি কথার পুনরুক্তি আবশ্যক মনে করি। রাজশাহী হইতে প্রকাশিত 'উৎসাহ' পত্রে দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি রাজশাহী নামের উৎপত্তির

---

(১) উৎসাহ মাসিক পত্র—১৩০৪ ও নবাবী আমলের ইতিহাস।

(২) ভাতুড়িয়া সনন্দ—নাটোর-রাজ নবাবী আমলের ইতিহাস।

কথা আলোচনা করিয়াছি; পরে আমার সামান্ত ইতিহাসেও সেই কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু জনপ্রবাদের জীবন বড় কঠিন। কা'লও কথায় কথায় এখানকার এক জন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিলেন, 'এ রাজশাহী— এখানে রাজার অভাব নাই, এখনকার রাজার সঙ্গে রাজশাহী নামের যে কোনও সম্বন্ধ নাই, সে কথা প্রত্যেকের জানা উচিত। 'নিজ চাক্‌লা রাজশাহী, রাজমহলের দক্ষিণ হইতে বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর-পূর্ব্ব দিকে বোয়ালিয়ার অপর পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। "শাহী" অর্থাৎ বাদশাহী রাজা মানসিংহের নামে রাজশাহী নাম হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। আইন-আক্‌বরীতে রাজশাহী পরগণার নাম নাই। নিকটবর্ত্তী কুমার-প্রতাপ পরগণা মানসিংহের ভ্রাতা কুমার প্রতাপ সিংহের নামে কথিত বোধ হয়। রাজশাহীর ইতিহাস-লেখক কালীনাথ বাবু বলেন, এ অনুমান আমি সঙ্গত মনে করি না, কারণ, 'শ' এবং 'স'য়ে বৈষম্য দৃষ্ট হয়। দন্ত্য 'স' দিয়া বানান করা যে উচিত নয়, তাহা তাঁহার মনে হয় নাই। নিজ চাক্‌লা রাজশাহী যখন পূর্ব্ব-জমীদার উদয়নারায়ণের হস্ত হইতে রঘুনন্দনের কৃতিত্বে রাজা রামজীবন প্রাপ্ত হইলেন, তখন অবধি তিনি রাজশাহীর জমীদার বলিয়া কথিত হইলেন। পরে তাঁহার প্রাপ্ত সমস্ত জমিদারী লইয়া এক লাটে সমগ্র রাজশাহী চাক্‌লা এক জন কলেক্টরের হস্তে স্থাপিত হইয়া রাজশাহী জেলার নাম হইল। কিন্তু তখন লস্করপুর (পুঁটিয়া) ও তাহেরপুর ইহার অন্তর্গত ছিল না; এ দুই পরগণা মুর্শিদাবাদের অধীন ছিল—এক জন সহকারী কলেক্টর এই দুইটির রাজস্ব আদায় করিতেন। তখনকার রাজশাহীর আয়তন কিরূপ ছিল, তাহা কোম্পানীর রাজস্ব সেরেস্তাদার গ্রাণ্টের নিম্ন-উদ্ধৃত বিবরিণী হইতে অনুমিত হইবে।

"Rajshahi the most unwieldy and extensive Zemindary in Bengal or perhaps in India; intersected in its whole length by the great Ganges &c, producing within the limits of its jurisdiction at least four fifths of all the silk, raw or manufactured, used in or exported from the empire of Hindustan, with a superabundance of all the other richest productions of nature and art to be found in the warmer climates of Asia fit for commercial purposes; enclosing in its circuit

and benefitted by the industry and population of the overgrown capital of Murshidabad, the princpal factories of Kasimbazar, Bauleah, Kumarkhali &c. &c, and bordering on almost all the other great provincial cities &... was conferred in 1725 on Ramjeon, a Brahmin, the first of the present family."

Grant's Analysis—Fifth Report.

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজশাহী (নাটোর জমিদারী) পশ্চিমে রাজমহল হইতে পূর্ব্ব ঢাকী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অর্দ্ধাংশ, নদীয়া যশোহরের উত্তরাংশ, সমগ্র পাবনা, বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুরের কিয়দংশ পুঁটিয়া, তাহেরপুর বাদে এখানকার রাজশাহী এবং মালদহের অর্দ্ধাংশ এই রাজশাহীর অন্তর্গত ছিল। তখন ইহার পরিমাণফল ১২৯০৯ বর্গমাইল। এক জন জজ—কলেক্টরের দ্বারা ইহার কার্য্য চালান অসম্ভব বলিয়া দুই জন সহকারী কলেকক্টর (নাটোর ও মুরাদবাগে) নিয়োজিত ছিলেন। ইহাতেও কোম্পানীর প্রথম আমলে রাজস্ব আদায়ে মহা গোলযোগ এবং চলনবিল প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক ডাকাইতি ও রাহাজানী হইত। শেষে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে—যখন জেলা-বিভাগ ভাগ করিবার কথা হইল, তখন এই রাজশাহীর পার্শ্বে স্থানগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া রাজশাহী জেলাকে পদ্মার উত্তর ও উত্তর পূর্ব্বে স্থাপিত করা হইল। এই সময়েই 'নিজ রাজশাহী' ইহা হইতে বাদ গেল। কিন্তু তখনও মহানন্দা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র রাজশাহী জেলার সীমা থাকিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে চোর-ডাকাইতের দমন প্রভৃতি কারণে রাজশাহী জেলা হইতে চাঁপাই, রোহনপুর প্রভৃতি থানা লইয়া এবং পূর্ণিয়া ও দিনাজপুর হইতে কিছু কিছু লইয়া বর্ত্তমান মালদহ জেলা গঠিত হইল। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় রাজশাহী হইতে সেরপুর, বগুড়া প্রভৃতি মহকুমা কাটিয়া এবং রঙ্গপুর ও দিনাজপুর হইতে কিছু কিছু লইয়া বগুড়া জেলা হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে—অবশিষ্ট রাজশাহী জেলা হইতে শাজাদপুর, পাবনা প্রভৃতি পাঁচথানা ও যশোহর লইতে কিছু লইয়া বর্ত্তমান পাবনা জেলা হইয়াছে। এ প্রবন্ধে পূর্ব্বতন রাজশাহী জেলাই আমাদের লক্ষ্য। ইহা প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণাংশ।

সাহিত্যচর্চ্চা ও পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত বরেন্দ্রভূমি বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ।

বল্লাল সেন বরেন্দ্রভূমির অনিরুদ্ধ নামক মহাপণ্ডিতের ছাত্র ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় চতুর্ব্বেদাচার্য্য এবং সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার নাম্যাসী গ্রামী কুল্লুকভট্ট বরেন্দ্রের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা উদয়নাচার্য্যও এই বরেন্দ্র-সমাজ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে গৌড়ের মুসলমান বাদশা এবং বরেন্দ্রভূমির ভৌমিক রাজাদিগের সভায়ও বহুতর পণ্ডিত ও মনস্বী লোকের আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। রাজা কংসনারায়ণের প্রধান পণ্ডিত মুকুন্দ ও তৎপুত্র ধর্ম্মাধিকার শ্রীকৃষ্ণ এবং পরবর্ত্তী কালের লঘুভারতকারের নাম এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রাজা রামজীবনের সভাসদ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা ১৬৪৫ শকে (বাং ১১৩০ সাল) পদাঙ্কদূত রচনা করিয়া শেষ যুগের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের প্রতিভা দেখাইয়া গিয়াছেন। পুণ্যকীর্ত্তি মহারাণী ভবানী অসংখ্য সৎকার্য্যের মধ্যে বঙ্গীয় পণ্ডিতবর্গের জন্য যে সমস্ত বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া যান, তাহার কথা এখনও দেশীয় প্রবাদে পরিচিত আছে;—

কৃষ্ণচন্দ্রের ব্রহ্মোত্তর, রাণী ভবানীর বৃত্তি।
দিনাজপুরের নগদ দান, বর্দ্ধমানের কীর্ত্তি॥

প্রাতঃস্মরণীয়া ভবানী দান, বৃত্তি, ব্রহ্মোত্তর-দান বা কীর্ত্তিতে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন না হইলেও, তাঁহার বিদ্যা-বিতরণের নিমিত্ত দেশব্যাপী বৃত্তিই উক্ত কবিতার প্রধান লক্ষ্য। বর্ত্তমান রাজশাহীতে মুসলমান কীর্ত্তির মধ্যে বাঘার মস্‌জীদ্ (১৫৩০ খ্রীঃ) এবং কুসুম্বা মস্‌জীদ (১৫৫৮) প্রধান।

প্রাচীন রাজশাহী শিল্প-বাণিজ্যের নিমিত্তও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পুণ্ড্রদেশ বহু প্রাচীন কাল হইতে রেশমের চাষ ও ব্যবসায়ের স্থান ছিল। রামায়ণের একটি শ্লোকের (১) ব্যাখ্যায় অনেকে পুণ্ড্রই কোষকারদিগের ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে রেশম কীট বা কৃমির অন্যতম নাম পুণ্ডরীক। এখনও মালদহ জেলায় পুণ্ডরীক বা পুঁড়ো জাতিই প্রধানতঃ রেশম কীট পালন করিয়া থাকে। ইহারই অপভ্রংশে পৌঁড়ু, পোলু, বা পলু হইয়াছে। সমগ্র বাঙ্গালায় রেশম-কীটের বর্ত্তমান নাম পলু। মালদহ হইতে বগুড়া পর্য্যন্ত প্রদেশে এককালে প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হইত।

---

(১) মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রান্ সুহ্মাংস্তথৈব চ।
ভূমিঞ্চ কোষকারাণাংভূমিঞ্চ রজতাকরাম্॥—কিষ্কিন্ধ্যা—৪০।২৬।

অনেকে 'চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য'—শকুন্তলার এই শ্লোক এবং অন্যান্য উল্লেখ হইতে বলিতে চান, রেশমের চাষ চীনদেশ হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয়। কিন্তু মনু প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে অংশুপট্ট বা রেশম বস্ত্রের কথা আছে; এই 'অংশু' কথার সহিত 'চীন' শব্দ যোগ করায় বরং ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, রেশম ভারতে বহু দিন অবধি ছিল। মহাভারতের রাজসূয়পর্ব্বাধ্যায়ে দৃষ্ট হয় যে, চীনেরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে রেশমবস্ত্র উপহার দিয়াছিল। চীনদেশীয় পট্টবস্ত্র উৎকৃষ্ট ছিল বলিয়া বিলাসীরা উহা ব্যবহার করিতেন। ক্রমে চীনা পলুও এ দেশে আসিয়া থাকিবে। পুণ্ডরীকের প্রাচীন বাসস্থল এই বরেন্দ্রভূমি ভারতে রেশম-চাষের প্রসূতি না হউক রেশমের যে অন্যতম প্রধান স্থান ছিল, তাহা প্রতিপন্ন হইল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় কোম্পানীরা কাশিমবাজারে প্রধান কুঠী করিয়া মালদহ ও রাজশাহীর আড়ঙ্গ হইতে রেশমী বস্ত্র আনাইয়া লইতেন। সে সময়ে মুর্শিদাবাদ রেশম-ব্যবসায়ের প্রধান স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজশাহীতে ইংরেজ কোম্পানী এক পৃথক্ কুঠী করেন। সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া রাজশাহী অঞ্চলের রেশম কোম্পানীর লাভের অন্যতম সহায় ছিল। এখনকার অবস্থা কি, কাহারও অজ্ঞাত নাই। রেশমের কথা দূরে থাকুক, রাজশাহীর প্রচুর রবিশস্যে প্রসিদ্ধ বন্দর গোদাগাড়ী সে কালের বাণিজ্যের প্রধান স্থান ছিল, তাহাই বা আজ কোথায়? রাজশাহী কি উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য প্রসিদ্ধ, এই প্রশ্নের উত্তরে এক বালক বলিয়াছিল, 'গাঁজা'!

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা সুকুমার সাহিত্য। *

মনুষ্য-হৃদয় স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ। ভাব কল্পনার সহচর; রস ভাবের পরিণতি। কল্পনা মনের কোনও একটি অজ্ঞাত প্রদেশে, মস্তিষ্কের কোন্ ঐন্দ্রিয়িক বিন্দুতে উদ্ভূত হইয়া চিত্তের বিনোদ-বিলাসে উল্লাসে ভাসিতে থাকে, অথবা আপনা ভুলিয়া মগ্ন হইয়া রহে, তাহা কে বুঝিতে পারে? ফল কথা, কল্পনার যেখানেই উদ্ভব হউক, হয় তাহা পৌর্ণমাসী বাসন্তী কৌমুদী, অথবা প্রাবৃটের অমানিশার সূচীভেদ্য তমিস্রের ন্যায় নিজের আধার নিজে সর্ব্বথা আবৃত করিয়া ওতপ্রোতভাবে প্রবাহিত হয়। তাহাতে কখন বিশ্বের সর্ব্বত্র ভিত বাহ্য ও অভ্যন্তরে যেন শত শত পূর্ণ শশধর বিরাজ করিতে থাকে; কখনও বা অনন্ত—অসীম অনারত অন্ধকারে নিরবয়ব বপু ধারণ করিয়া নিজেই তাহাতে আচ্ছন্ন হইয়া এবং সমগ্র সংসার সমাচ্ছন্ন করিয়া রহে। যেখানে যেখানে বসন্ত, সেইখানেই পূর্ণিমা, সেইখানেই মলয় মারুত, সেই-খানেই কোকিল কূজিত কুসুমগন্ধামোদিত কুঞ্জকুটীরে ললিত-লবঙ্গলতার রাগ-শিহরিত সলাজ পরিশীলন—বিরহিণীর বিধুর বিকারে স্মৃতি ও বিস্মৃতির জাগ্রত স্বপ্ন। আর যেখানে নিবিড় গভীর প্রগাঢ় তিমিরতা, সেইখানেই বিশ্ববীজের বিসর্পিত ধূমপটল,—কভু চকিত, কখন ভীত, কখন বা বিভ্রান্ত,—আধার নাই,—আধেয় নাই,—সীমা থাকিতেও অসীম, আয়তন থাকিতেও নিরায়তন,—কখনও প্রলয় জীমূতনাদে, অথবা নিস্তব্ধ নীরব শ্বাসে, যেন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্ত ব্যোমে একটি মাত্র কেশাগ্রে আলম্বিত রাখিয়া দুঃখ শোক, ভয় বিস্ময়, রাগ বৈরাগ্য, হিংসা দ্বেষ, সধর্ম্ম—বিধর্ম্ম আবেগ-পুঞ্জের অনুলোম ও বিলোম সংঘর্ষ;—কে দেখিবে? কে শুনিবে? কেইবা বুঝিবে? কল্পনার এই কামরূপী লীলা আদি কবি ব্রহ্মারও অনধিগম্য।

মহাত্মা বেকন বলেন, "বিশ্বপ্রপঞ্চ যেমন পর চিদাত্মার ইচ্ছাধীন, সুতরাং অনীশ্বর বা হীনশক্তি, অর্থাৎ অপূর্ণ, তেমনই কল্পনা ইতিহাসের অনেক অপূর্ণতা, অভাব বা দানকার্পণ্য দূর করিয়া দেয়। মন তখন প্রকৃত পক্ষে

---

* ১৩১৫ সালের রাজসাহীর বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনে ইহার একাংশ, এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বহরমপুর শাখার দশম অধিবেশনে সমগ্র অংশ পঠিত হইয়াছিল।

উপভোগ করিতে না পাইলেও ছায়া-মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া রহে; তাহাতেই চিত্তের তৃপ্তি—আকাঙ্ক্ষার প্রীতি। জগতের কুত্রাপি যাহা পাওয়া যায় না, দেখা যায় না,—বস্তুর অধিকতর নানাত্ব—বিধি ব্যবস্থা বা শৃঙ্খলার অধিকতর পূর্ণতা, শোভাসৌন্দর্য্যের বহুতর পর্য্যায় কল্পনা যোগাইয়া দেয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত, পুণ্যের পুরস্কার, প্রকৃত যোগ্যতা ও উপযুক্ততার অনুসারে ইতিহাস কখনও বিহিত করিতে পারে না, কল্পনা ইতিহাসের এই অপূর্ণতা দূর করিয়া পাপের প্রকৃত উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত অথবা পুণ্যের যোগ্য পুরস্কার বিধান করিয়া থাকে। যেখানে প্রকৃত ইতিহাস, সেইখানেই ঘটনাপরম্পরার নীরস, কঠোর, অপ্রীতিকর চিরপরিচিত পৌনঃপুনিকতা ও বৈচিত্র্যহীনতা; তাহাতে আমরা সহজেই বিরক্ত হইয়া পড়ি; কিন্তু কল্পনা অচিন্তিত-পূর্ব্ব নানা আবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন দ্বারা ইতিহাসের সেই নীরস কঠোরতা অপনীত করিয়া কেবল যে প্রীতি বিধান করে, এমন নহে, নীতি শিক্ষা দিয়া হৃদয়ের মহোচ্চ মহানুভাবুকতা সাধন করিয়া থাকে। ইতিহাস ও বিবেক মানব-মনকে বস্তুর অনুগত করিয়া ফেলে; কিন্তু কল্পনা বাসনার অনুরূপ ব্যাপার সৃষ্টি করিয়া মনকে উন্নত ও মহিমান্বিত করিয়া তুলে।" * কল্পনার এই সকল কোমল কঠোর, ললিত ভৈরব, হাসিকান্নাময় বিলাসবৈচিত্র্য মস্তিষ্কের কেবল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুকেন্দ্র দ্বারাই লালিত, পোষিত ও অনুভূত হইয়া থাকে। ভাব, কোমল ও ললিত মধুর হইলেও সুকুমার, আবার কঠোর, কর্কশ বা বীভৎস হইলেও সুকুমার। পাপীর হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে, বা বীরের ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জনে, বিপন্না কুলকামিনীর করুণ ক্রন্দনে, কিংবা শিশুর কোমল রোদনে কবি হৃদয়ে যে ভাবের উদ্রেক হয়, দম্পতীর প্রণয়-পীযূষপীত-কান্তকোমল প্রেম-গানে বা আনন্দের কূলপরিপ্লাবী অবিরল উদার প্রবাহে ঠিক সেই ভাবের উদয় হয় কি না, তাহা কবি ভিন্ন অন্য কে বুঝিবে? ফলতঃ বসন্ত, দীপক, মেঘ, হাম্বীর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রাগের ও রাগিণীর মূর্ত্তি বিভিন্ন হইলেও সুরের অন্তিম লয়কালে হৃদয়ে একটা অপরিসীম আনন্দের তান জাগাইয়া তুলে। কল্পনা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভিন্ন রসের অবতারণা করিলেও তাহাতে মানব মন কেবল বিমুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া, না জানি কিরূপ ভাবসাগরে ডুবিয়া রহে, বুঝি তাহা সুখ দুঃখের অতীত কোন অপূর্ব্ব অবস্থা হইবে। একমাত্র কাব্যে ঐরূপ ভাব দেখা যায়, পাওয়া

* The History of Fiction, P. 7.

যায়, উপভোগ করা যায়; সেইজন্য কাব্যমাত্রই সুকুমার সাহিত্যের অনুগত বা

কাব্য দ্বিবিধ—দৃশ্য ও শ্রব্য। ইংরাজী ভাষায় যে সকল পুস্তক নভেল,রোমান্স, মিষ্ট্রীস্, Sensational tales ও Detective Stories প্রভৃতি নামে পরিচিত, তৎসমস্তই শ্রব্য এবং Tragedy, Comedy, Opera, Ballet, Melo-Drama, Burlesque, প্রভৃতি দৃশ্য কাব্যের অন্তর্গত। সৌভাগ্যের বিষয়—বিদ্যমান বাঙ্গালা সাহিত্যে আমরা পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দুই চারিটি করিয়া নমুনা দেখিতে পাই; কেননা আধুনিক প্রায় সমস্ত কাব্য উক্ত ইংরাজী কাব্য সমুদায়ের আদর্শে রচিত। "হুতম পেঁচার নক্স।" ও "আলালের ঘরের দুলাল" হইতে আরম্ভ করিয়া যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "শোভাসিংহ" পর্য্যন্ত এবং "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" হইতে ক্ষীরোদবাবুর "চাঁদবিবি" পর্য্যন্ত যে অর্দ্ধ শতাব্দী আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, সেই পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে অগণ্য নাটক নভেল, রোমান্স বা রহোস্যাসাদি উদ্ভূত হইয়াছে। যূক মৃৎকুণাদির অবিরত অণ্ডপ্রসরেব ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ অসংখ্য-কাব্য প্রসবের তুলনা একমাত্র ইংরাজী সাহিত্যেই পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে মোটামুটী খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য যুগ হইতে নাটক নভেলের উৎপত্তি আরব্ধ হইয়াছে বলিতে হইবে। সেই সময় হইতে বিদ্যমান কাল পর্য্যন্ত সার্দ্ধ তিন শত বৎসর অতীত হইয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তথায় অসংখ্য নাটক নভেল প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু সেই সার্দ্ধ তিন শতাব্দীর সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের এই অর্দ্ধ শতাব্দী-ব্যাপী নবজীবনের তুলনা করা যাইতে পারে না। অবশ্য বৈষ্ণব সাহিত্যের জন্মের কিছু পূর্ব্ব হইতে টেকচাঁদ ঠাকুরের সময় পর্য্যন্ত প্রায় সার্দ্ধ দুই শত বৎসর অতীত হইয়াছিল এবং সেই দীর্ঘকালের মধ্যে বাঙ্গালা গদ্যে অগণ্য ধর্ম্মগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; কিন্তু সেই সকল গ্রন্থ আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে; কারণ সেই সকল গ্রন্থ দ্বারা তদনীন্তন হিন্দু সমাজে কোন নূতন আলোক বিক্ষিপ্ত হয় নাই। কচিৎ বৌদ্ধ, হিন্দু, বা হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মের সমীকরণ বা সমন্বয় সাধন করিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন নূতন মতের গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু তৎসমুদায় বা তৎকালের কোন গ্রন্থই আজিকার আলোচ্য নহে। বঙ্গীয় উপন্যাস বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, অদ্য সংক্ষেপে তাহাই আলোচিত হইল। বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থান্তরে প্রকাশ করা যাইবে।

এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে—"হুতম" ও "কুলীনসর্ব্বস্বের" সময় হইতে বিদ্যমানকাল পর্য্যন্ত যে সকল উপন্যাস ও নাটকাদি রচিত হইয়াছে, তৎসমুদায় বিশেষতঃ উপন্যাসাদি, বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে সমাজের কিরূপ ক্ষতি বৃদ্ধি হইয়াছে? তাহারই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নাটক ও নভেল উভয় প্রকার সাহিত্যই কাব্য; একটি দৃশ্য, অপরটি শ্রব্য। কিন্তু কাব্যের নির্ব্বাচন লক্ষণ বা ব্যাখ্যাদি লইয়া বৃথা সময়ক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ সেই সকল বিষয়ে উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেরই অভিজ্ঞতা আছে। ভারতে যেমন "রামায়ণ" "মহাভারত" লইয়াই অধিকাংশ সংস্কৃত নাটক উপন্যাসাদি রচিত হইয়াছিল, য়ুরোপে সেই ট্রয়-সংগ্রামের উপর সকল জাতির প্রাথমিক কাব্যকলাপের কল্পনা বিন্যস্ত। ট্রোজান যুদ্ধের পর যে সকল যোদ্ধা বিক্ষিপ্তভাবে ইতস্ততঃ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগকে লইয়া য়ুরোপে অগণ্য কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া সেই কল্পনার মোহিনী মায়ায় পশ্চিম য়ুরোপ মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে যেমন ট্রয়েয় বৃত্তান্ত নিওলাটিন কাব্যকলাপের প্রধান ভিত্তি হইয়া উঠিয়াছিল, রামায়ণ ও মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাপরম্পরা সেইরূপ প্রায় পাঁচশত বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত কাব্যসমূহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেইরূপ আবার বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম যুগে সেই রামায়ণ ও মহাভারত কল্পনাবিলাসের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র বলিয়া অবলম্বিত হইয়াছিল।

এস্থলে আমার বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য শব্দ-সম্পদে না হউক, ভাবসম্পদে বিশেষ গৌরবান্বিত। ইহার ভাবসম্পৎ বঙ্গ-সাহিত্যের কাব্যকাননেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সে সম্পত্তি নানা প্রস্রবণ হইতে সংগৃহীত হইলেও তাহার মূল প্রস্রবণ নিজ শক্তি ও মহিমায় তাহাকে বিমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। সেইজন্য আমরা কৃত্তিবাসের রামসীতা ও কাশীরামের ভীমার্জ্জুনকে বাল্মীকির রামসীতা ও ব্যাসের ভীমার্জ্জুনের প্রকৃতিরূপে দেখিতে পাই;—সেইজন্য মুকুন্দরামের ফুল্লরা ও লহনা, জুলিয়েট ও পোর্শিয়ার মত না হইয়া, বাঙ্গালী কুলবধূরূপেই চিত্রিত হইয়াছে এবং ভারতচন্দ্রের সুন্দর কাঞ্চীপুর হইতে আগমন করিলেও মরাঠীর রটবৈকট্যে প্রকটিত না হইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী বাবুর বিলাসবিভ্রমে অবতারিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বিদ্যমানকালে কি দেখিতে পাই?

কর্ম্মভূমি ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া, এবং চাতুর্ব্বর্ণ্যের স্বর্ণসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া হিন্দু কেবল কর্ম্মেরই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকে। সেই কর্ম্ম সংযম, জীবের যাতনা-নাশ ও আত্মার উৎকর্ষ-সাধন। হিন্দুর কাব্য, হিন্দুর দর্শন, শিল্পবিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাস এই পরম লক্ষ্যেরই আধার। হিন্দুর ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি সেই আধারেই অধিষ্ঠিত। সেই অনুপম আধারের অতুলনীয় শক্তিপ্রভাবে রামায়ণ ও মহাভারত সৃষ্ট হইয়াছে—শকুন্তলা, উত্তর-চরিত, মুদ্রারাক্ষস, মৃচ্ছকটিক, মালতীমাধব, রত্নাবলী, বেণীসংহার, প্রভৃতি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে; রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, কিরাতার্জ্জুনীয়, নলোদয় প্রভৃতি অপার্থিব আধারের অপার্থিব শক্তির স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে;—কথাসরিৎসাগর,পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ বিশ্বের অধিকাংশ উপন্যাস ও গাথাগল্পের কল্পনা করিয়া রাখিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত সকল গ্রন্থই কাব্যের কোন না কোন অঙ্গের অন্তর্নিবিষ্ট; কোনটী দৃশ্য, কোনটী বা শ্রব্য, চম্পু, গীতি বা উপকথার অন্তর্গত। ফলতঃ সকল গুলিতেই কাব্যলক্ষণ অল্লাধিক পরিমাণে বিদ্যমান দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, ঐ সকল কাব্যে বার্ণস্, স্কট, বা বাইরণের প্রবল স্বদেশানুরাগের জ্বালাময় উচ্ছ্বাস নাই, বিজাতীয় দেশবৈরীর বিরুদ্ধে বিকট তর্জ্জন বা প্রচণ্ড আস্ফালন নাই; ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্‌ডি, কস্থথ, ফ্রাঙ্কলিন, ওয়াশিংটন, ক্রুগার, নগী বা টোগোর ন্যায় বীর লইয়া উহাদের পাত্রাদি গঠিত হয় নাই; কিন্তু যাহাতে দেশ জগতের রঙ্গস্থলে বিজয়-নিশান লাভ করিতে পারে;—মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিয়া বিশ্বস্রষ্টার সমীপবর্ত্তী হইবার যোগ্যতা দান করিতে সমর্থ হয়; সেইরূপ নীতি ও উপদেশের অমূল্য রত্নবিভায় তৎসমুদয় গ্রন্থের আদ্যন্ত আলোকিত।" এই মত যে কিয়ৎপরিমাণে ভ্রান্ত, যাঁহারা রামায়ণ ও মহাভারত তন্ন তন্নরূপে পাঠ করিয়াছেন এবং মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস ও বেণীসংহারের চরিত্রগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষিত করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

কালবশে বা কপালদোষে আমরা সেই সকল অতুলনীয় রত্নের অপার মহিমা আর প্রণিধান করিতে সমর্থ নহি। দীর্ঘকালব্যাপী মুসলমান-শাসন প্রাচীন হিন্দুর রঙ্গালয়ে যবনিকা নিক্ষেপ করিয়াছে। এখন প্রাচীন হিন্দু ও নব্য হিন্দু যেন দুইটি স্বতন্ত্র জাতি। একদা যে সকল মহনীয় চরিত্র জগতে মনুষ্যত্বের আদর্শ ছিল,তৎসমুদায় পুরাণ কথার স্থান অধিকার করিয়াছে; ভৃগু,

অঙ্গিরা, অগস্ত্য, মনু, বশিষ্ঠ, ব্যাস, জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, ভীষ্মার্জ্জুন, দ্রোণ, কর্ণ মহাকালের মহাশ্মশানক্ষেত্রে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত ;—অর্দ্ধনিদ্রিত, অর্দ্ধজাগ্রৎ, —যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে ভ্রাম্যমান ;—স্মৃতি ও বিস্মৃতির আলোক ও অন্ধকারে যুগপৎ ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া কতকগুলা বিভ্রান্ত মানব সেই মহাপুরুষগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছে ; আবার পর মুহূর্ত্তে অজ্ঞানতিমিরের গভীর অবসাদে অঙ্গ ঢালিয়া দিতেছে। এইরূপে প্রায় দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া সুপ্তি ও জাগরণ—ক্রমে অবসাদ, পরে সুপ্তি, আবার জাগরণ, পুনর্নিদ্রা,—আবার অল্পে অল্পে জ্ঞানোদ্রেক হইতেছে। গ্রীকের পর গ্রীকোব্যাক্ট্রিয়, তাহার পর ইন্দুবক্ট্রিয়, ক্রমে হূন ও শক, পরে মুসলমান পর্য্যায়ক্রমে ভারত অধিকার করিল ; আর্য্য হিন্দু তাহাদিগের অঙ্গে অস্ত্রের ঝনৎকার করিয়া জয়পরাজয়ের দুর্জ্জয় প্রভাবে পরিবর্ত্তনশীল কালচক্রের অনুসরণ পূর্ব্বক কথন উর্দ্ধে, কথনও নিম্নে,—আবার উর্দ্ধে—আবার নিম্নে ঘুরিয়া আসিল। হিন্দু কবি গাহিলেন, হিন্দু দার্শনিক সংসারের অসারত্ব প্রচার করিলেন ; জগৎ স্তব্ধভাবে তাহা শ্রবণ করিল। এইরূপে আর্য্যভারতে কাব্য সর্ব্বদাই কালের অনুগামী হইয়া চলিয়াছে ; কিন্তু কথনই কালের গতি ফিরাইয়া তাহাকে আপনার মনের মত গড়িয়া লইতে যায় নাই। হিন্দুকুল-কেশরী মহাবীর বিক্রমাদিত্য শকদিগকে উৎসাদিত করিলে তবে কালিদাসের অমৃতনিস্যন্দিনী বীণার ঝঙ্কার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। ত্রিভুবনমল্লহর্ষবর্দ্ধন ও আদিশূরের বিজয়ভেরী নিনাদিত হইলে তবে ভবভূতি, মাঘ, ভারবি,—বাণভট্ট —ময়ূর, ভট্টনারায়ণ বীণাপাণির সুপ্রসাদ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের প্রধান বৈচিত্র্য। জগতের আর সকল জাতির সকল সাহিত্যেও এই বৈচিত্র্য প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। কেবল দুই একটি স্থলে ব্যত্যয় ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

লোকসৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতে জগতে যত মানবসমাজ গঠিত হইয়াছে, আর্য্য হিন্দুসমাজ তন্মধ্যে প্রাচীনতম। চীনের সমাজও একটী অতি প্রাচীন সমাজ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এই দুই সমাজ ব্যতীত মিশর, মিডিয়া, এসিয়া, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশে যে কয়েকটি অনার্য্য সমাজ গঠিত হইয়াছিল, কালবশে তৎসমস্তই লয় পাইয়াছে। ইংরাজ, ফরাসী, শর্ম্মণ্য, রুষ প্রভৃতি যে সকল পাশ্চাত্য সমাজ এখন উন্নত মস্তকে পরস্পরের স্পর্দ্ধা করিতেছে, এগুলি সমস্তই আধুনিক। প্রাচীন ও অর্ব্বাচীনে কথনই সাদৃশ্য কল্পিত হইতে পারে না।

দীর্ঘকালব্যাপী মুসলমান-শাসনে আর্য্য হিন্দুর কাব্য-কাননে কেবল কতকগুলি ধর্ম্মবৃক্ষই উদ্ভূত হইয়াছিল, বৈষ্ণব কাব্যসমূহের আলোচনায় শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত পান করিয়া, অথবা দুর্গা বা চণ্ডী মাহাত্ম্য, কিম্বা পঞ্চানন্দের ও সত্যনারায়ণের মহিমা গান করিয়া সেকালের বাঙ্গালীরা ধর্ম্ম-পিপাসার সঙ্গে সঙ্গে কাব্য-তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারিতেন। তবে কেবল কাব্যকলার আলাপনে যাঁহারা চিত্তবিনোদন করিতে প্রয়াসী হইতেন, তাঁহারা রঘু, কুমার, কিরাতার্জ্জুন, শিশুপালবধ প্রভৃতি মহাকাব্যগুলি আশ্রয় করিয়া কাল কাটাইতেন। কচিৎ "বেতাল পঞ্চবিংশতি," "সিংহাসন দ্বাত্রিংশিকা", বা "শুকসপ্ততি" প্রভৃতি খণ্ডকাব্যের আলোচনায় কেহ কেহ প্রীতিপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেন। পার্শীনবিশ কোন কোন বাঙ্গালী ফির্দ্দৌষী, সাদি, হাফেজ প্রভৃতি পারসিক কবিগণের কাব্য-বিনোদনে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন।

দেখিতে দেখিতে সাত শত বৎসর ভারতের হৃদয়ক্ষেত্রে শত শত চর্ম্মণ্বতীর সৃষ্টি করিয়া অনন্ত কাল-স্রোতে মিশাইয়া গেল। কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দ, ঘনরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ গাহিলেন, এমন সময়ে ইংরাজ আসিয়া বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। সাত শত বৎসরেও মুসলমান যে হিন্দুসমাজকে টলাইতে পারে নাই, অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই ইংরাজের সাম্যগানে সেই জরাজীর্ণ বিরাট হিন্দুসমাজ অপস্মার-সমাক্রান্তের ন্যায় ঘোর আক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। জীর্ণ শরীরে প্রবল বাতব্যাধি;—কিসে আরোগ্য হইবে? চিকিৎসক পীড়া নির্ণয় করিতে পারিল না; সুতরাং চিকিৎসায় বিভ্রাট ঘটিল। তাহাতে সকল দিকেই অনর্থ বাড়িতে লাগিল। তখন কে কাহাকে দেখে?

কিন্তু শুভক্ষণে হুতমের কর্কশ কণ্ঠস্বর বাঙ্গালীর গভীর নিদ্রা ভঙ্গ করিল;—শুভক্ষণে টেকৃচাঁদের তীব্র কষাঘাতে "ইয়ং বেঙ্গলের" বিভ্রান্ত বিনোদস্মৃতি চমকিত হইল। সেই চটুল চমকের তীব্র চাকৃচিক্যে রামায়ণ ও মহাভারতের যুগান্তরব্যাপী একটানা জোয়ারে হঠাৎ ভাটা পড়িল। বঙ্গ সমাজের উপর সকলের দৃষ্টি নিপতিত হইল। তখন ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব বঙ্গের বিশাল অঙ্গে অনেক পরিমাণে বদ্ধমূল হইয়াছে। ইংরেজ সমাজের চিত্র ধীরে ধীরে বঙ্গ সমাজের শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক তখন অল্পে অল্পে বিসর্পিত হইতেছিল;—পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন ভুবনেশ্বরীরূপে ভারতকে বরাভয় প্রদান করিতে উদ্যতা। বাঙ্গালী সেই বর মাথা পাতিয়া লইল; বাঙ্গালী কবি সেই মূর্ত্তির পরবর্ত্তী ভৈরবী বা ছিন্নমস্তা মূর্ত্তির পর্য্যায়া-

গমের সম্ভাবনা না ভাবিয়া তাহারই ধ্যানে নিমগ্ন হইল। ধ্যানের পর বুভুৎসা—তৎপরে সিসৃক্ষা;—বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব প্রতিভা বঙ্গের কাব্যজগতে যুগান্তর ঘটাইয়া সাহিত্যের প্রভাত গগনে উষার রক্তিম রাগে প্রকাশিত হইল। "দুর্গেশনন্দিনী," "মৃণালিনী" "আয়েষা" ও "মনোরমা" বিলাতী "এসেন্স" গায়ে মাখিয়া বাঙ্গালী কুলবধূর কাণে কাণে "ফ্রি লাভের" বংশীরব ঢালিয়া বঙ্গের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তাহার পরিধানে শাড়ী,—ক্বচিৎ "ঢাকাই-গুল বসান"—ক্বচিৎ বেনারসী চেলী,—সর্ব্বাঙ্গে নানা অলঙ্কার—সকলই বঙ্গীয়, সমস্তই বাঙ্গালীর মনোমত;—নব্য রুচির অনুমোদিত। দেখিলে বাঙ্গালীর কুলকন্যা বলিয়া স্পষ্ট চিনিতে পারা যায়; কিন্তু তাহার অন্তঃকরণের স্তরে স্তরে রেবেকা ও জুলিয়েটের স্বাধীন প্রণয় ধীরে ধীরে প্রস্ফুত হইতেছিল; তাহার প্রাণে পাশ্চাত্য সমাজের মুক্ত সমীরণ অল্পে অল্পে প্রবাহিত হইতেছিল।

ওফিলিয়া, মিরাণ্ডা, জুলিয়েট, পোর্শিয়া, ক্লিওপ্যাট্রা, ডেস্‌ডিমোনা, রেবেকা, রাউয়েনা প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয়া, ভিন্ন দেশীয়া রমণীর ছবি লইয়া শেক্ষপীর, মার্লো, বেন জনসন, স্কট প্রভৃতি কবিগণ যখন ইংলণ্ডের গৃহে গৃহে ক্রেতা সংগ্রহ করিতেছিলেন, তখন ইংরেজ সমাজের প্রাথমিক অবস্থা বলিতে হইবে। পৃথিবীর স্তরের ন্যায় তখন তাহার মায়োসিন স্তর গঠিত হইতেছিল। ইংরাজ তখন নূতন নূতন ঘর পাতিতেছিল;—তখন তাহার সকলই অভাব; সেই জন্য পূর্ব্বোক্ত কবিগণের ভাল ভাল ছবি গুলি সংগ্রহ করিয়া ঘর সাজাইতে বসিল। ক্রমে সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন চিত্রের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও সঙ্কর্ষণে,—অনুলোম ও বিলোম সংযোগের অমোঘ ফলরূপে একটা সঙ্করপ্রভাব উদ্ভূত হইয়া ইংলণ্ডীয় সমাজ গঠিত করিল; কিন্তু সে সমাজ যে শীঘ্র ভাঙ্গিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? যে সমাজের স্তর এখনও অর্দ্ধতরল, অর্দ্ধঘন, যেন সারেমাতে জড়িত; যে সমাজ এখনও পরিবর্ত্তনশীল; সে সমাজের চপল চটুল চিত্র লইয়া যুগযুগান্তের প্রবলবাত্যায় অক্ষুণ্ণ—অসংক্ষুব্ধ—দীর্ঘকালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ হিন্দুর শাশ্বত সনাতন সমাজে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য কি? পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রমাথিনী ভৈরবী মূর্ত্তির প্রচণ্ড প্রভাবে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের কোন কোন প্রত্যঙ্গ উচ্ছৃঙ্খলতার বায়ুবিকারে অল্প অল্প স্পন্দিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কোন কুলকামিনীই অদ্যাপি প্রণয়ীর জন্য সুখের সংসার ছাড়িয়া, হিন্দু আদর্শ পণ্ডিত, ধীমান্‌ ও পরম ধার্ম্মিক স্বামীর মুখে কালি মাখাইয়া শৈবলিনীর ন্যায় একটা ফিরিঙ্গীর সঙ্গে গৃহত্যাগিনী হয় নাই,

আজিও কোনও পতিব্রতা, স্বামীর উপর বিরক্ত হইয়া, গৃহ ছাড়িয়া, সূর্য্যমুখীর ন্যায় দূর পান্থনিবাসে একাকিনী মনের জ্বালা জুড়াইতে যায় নাই। প্রেমের মোহ, প্রণয়ের মোহিনী মায়া, প্রাণের আবেগ, হিন্দু কুলকামিনীর পতি ভিন্ন অপর পুরুষের জন্য হইতে পারে না; আবিলতা, আকুলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা ত দূরের কথা। পতিপ্রেম ভিন্ন পরপুরুষপ্রেম হিন্দু কুলবধূর হৃদয়ে এখনও স্থান পাইতে পারে না। যখন পরপুরুষের চিন্তামাত্রে সতীত্বের বিঘ্ন ঘটে, তখন প্রতাপের চিত্র প্রাণে আঁকিয়া কোন্ কুলকামিনী অজ্ঞাত ব্যভিচার-দোষে দূষিত হইতে চাহিবে? অথবা ফিরিঙ্গীর সঙ্গিনী, প্রণয়ি-প্রেমে কুলত্যাগিনী প্রাণে প্রাণে ব্যভিচারিণী শৈবলিনীর মত হতভাগিনী স্ত্রীকে চন্দ্রশেখরের ন্যায় সদাচারসম্পন্ন কোন্ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ গুরুর অসম্বদ্ধ আদেশানুরোধে আবার গৃহলক্ষ্মী করিতে সম্মত হইবেন?

রোগের প্রতীকার অপেক্ষা তাহার উৎপত্তি আদৌ নিরুদ্ধ করাই ভাল; নতুবা সযত্নে সাদরে সোহাগ-ভরে সুখের সংসারে রোগের উৎপাদনে সহায়তা করিয়া পরে তাহার চিকিৎসা করিতে যাওয়া কতদূর সমাচীন, কিরূপ সুনীতি-সম্মত, তাহা সমাজতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই বিচার করিয়া দেখিবেন। অবশ্য তাহাতে উৎকৃষ্ট ঔপন্যাসিক সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইতে পারে, সাহিত্যের সমুৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, নাট্যালঙ্কারের অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাইতে পারে;—কিন্তু সমাজ যাহা চাহে না, দেশে যাহার প্রয়োজন অসিদ্ধ, শত-তার শর্করে বিমণ্ডিত করিয়া সেই বিষবটিকা কি গৃহে গৃহে যোগাইতে যাইবে? কার্লাইল বলিয়াছেন, জগতে শতকরা নব্বইটি মূঢ় দেখা যায়। পাপের প্রলোভন বিমোহন বেশে সহজে লোকের মনোহরণ করে,—"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"; আরোহণ অপেক্ষা অবরোহণ সহজ। অবশ্য সকল ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে এবং সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যম্ভাবী। বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী প্রায় সকল ঔপন্যাসিকই তাহা দেখাইয়াছেন বা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যমদণ্ডের প্রচণ্ড বিভীষিকা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ দেখিয়া পৃথিবীর কতগুলি পাপী পাপানুষ্ঠানে বিরত হইয়াছে? রোহিণী ও কুন্দনন্দিনীর ভয়াবহ পরিণাম শত শত স্থলে দর্শন করিয়াও কয়টি গোবিন্দ ও নগেন্দ্র স্বহস্তে বিষবৃক্ষ রোপণ বা তাহাতে সলিল সেচন করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে?

আমাদের অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় অদ্ভুত প্রতিভাবলে অপূর্ব্ব উপন্যাসের এবং তদুপযুক্ত অপূর্ব্ব ঔপন্যাসিক ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার অনুপম

রচনাকৌশলে বঙ্গীয় সাহিত্য সমধিক গৌরবান্বিত হইয়াছে,—তাঁহার মহনীয় কবিত্বগুণে শতবার ধন্য হইয়াছে; চরিত্র-চিত্রণে তিনি বঙ্গে অদ্বিতীয়। কিন্তু তাঁহার দেবীচৌধুরাণী, আনন্দমঠ ও রাজসিংহ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার উপন্যাসে বঙ্গসমাজ কিছুমাত্র উপকৃত হয় নাই, বঙ্গীয় হিন্দু কিছুমাত্র শিক্ষা লাভ করে নাই। তিনি বঙ্গের গৃহে গৃহে যে ছবি আঁকিয়া দিয়াছিলেন; দুর্ভাগ্যবশতঃ মূঢ় বাঙ্গালী তাহার উজ্জ্বল অংশ উপেক্ষা করিয়া অন্ধকারময় তামসী ছটাই প্রাণতোষিণী ভাবিয়া সাদরে সাগ্রহে, আবেগের প্রবল সোহাগে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু যেমন আনন্দমঠ আবির্ভূত হইয়া সুকুমার ভাববিহ্বল বাঙ্গালীকে মাতৃভূমির জন্য অকাতরে প্রাণ উৎসর্গ করিতে শিখাইল, দেবীচৌধুরাণী গীতার পরমপবিত্র নিষ্কাম ধর্ম্ম বাঙ্গালার দুর্ব্বলচিত্তে ঢালিয়া দিয়া কঠোর কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে বলিল, সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রাণ রাজসিংহ নেপোলিয়নের প্রচণ্ড বীরত্ব এবং ওয়াশিংটন, ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডির অলৌকিক স্বদেশহিতৈষণায় জগৎকে উন্মাদিত করিয়া মানবের পরম শত্রুর বিরুদ্ধে চালিত করিল; অমনি সমগ্র বঙ্গসমাজের প্রত্যেক অণু পরমাণু যেন কি বিকট তাড়িত তেজে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন সহসা বজ্রসারময় কঠোরতা ধারণ করিল। কিন্তু সেরূপ উপন্যাস আর ত কেহ রচনা করিতে পারিল না! অধঃপতিত দেশে অযোগ্য প্রণয়পিপাসার প্রবল শ্বাস আবার যে বহিতে আরম্ভ করিল!

বঙ্কিমচন্দ্রের ও তাঁহার অনুকারিগণের উপন্যাসে মাতৃমূর্ত্তির বড়ই অভাব। দয়া মায়া, শান্তি, পুষ্টি, শ্রী, ঋদ্ধি প্রভৃতি যে সকল ব্যাপার মাতৃমূর্ত্তির চির অনুগত, পূর্ব্বোক্ত ঔপন্যাসিকগণের উপন্যাসে নায়িকাপ্রেমে তৎসমুদায়ের কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যে মাতা ঐ সকল শক্তি, গুণ বা ব্যাপারের মূল প্রস্রবণ, সে মাতৃভাব, মাতৃরূপ বা মাতৃমূর্ত্তি কোথায়? যেন নায়ক নায়িকা সকলেই ভুঁইফোড়;—মা নাই, বাপ নাই—আধার নাই, আচ্ছাদন নাই—অনন্ত মহাশূন্যে প্রাণের বিনিময় করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই ব্যস্ত। প্রেম তাহাদের ধ্রুবতারা, আসঙ্গলিপ্সা তাহাদের নিত্য কামনা, মিলন তাহাদের চরম লক্ষ্য। আবেগ—আকুলতা—বিভ্রম—বিহ্বলতা—সকলই সেই প্রেম, সেই আসঙ্গলিপ্সা, সেই মিলনোৎকণ্ঠার জন্যই নিত্য স্ফুরিত।

এই অদ্ভুত প্রেমের উৎপত্তি কোথায়? নবীন ঔপন্যাসিক বলিবেন— শেক্ষপীয়র, স্কট, ডুমা, লিটন, ভিক্টর হুগো, মেরী করেলী প্রভৃতির ভাব প্রস্র-

বণ হইতে ইহা উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু আর একটু অভ্যন্তরে প্রবেশ কর; ইংরেজী ভাষায় যাহা Romantic Fiction নামে আখ্যাত—গ্রীক রোমান্স, লাটিন রোমান্স, রাজা আর্থার ও শার্লেমেন সংক্রান্ত রোমান্সগুলি একবার পড়িয়া দেখ; —

"None but the brave deserve the fair"·

এই শৌর্য্যসঙ্গীত যে সকল বীরগাথার মূলমন্ত্র, এশিয়ামাইনরের উর্ব্বর ক্ষেত্রে পুষ্টি লাভ করিয়া ক্রমে যাহা ইটালি ও পশ্চিম য়ুরোপে শাখাপল্লব বিস্তার করিয়াছিল, সেই বিশ্ববিসর্পিণী কল্পনা-লতার মূল অনুসন্ধান করিলে ঐ অদ্ভুত প্রেমের করাল মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। ইংরাজী বা ফরাশী, জর্ম্মাণ বা আধুনিক ইতালীয় সমস্ত উপন্যাস সেই পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন Romantic Fiction হইতেই পুষ্টি লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার অনুগামী বঙ্গীয় ঔপন্যাসিকগণ এই শেষোক্ত উপন্যাস সমূহের ছায়া লইয়া স্ব স্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সেই জন্য তাঁহাদের উপন্যাসে নায়কনায়িকার সেই অদ্ভুত প্রেম-ব্যাকুলতা লক্ষিত হয়। সেই প্রেমের লক্ষণ কি? মহামনা এডিসন বলেন:—

"Love was the mother of poetry, and still produces among the most ignorant and barbarous, a thousand imaginary distresses and poetical complaints. It makes a footman talk like Oroondates, and converts a brutal rustic into a gentle swain. The most ordinary plebeian or mechanic in love bleeds and pines away with a certain elegance and tenderness of sentiments which this passion naturally inspires.

These inward languishings of a mind infected with this softness have given birth to a phrase which is made use of by all the melting tribe from the highest to the lowest,—I mean that of dying for love.

Romances, which owe their very being to this passion, are full of these metaphorical deaths. Heroes and heroines, knights, squires and damsels are all of them in a dying condition. There is the same kind of mortality in our modern tragedies, where every one gasps, faints, bleeds and

dies. Many of the poets, to describe the execution which is done by this passion, represent the fair sex as basilisks, that destroy with their eyes; but I think Mr. Cowley has, whith great justness of thought, compared a beautiful woman to a porcupine that sends an arrow from every part".

Spectator, No. 377.

উদ্ধৃত প্রবন্ধাংশের অনুবাদ অনাবশ্যক। প্রেমের লীলা বিনা কোন উপন্যাসই যে পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, তাহা কেবল মহামতি এডিসনের কেন, সকল পারদর্শী আলঙ্কারিকেরই অভিমতি। য়ুরোপে শৌর্য্যের যুগে রমণীকে ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-জ্ঞানে প্রীতি ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি অর্পণপূর্ব্বক শূরগণ বিক্রমের পরীক্ষা প্রদান করিতেন; কাল সহকারে সেই পবিত্র ভাব ক্রমে তরলীকৃত হইয়া অবশেষে কাম-কলুষিত নিকৃষ্ট মিলনোৎকণ্ঠায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ভল্টেয়ারের জীবনচরিত-রচয়িতা বলেন—

"Notwithstanding love was not always pure, even in the times when this passion was carried to its highest point of heroism, it became insensibly debased."

সেই পবিত্র প্রেম বা রমণী-পূজা কিরূপে ক্রমে ক্রমে কলুষিত হইয়াছিল, উক্ত গ্রন্থকার তাহা বিশদরূপে বর্ণিত করিয়াছেন। এস্থলে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রেমের সেই পরিণতি-চিত্র তিনি যেরূপ সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, এস্থলে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল—

"From the whole of this discussion, it appears, that love was simple and tender in the tenth century; severe and impassioned in the eleventh; that it participated of the heroic and superstitious enthusiasm of the three following centuries, and sometimes elevated itself even to a virtue; but in the fifteenth century declined till it was almost always a vice, and scarcely even a passion. In the sixteenth century the sentiments which mingled with it were subtle and cold; the ideas of piety which were from time to time allied, instead of warming and ennobling as before, completed its

degradation by introducing all the meannesses of superstition and hypocrisy. The other forms which it has subsequently assumed, show that it has constantly followed the modifications of society. Thus love, in all times subject to fashion (which seems to have so little empire over the passions), has perpetually undergone the same variations as exterior manners and customs"*

নিম্নে ইহার অনুবাদ প্রকটিত হইল :—

এই আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, দশম শতাব্দীতে প্রেম সরল ও সুকুমার এবং একাদশে কঠোর ও আবেগময় ছিল; তাহার পর ইহা পরবর্ত্তী তিনটি শতাব্দীর বিক্রান্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন উত্তেজনার অংশ গ্রহণ করিয়াছিল এবং সেই গুণে ইহা সময়ে সময়ে পুণ্যের পাবনধর্ম্মে আপনাকে উন্নীত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে অবনত হইয়া অবশেষে ইহা প্রায় পাপকলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল; তখন কচিৎ ইহা উৎকট বাসনারূপে প্রকাশ পাইত। ষোড়শ শতাব্দীতে † ইহার সহিত চপল ও নিস্তেজভাব সকল মিলিত হইয়াছিল; তৎকালে যে সমস্ত ধর্ম্মভাব কখন কখনও ইহার অনুরূপ বলিয়া বিদিত হইত, তৎসমুদায় পূর্ব্ববৎ ইহার ওজোগুণ ও মহিমা বর্দ্ধিত না করিয়া কুসংস্কার ও ভণ্ডতার সর্ব্ববিধ নীচত্বে মণ্ডিত করিয়া ইহার অবনতি পূর্ণমাত্রায় সাধিত করিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে প্রেম অন্য যে সকল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তৎসমুদায় দ্বারা এই বুঝা যায় যে, নিত্যই ইহা সমাজের পরিবর্ত্তনসমূহের অনুগত হইয়া চলিয়াছে। এইরূপে প্রেম সর্ব্বসময়েই রুচির অনুবর্ত্তনে (প্রবৃত্তির উপর যাহার অল্পই প্রভুত্ব দেখা যায়) বাহ্য আচার ব্যবহারের মত চিরকালই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে।

পাশ্চাত্য জগতের এই প্রেমচিত্র হিন্দুর চক্ষে কথনই পবিত্র বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। মহামতি এডিসন এই চলচ্চিত্রেরই পূর্ব্বোক্ত প্রকার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানবৃদ্ধ কাউলী ইহারই উপর নির্ভর করিয়া শল্লকীর সহিত প্রেমপাগলিনী প্রমদাদিগের তুলনা করিয়াছিলেন।

---

* Life of Voltaire, pp. 22-23.

† "Brantome says, that in the sixteenth century love was nothing more than bertinism; it was the age of devices and amorous emblems." Life of Voltaire p. 22

কিন্তু কালে শেক্ষপীয়র, মার্লো, বেন জন্সন প্রভৃতি কবিকুলের ঔপন্যাসিক সৌন্দর্য্যের বিবিধ বৈচিত্র্যে, ওয়াল্টার ম্যাপের ধর্ম্মচিন্তায়, সন্নজারো, মন্টিমেয়র প্রভৃতি স্পেনীয় ও ইতালীয় লেখকগণের নবীন প্রেমচিত্র-ব্যূহের অভিনব প্রভাবে, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রেমের পূর্ব্ববর্ণিত দূষিত প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িল; ক্রমে ফরাসী বিপ্লবের ভীষণ ঝটিকাঘাতে য়ুরোপের চিন্তা ও সমাজ সংস্কৃত ও সংশোধিত হইয়া স্কট, বাইরণ ও শেলির মস্তিষ্ক নূতন নূতন ভাবে পরিপূরিত করিল। ইংরাজী উপন্যাস নূতন ভাবে গঠিত হইল; ইংরাজী কাব্য য়ুরোপে নূতন যুগের অবতারণা করিল; প্রেমের সেই চপল চাকচিক্য দূরীভূত হইয়া স্বচ্ছ স্থিরতা ধারণ করিবার অভিপ্রায়ে যেন ধীরে ধীরে ঘনীভূত হইতে লাগিল। জর্ম্মনীর কতকগুলি নিপীড়িতা য়িহুদী কন্যার কাতর ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি বন্ধুমুখে শ্রবণ করিয়া মহাত্মা স্কটের হৃদয় আলোড়িত হইল; তাই রেবেকার নিষ্কাম অপার্থিব প্রেমচিত্র জগৎ দেখিতে পাইল।†

এই স্বর্গীয় চিত্রের অলৌকিক মাধুরী আমাদের অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। সেই জন্য তাঁহার আয়েষা ও মনোরমা,চরিত্র এত মর্ম্মস্পৃক্ ও মনোরম হইয়াছে। কিন্তু এই পবিত্র নিষ্কাম প্রেমের নিরাশ স্বার্থ-ত্যাগ বা আত্মোৎসর্গ বঙ্গসমাজের উপর কিরূপ প্রভাব স্থাপন করিয়াছে, মুহূর্ত্তের জন্য তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক, এরূপ নিষ্কাম প্রেমচিত্র ভারতে নূতন নহে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে তাহা অবতারিত করিয়াছেন, তাহা নূতন বলিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র বকাবলী, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কাব্যের জঘন্য প্রেম-চিত্র সংশোধিত করিয়া বঙ্গসমাজে নূতন নূতন ছবি স্থাপিত করিয়াছেন। সেই সকল ছবিই ঔপন্যাসিক সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত; দেখিতে পরম মনোজ্ঞ কিন্তু কাচের বাসনের মত অব্যবহার্য্য।

শুভক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্র লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রচনা-কৌশলে বঙ্গীয় সাহিত্যসংসারে নূতন যুগ প্রবেশ , করিয়াছে। তাঁহার অতুল-নীয় চিত্রব্যূহের অনুকরণে বঙ্গে অল্পকালের মধ্যে সহস্র সহস্র উপন্যাস রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ পুস্তকে পূর্ব্বের সেই একই ভাব—সেই একই কল্পনার অল্পাধিক ছায়া প্রতিচ্ছায়া পরিলক্ষিত হয়। যেন তিলোত্তমা আয়েষা

† Lockhart's Life of Sir Walter Scott p. 420.

ভুলিয়া এতদিন বৈদেশিক ভাষাকে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বার বিবেচনা করিত, সেই দেশে আজ কি এক অপূর্ব্ব ভাব আসিয়া মৃত প্রাণে কি অমৃত বারি সিঞ্চন করিয়া সঞ্জীবিত করিল। যে যুবকগণের কাষ্ঠহাসি দর্শনে পূর্ব্বে আশঙ্কার উদ্রেক হইত, যে দেশের প্রৌঢ়গণের মিতব্যয়িতা আত্মপ্রবঞ্চনামূলক বলিলে অত্যুক্তি হইত না, আজ কি এক অপূর্ব্ব ঈশ্বরপ্রেরিতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই যুবক সরসবদনে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি লোকসেবায় জাতীয় শিক্ষায় অকাতরে বহুকষ্টসঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করিল। ইহা কি আশার কথা নহে—ইহা ভাবিলেও কি প্রাণে শক্তি সঞ্চারিত হয় না? দুই বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গালী যুবক পিতামাতার স্নেহক্রোড় ত্যাগ করিয়া অথবা নবপরিনীতা ভার্য্যাকে ছাড়িয়া বৈদেশিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য দূরদেশে যাইতে কুণ্ঠিত হইত, আজ জানি না কি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব, অচিন্ত্যপূর্ব্ব ভাবে প্রোৎসাহিত হইয়া জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিতে সেই যুবক বিদেশযাত্রা করিল। তাই বলিতেছিলাম, আজ আমরা জাতীয় জীবনের সোপানে দণ্ডায়মান—আজ নূতন আশা, নূতন উদ্দাপনার দিন!

বাঙ্গালায় এমন দীন হীন কাঙ্গাল হতভাগ্য কে আছ ভাই, যে আজ বিধাতার মঙ্গলময় আহ্বানে আহুত হইয়া মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার আরতির জন্য নৈবেদ্যোপচার লইয়া সমুপস্থিত না হইবে? ধনি! তুমি তোমার অর্থ লইয়া, বলি! তুমি তোমার বল লইয়া, বিদ্বান! তুমি তোমার অর্জ্জিতবিদ্যা লইয়া—সকলে সমবেত হও।

আজ আমরা যুগসন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। সমস্ত ভারত আজ আমাদিগের দিকে সোৎসাহনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে, স্বর্গ হইতে পিতৃপুরুষ আমাদের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিতেছেন। আজ আমরা জাতীয় জীবনের এমন একস্তরে দণ্ডায়মান, যেখানে আমাদের সম্মুখে দুইটী মাত্র পথ, একটী অনন্ত অমরত্বের, অপরটি অনন্ত অকীর্ত্তির, মধ্যপথে আর কিছুই নাই। আজ যদি আমরা তুচ্ছ আয়াসে মজিয়া ভবিষ্যৎ প্রেরিত এই মহাভাব উপেক্ষা করি, ভবিষ্যৎ বংশাবলী আমাদিগকে বিশ্বাসঘাতক উপাধিতে কলঙ্কিত করিবে, ভারতাকাশের উদীয়মান রবি উষার উন্মেষেই, হায়, আবার অস্তমিত হইবে।

কিন্তু আজ আশার দিন, আজ উদ্দীপনার যুগ। বাঙ্গালা এ আহ্বান উপেক্ষা করে নাই—সতীশচন্দ্র ও রাধাকুমুদের ন্যায় বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী যুবক, সুবোধচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রকিশোর, সূর্য্যকান্ত, মণীন্দ্রচন্দ্র, তারকনাথ, যোগেন্দ্র

নারায়ণ প্রভৃতি ধনাঢ্যগণ যে দেশের জাতীয় শিক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর ও মুক্তহস্ত,সে দেশ নিশ্চয়ই উঠিবে—সে দেশের ভাষা ও বিজ্ঞান কখন উপেক্ষিত থাকিবে না। যাহাতে অধীতবিদ্য, বিজ্ঞানবিদ্ ছাত্রগণ বৃত্তিলাভ করিয়া অন্নচিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ও অনন্যমনে বিজ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা দেশের সেবায় মনপ্রাণ নিয়োগ করিতে পারে, এমন উপায় নির্দ্ধারণ করুন। সৌভাগ্যক্রমে এখন কৃতবিদ্য ও নিষ্ঠাবান ছাত্রের অভাব নাই। তাহারা বিলাসবিভ্রমের প্রত্যাশী নহে। যাহাতে তাহাদের সাংসারিক অভাব মোচন হয় ও তাহারা একান্ত মনে বিজ্ঞান সেবায় ব্রতী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করুন। জ্ঞান জাতীয় জীবনের উৎস। এই উৎসের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য আবার ভারতে নিষ্কাম জ্ঞানচর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হউক।"

পরিশিষ্ট।

ইং ১৯০১—১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ।

বিষয়	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬	১৯০৭
জীবনী	২৫	১৮	১৯	২২	১৫	১৫	২০
ইতিহাস	২০	৪১	১৮	৪২	২৭	২৬	৩১
ভাষা ও ব্যাকরণ	২১২	২১৮	১৭৭	১৫১	১১১	১০১	৬৪
দর্শন ও নীতিবিজ্ঞান	২	৪	৩	৩	১	৩	৩
Arts	১১	২৫	১৪	১৯	১৬	৩০	২২
নাটক	৬২	৬৭	৪৭	৬৩	৬২	৭৪	৩৯
উপন্যাস	৮৪	১১০	১০২	৮৫	৯১	১১০	১২৩
পদ্য	১২০	১২০	৮৭	৮৪	৭৫	৯৩	৫৫
ধর্ম্ম	৩৪৮	৪০০	৩০১	২৮৯	২২৩	২৯৪	২৩৩
চিকিৎসা	৫০	৬৮	৪১	৬০	৬০	৭৩	৬১
আইন	১৬	২৭	১৬	১৫	১৩	৭	১১
রাজনীতি	...	...	...	১	...	...	...
বিজ্ঞান	৩২	২৩	১৯	১৩	১৭	১৩	১০
বিজ্ঞান (গণিত বিভাগ)	৪২	৬২	৪৫	৪৪	২৫	১৮	৩৩
ভ্রমণ	১	১	৪	৪	৩	৩	...
বিবিধ	৫১১	৫৭৭	৪৬৩	৫৭৪	৬৪৫	৬৪৭	৪৮৪
মোট	১৫৩৬	১৭৬১	১৩৫৬	১৪৬৯	১৩৮৪	১৫০৭	১১৮৯

২

ইং ১৯০১—১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত মুসলমানী বাঙ্গালা পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ।

বিষয়	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬	১৯০৭
জীবনী	১	...	...	...	...	...	...
ইতিহাস	...	১	...	৩	২	১	...
উপন্যাস	১৭	১৭	১১	১৪	৪	৫	...
ধর্ম্ম	১৯	১৭	১১	১৯	৯	৬	৭
ভাষা ও ব্যাকরণ	...	...	...	১	...	...	...
বিবিধ	২৭	১৫	৫	১২	১	৫	১
মোট	৬৪	৫০	২৭	৪৯	১৬	১৭	৮

৩

	সমস্ত প্রকাশিত পুস্তক	বাঙ্গালা পুস্তক	শতকরা বাঙ্গালা পুস্তক	শতকরা বাঙ্গালা ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক	বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক পুস্তক	স্কুলপাঠ্য বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক পুস্তক	শতকরা স্কুলপাঠ্য বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক পুস্তক
১৯০১	৩০৬৯	১৫৩৬	৫০,০৪	২২,৬৫	৭৪	৬২	৮৩.৭৮
১৯০২	৩৩৯৬	১৭৬১	৫২.৩১	২২.৭১	৮৫	৭৪	৮৭.০৫
১৯০৩	২৮৮৭	১৩৫৬	৪৬.৯৬	২২.১৯	৬৪	৬৪	১০০
১৯০৪	৩০৫৪	১৪৬৯	৪৮.১০	১৯.৬৭	৫৭	৫৭	১০০
১৯০৫	২৮০০	১৩৮৪	৪৯.৪০	১৬.১১	৪২	৪২	১০০
১৯০৬	৩৪৪০	১৫০৭	৪৩.৪০	১৯·৫০	৩১	২৯	৯৩.৫৫
১৯০৭	২৯৯৫	১১৮৯	৩৯.৬৯	১৯.৫৯	৪৩	৪১	৯৯.৯৯

সভাপতির বক্তৃতা।

অনন্তর রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের প্রস্তাব ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সমর্থন ও সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এম-এ, ডি-এস্-সি, পি-এচ-ডি মহাশয় সভাপতি পদে বরিত হইয়া অভিভাষণ পাঠ করেন।

তৎপর যে সকল মহোদয় ইচ্ছা সত্ত্বেও অনিবার্য্য কারণ বশতঃ সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, অথচ পত্র বা টেলিগ্রাম দ্বারা স্ব স্ব সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন, সম্পাদক কর্ত্তৃক তাঁহাদের নাম সভাক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত হয়। নিম্নে কতিপয় মহাত্মার নাম লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর।
„ রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর—সম্পাদক সাহিত্য-সভা।
„ মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন--সম্পাদক ঢাকা-সারস্বত-সমাজ।
„ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
„ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
„ বিজয়চন্দ্র মজুমদার।
„ রাজা ঘনদানাথ রায় বাহাদুর—দুবলহাটী রাজবাটী।
„ পণ্ডিত রজনীকান্ত তর্করত্ন—ধানুকা চতুষ্পাঠী।
„ মতিলাল ঘোষ।
„ গিরীশচন্দ্র ঘোষ।
„ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।
„ অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।
„ যোগীন্দ্রনাথ বসু।
„ যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রভৃতি।

অতঃপর নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট টেলিগ্রাম ও পত্র প্রেরিত হয়। সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে সম্মিলনের ঐক্যমতে পরিগৃহীত হয়।

মৃত সাহিত্যিকগণের নাম যথা,—

নবীনচন্দ্র সেন।
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।
গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী।
শ্যামলাল গোস্বামী।

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর।

মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর

পূর্ণচন্দ্র বসু।

মন্মথনাথ সেন।

মন্মথনাথ দত্ত।

রায় রামব্রহ্ম সান্ন্যাল বাহাদুর।

কালীনারায়ণ সান্ন্যাল।

অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।

প্রারম্ভে পূর্ব্ববৎ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন মহাশয় কর্ত্তৃক তদ্রচিত নীচের সঙ্গীতটী গান করা হয়।

তিমিরনাশিনী, মা আমার!
হৃদয়-কমলোপরি, চরণ কমল ধরি',
চিন্ময়ী-মূরতি অখিল-আধার!
নিন্দি' তুষার-কুমুদ-শশি-শঙ্খ,
শুভ্র-বিবেক-বরণ অকলঙ্ক,
মুক্ত-শূন্য-ময়, শ্বেত রশ্মি-চয়,
দূর করে তমঃ-তর্ক-বিচার।
ওই করিল করুণাময়ী দৃষ্টি,
সম্ভব হইল জ্ঞানময়ীসৃষ্টি;
আদি-রাগ-ধর, বীণ-সুধা-স্বর,
জাগ্রত করিছে নিখিল সংসার।
কালিদাস-ভবভূতি, মহাকবি,
বাল্মীকি, ব্যাস, ভাগবত ভারবি,
ও পদ-ধূলি-বলে, লভিল ধরাতলে,
অক্ষয় কীর্ত্তি, পরম সৎকার।
জ্যোতিষ-গণিত-কাব্য-শুভ-হস্তে!
ভগবতি! ভারতি! দেবি! নমস্তে!
দেহি বরপ্রদে! স্থানমভয় পদে,
ত্বরিতে দূর কর মোহ-আঁধার।

তৎপর সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিউগী এম-এ মহাশয়ের সমর্থনে প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদ্যথা—

"বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের একটী সমিতি গঠিত হউক। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঐ সমিতির কার্য্য করিবেন। তাঁহার আবশ্যকমত সমিতির সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।"

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতি।
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।
পঞ্চানন নিয়োগী।
হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত—সম্পাদক।
নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
যোগেশচন্দ্র রায়।
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
জগদানন্দ রায়।
দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী।
শশধর রায়।
যোধিসত্ত্ব সেন।
বিধুভূষণ দত্ত।
প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সুবোধচন্দ্র মহালানবিশ।
জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী।
গোপালচন্দ্র সেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম-এ মহাশয় উপস্থিত করেন ও শ্রীযুক্ত আবদুল মজিদ সাহেব সমর্থন করেন। তদ্যথা—

"বাঙ্গালা সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রচলিত শব্দই যথাযোগ্যরূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। সম্মিলনের অনুরোধ যে,গ্রন্থকারগণ এবিষয়ে অবহিত হইবেন।"

সমর্থনকারী বলেন,—"বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালীর সাহিত্য। ইহাতে হিন্দুধর্ম্ম বা মুসলমানধর্ম্ম বা অন্য কোন ধর্ম্মের বিশেষত্ব যে সকল স্থান ব্যক্ত

বা আলোচিত হইবে, তাহাতে ঐ ঐ ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ অর্থবোধক শব্দ ও প্রয়োগ ব্যবহার করা সঙ্গত হইতে পারে; কিন্তু অন্যত্র তদ্রূপ হইবার কোন কারণ নাই। বাঙ্গলা ভাষা মুসলমানগণেরও মাতৃভাষা, সুতরাং মুসলমানী বাঙ্গালা পৃথক বাঙ্গলা হইতে পারে। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মে পৃথক, ভাষাতে নহে। সুতরাং উভয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যই এক প্রকার হওয়া উচিত। যাঁহারা বিপরীত মত পোষণ করেন, তাঁহারা বাঙ্গালী খ্রীষ্টানগণের কি ভাষায় সাহিত্য প্রণয়নের ব্যবস্থা দিবেন? ভাষার একতায় ব্যক্তিগত একত্ব; আবার ব্যক্তি-গত একত্বেই ভাষার একত্ব, একথা এস্থলে বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। কেবল ধর্ম্ম বা আচার সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ ভাবব্যঞ্জক শব্দ প্রয়োগ বিভিন্ন রাখিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। এ নিমিত্ত উভয় সম্প্রদায়ের প্রচলিত শব্দই বঙ্গসাহিত্যে ব্যবহৃত হওয়া উচিত।"

তৃতীয় প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় উত্থাপন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ সমর্থন করেন। তদ্যথা,—

"বাঙ্গালার মানবতত্ত্বালোচনার উদ্দেশ্যে আপাততঃ রাজসাহী জেলার বিভিন্ন ধর্ম্ম, বর্ণ, জাতি ও ব্যবসায় ভুক্ত-জনগণের বংশহানি ও বংশবৃদ্ধির গতি পর্য্যবেক্ষণ ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত রাজসাহীকে অনুরোধ করা হউক।"

চতুর্থ প্রস্তাব—প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এম-এ উত্থাপন এবং শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি-এল ও শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত সমর্থন করেন। তদ্যথা,—

"বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে উত্তর বঙ্গ হইতে উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক গ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য ভারগ্রহণে রাজসাহীকে অনুরোধ করা হউক। সংগৃহীত তথ্য আগামী বৎসরের সম্মিলনে উপস্থিত করিতে হইবে।"

প্রস্তাবক বলেন,—

"রাজসাহী-নিবাসী ভদ্র মহোদয়গণ,—

আপনারা দেশভক্তি-প্রণোদিত হইয়া এ বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত সাহিত্যসেবকগণের পরিচর্য্যার গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন; আমরা আপনাদের সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি, এবং রাজ-সাহীর রাজোচিত আতিথ্য-ভাবের উপর আর একটা গুরুভার চাপাইতে সাহসী হইতেছি; তাহা এই :—

বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি-তত্ত্ব নিরূপণের জন্য উত্তর হইতে উপকরণ সংগ্রহ

করিয়া গ্রন্থ প্রচার আবশ্যক—এতদর্থে রাজসাহীকে অনুরোধ করা হউক, এবং আগামী বৎসরের সাহিত্য-সম্মিলনে সংগৃহীত তথ্য উপস্থিত করা হউক।

নিমন্ত্রিত অতিথিগণের বোঝার উপর এই নূতন আর একটা বোঝাকে আপনারা নিতান্তই শাকের আটি করিয়া গ্রহণ করিবেন কিনা, জানি না, কিন্তু সভাপতি মহোদয়ের আদেশ লঙ্ঘনে আমার ক্ষমতা নাই। আজ যাঁহাকে আপনারা সভাপতির পদে বরণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন, আমি আমাকে তাঁহার একান্ত অনুবর্ত্তী অনুচর মধ্যে গণ্য করিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করিয়া থাকি। তাঁহার আদেশেই আমাকে বাধ্য হইয়া এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার প্রতি যে কঠোর আদেশ হইয়াছে, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সভাপতি মহোদয় সেই আদেশ পালনে আমার যোগ্যতা টুকুও বিস্মৃত হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং আলোক-বর্ত্তিকা হাতে লইয়া বিজ্ঞান শাস্ত্রের অজ্ঞানাচ্ছাদিত যে পথে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন, আমিও অতি দূরে থাকিয়া সেই পথে তাঁহার পশ্চাতে অনুসরণ করি; সেই পথের উপযুক্ত কোন একটা আদেশ দিলে বরং আমি সাহস করিয়া দুইটা কথা বলিতে পারিতাম, কিন্তু সহসা তিনি আমাকে পথে ঠেলিয়া দিয়াছেন, যেখানে কোন কথা উচ্চারণ করিতে গেলে আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চার ধৃষ্টতা আসিয়া পড়ে। কাজেই অমি অতি সভয়ে ও অতি সংক্ষেপে আমার উদ্দেশ্যই আপনাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিয়া আপনাদের নিকট বিদায় লইব।

এই উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিবার পক্ষে আমার সামান্য একটু অধিকার আছে। কলিকাতা হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে কতিপয় সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী বন্ধুর সহিত আমি আপনাদের আহ্বানে এখানে উপস্থিত হইয়াছি; সেই সাহিত্য-পরিষৎ সভা এক্ষণে আপনাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে। এই রাজসাহী নগরে সেই সাহিত্য-পরিষদের একটী শাখা আছে, এবং আপনাদেরই মান্য ব্যক্তিগণ সেই শাখার পরিচালনা করিতেছেন। সেই সাহিত্য-পরিষদের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য—বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের পথ দিয়া বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালী জাতির বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন বিভাগ মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বন্ধন স্থাপন দ্বারা জাতীয় ঐক্য স্থাপন। আমরা আমাদের দেশকে ও আমাদের জাতিকে নিতান্ত আত্মীয় ভাবে জানিতে চাই। বাঙ্গালা দেশের কোথায় কি আছে ও কোথায় কি ছিল, বাঙ্গালী জাতির সম্পৎ কোথায় কি আছে, কোথায় কি ছিল,

তাহা আমরা জানিতে চাই। এই জন্য আমাদের মনে একটা আকাঙ্ক্ষা, একটা আগ্রহ জন্মিয়াছে, এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলে আমাদের তৃপ্তি হইবে না। সকল জ্ঞানের মূলে আত্মজ্ঞান! আমরা কে, আমরা কি, আমরা কোথা হইতে কিরূপে কোন সময়ে কি জন্য আসিয়াছি, এই জ্ঞান লাভ আমাদের পক্ষে আবশ্যক, বিধাতা কি উদ্দেশ্যে পৃথিবীর কোন্ কার্য্য সাধনের জন্য আমাদিগকে এই ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা সেই জ্ঞান লাভ হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব এবং তখনই আমরা আমাদের সামর্থ্য বুঝিয়া আমাদের যোগ্যতা নিরূপণ করিয়া জগতে আমাদের সাধ্যমত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইব। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ যে উদ্দেশ্য লইয়া জন্মিয়াছে, আমি এই গোঁড়ার তত্ত্বনিরূপণকেই তন্মধ্যে উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমাদের ব্যগ্রতা, এই জন্য আমরা এই সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষ করিয়া বঙ্গভূমির জেলায় জেলায় ছুটাছুটি করিতে প্রস্তুত হইয়াছি এবং এ বৎসর আপনাদের শান্তি ভঙ্গ করিতেছি। আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে,আমরা যে দেশের পরিচর্য্যা করিতে ইচ্ছুক,সেই মহাদেশের— সেই হিন্দু মুসলমানের মহাদেশের—আমরা যে জাতির জাতীয় ভাবের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছি, সেই মহাজাতির—সেই হিন্দুমুসলমান মহা-জাতির—সম্যক্ পরিচয় জানি না—আমাদের কোথায় কোন্ রত্ন নিহিত আছে, আমাদের কোথায় কি বল আছে, তাহা আমরা জানি না—পৃথিবীর নিকট আমাদের আত্মপরিচয় পুরা সাহসের সহিত আমরা দিতে পারি না। আমরা কোথা হইতে এদেশে আসিলাম, আমাদের আদিপুরুষ কে ছিলেন, তাঁহারা কবে কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তাহা আমরা জানি না—আমাদের নিজের পরিচয় জানিবার জন্য আমাদিগকে বৈদেশিকের মুখের দিকে চাহিতে হয়—হণ্টার সাহেবের ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল্ গ্রন্থ খুঁজিতে হয়—বিদেশী রাজপুরুষের সংগৃহীত সেন্সাসের খাতার পাতা উল্টাইতে হয়। ইহা পরিতাপের বিষয়—ইহা লজ্জার বিষয়। এই লজ্জা দূর করা আবশ্যক—আমাদের জাতীয়ত্বের মূল কোথায় প্রতিষ্ঠিত, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে, সেই মূল হইতে কিরূপে মহীরুহ নির্গত হইয়া শাখাপ্রশাখা প্রসারিত করিয়াছে, তাহা জানিতে হইবে; তবে আমরা আমাদের জাতীয়তা লইয়া জগতের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইব। নতুবা আমাদের জাতীয়তার স্পর্দ্ধা কেবল বৃথা বাগাড়ম্বর ও উপহাস্য আস্ফালনমাত্র হইবে। আমরা স্বদেশের রঙ্গমঞ্চে

করিয়া গ্রন্থ প্রচার আবশ্যক—এতদর্থে রাজসাহীকে অনুরোধ করা হউক, এবং আগামী বৎসরের সাহিত্য-সম্মিলনে সংগৃহীত তথ্য উপস্থিত করা হউক।

নিমন্ত্রিত অতিথিগণের বোঝার উপর এই নূতন আর একটা বোঝাকে আপনারা রিতান্তই শাকের আটি করিয়া গ্রহণ করিবেন কিনা, জানি না, কিন্তু সভাপতি মহোদয়ের আদেশ লঙ্ঘনে আমার ক্ষমতা নাই। আজ যাঁহাকে আপনারা সভাপতির পদে বরণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন, আমি আমাকে তাঁহার একান্ত অনুবর্ত্তী অনুচর মধ্যে গণ্য করিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করিয়া থাকি। তাঁহার আদেশেই আমাকে বাধ্য হইয়া এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার প্রতি যে কঠোর আদেশ হইয়াছে, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সভাপতি মহোদয় সেই আদেশ পালনে আমার যোগ্যতা টুকুও বিস্মৃত হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং আলোক-বর্ত্তিকা হাতে লইয়া বিজ্ঞান শাস্ত্রের অজ্ঞানাচ্ছাদিত যে পথে অগ্রবর্ত্তী হইয়া-ছেন, আমিও অতি দূরে থাকিয়া সেই পথে তাঁহার পশ্চাতে অনুসরণ করি; সেই পথের উপযুক্ত কোন একটা আদেশ দিলে বরং আমি সাহস করিয়া দুইটা কথা বলিতে পারিতাম, কিন্তু সহসা তিনি আমাকে পথে ঠেলিয়া দিয়াছেন, যেখানে কোন কথা উচ্চারণ করিতে গেলে আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চার ধৃষ্টতা আসিয়া পড়ে। কাজেই অমি অতি সভয়ে ও অতি সংক্ষেপে আমার উদ্দেশ্যই আপনাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিয়া আপনাদের নিকট বিদায় লইব।

এই উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিবার পক্ষে আমার সামান্য একটু অধিকার আছে। কলিকাতা হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে কতিপয় সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী বন্ধুর সহিত আমি আপনাদের আহ্বানে এখানে উপস্থিত হইয়াছি; সেই সাহিত্য-পরিষৎ সভা এক্ষণে আপনাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে। এই রাজসাহী নগরে সেই সাহিত্য-পরিষদের একটী শাখা আছে, এবং আপনাদেরই মান্য ব্যক্তিগণ সেই শাখার পরিচালনা করিতেছেন। সেই সাহিত্য-পরিষদের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য—বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের পথ দিয়া বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালী জাতির বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন বিভাগ মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বন্ধন স্থাপন দ্বারা জাতীয় ঐক্য স্থাপন। আমরা আমাদের দেশকে ও আমাদের জাতিকে নিতান্ত আত্মীয় ভাবে জানিতে চাই। বাঙ্গালা দেশের কোথায় কি আছে ও কোথায় কি ছিল, বাঙ্গালী জাতির সম্পৎ কোথায় কি আছে, কোথায় কি ছিল,

তাহা আমরা জানিতে চাই। এই জন্য আমাদের মনে একটা আকাঙ্ক্ষা, একটা আগ্রহ জন্মিয়াছে, এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলে আমাদের তৃপ্তি হইবে না। সকল জ্ঞানের মূলে আত্মজ্ঞান! আমরা কে, আমরা কি, আমরা কোথা হইতে কিরূপে কোন সময়ে কি জন্য আসিয়াছি, এই জ্ঞান লাভ আমাদের পক্ষে আবশ্যক, বিধাতা কি উদ্দেশ্যে পৃথিবীর কোন্ কার্য্য সাধনের জন্য আমাদিগকে এই ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা সেই জ্ঞান লাভ হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব এবং তখনই আমরা আমাদের সামর্থ্য বুঝিয়া আমাদের যোগ্যতা নিরূপণ করিয়া জগতে আমাদের সাধ্যমত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইব। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ যে উদ্দেশ্য লইয়া জন্মিয়াছে, আমি এই গোড়ার তত্ত্বনিরূপণকেই তন্মধ্যে উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমাদের ব্যগ্রতা, এই জন্য আমরা এই সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষ করিয়া বঙ্গভূমির জেলায় জেলায় ছুটাছুটি করিতে প্রস্তুত হইয়াছি এবং এ বৎসর আপনাদের শান্তি ভঙ্গ করিতেছি। আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে,আমরা যে দেশের পরিচর্য্যা করিতে ইচ্ছুক,সেই মহাদেশের— সেই হিন্দু মুসলমানের মহাদেশের—আমরা যে জাতির জাতীয় ভাবের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছি, সেই মহাজাতির—সেই হিন্দুমুসলমান মহাজাতির—সম্যক্ পরিচয় জানি না—আমাদের কোথায় কোন্ রত্ন নিহিত আছে, আমাদের কোথায় কি বল আছে, তাহা আমরা জানি না—পৃথিবীর নিকট আমাদের আত্মপরিচয় পূরা সাহসের সহিত আমরা দিতে পারি না। আমরা কোথা হইতে এদেশে আসিলাম, আমাদের আদিপুরুষ কে ছিলেন, তাঁহারা কবে কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তাহা আমরা জানি না—আমাদের নিজের পরিচয় জানিবার জন্য আমাদিগকে বৈদেশিকের মুখের দিকে চাহিতে হয়—হণ্টার সাহেবের ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল্ গ্রন্থ খুঁজিতে হয়—বিদেশী রাজপুরুষের সংগৃহীত সেন্সাসের খাতার পাতা উল্টাইতে হয়। ইহা পরিতাপের বিষয়— ইহা লজ্জার বিষয়। এই লজ্জা দূর করা আবশ্যক—আমাদের জাতীয়ত্বের মূল কোথায় প্রতিষ্ঠিত, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে, সেই মূল হইতে কিরূপে মহীরুহ নির্গত হইয়া শাখাপ্রশাখা প্রসারিত করিয়াছে, তাহা জানিতে হইবে; তবে আমরা আমাদের জাতীয়তা লইয়া জগতের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইব। নতুবা আমাদের জাতীয়তার স্পর্দ্ধা কেবল বৃথা বাগাড়ম্বর ও উপহাস্য আস্ফালনমাত্র হইবে। আমরা স্বদেশের রঙ্গমঞ্চে

দাঁড়াইয়া, স্বদেশের ভাবের অভিনয় করিলে—বাহিরের জগৎ আমাদের অভিনয় দেখিয়া হাসিবে ও করতালি দিবে।

রাজসাহীর নিকট আমরা কি প্রার্থনা করিতেছি, একটা দৃষ্টান্তে বুঝা যাইবে। আমার পরম স্নেহভাজন আপনাদের আদরের পাত্র শ্রীমান্ কুমার শরৎকুমার রায় আজ প্রাতে আপনাদিগকে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়াছেন। এই রাজসাহী সেই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের এক খণ্ড মাত্র।

স্থূলতঃ এখন বরেন্দ্রভূমি বলিলে যাহা বুঝি, এককালে তাহা পৌণ্ড্রভূমি ছিল। সেই পৌণ্ড্রাজের রাজধানী পাণ্ডুয়ায় ছিল, কি মহাস্থানে ছিল, তাহা লইয়া ঐতিহাসিকেরা বিতণ্ডা করিতেছেন; কিন্তু এই দেশ যে এক কালে পুণ্ড্রজাতির দেশ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, এই পুণ্ড্রজাতি এখন কোথায়? আধুনিক পুঁড়ো, পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকাক্ষ কি তাঁহাদেরই বংশধর? পুণ্ড্রজাতি এখন লুপ্ত হইয়াছেন, অথবা এই বরেন্দ্র জনপদ এখনও পৌণ্ড্রজাতিরই ভূমি রহিয়াছে, কি পৌণ্ড্রক রীতি নীতি উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা না জানিলে আমরা বরেন্দ্রভূমি ও বরেন্দ্রসমাজ চিনিব কিরূপে?

এখনকার রাজসাহী মুসলমানপ্রধান বা হিন্দুপ্রধান—তাহা লইয়া তর্ক করিয়া আপাততঃ লাভ নাই। আমরা সাহিত্য-সম্মিলনে আসিয়া রাজসাহীকে হিন্দুমুসলমান প্রধান বলিয়াই দেখিব এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনকে হিন্দু মুসলমানের অন্যতম সম্মিলনোপায় বলিয়াই জানিব। কিন্তু এমন দিন ছিল, তখন রাজসাহীতে মুসলমান ছিলেন না, হিন্দুও ছিলেন না। সে বহুদিনের কথা; তখন এই ভূমি অনার্য্যভূমি ছিল—অনার্য্যভূমিতে আর্য্যাধিকার প্রসারের পরে ইহা হিন্দুর দেশ এবং আরও পরে হিন্দু মুসলমানের দেশ হইয়াছে! কিন্তু সেই অনার্য্য আদিম নিবাসী এখনকার হিন্দু মুসলমান সমাজের মধ্যে কি চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন?—এই হিন্দু মুসলমান সমাজের মধ্যে কতটুকু অনার্য্যত্ব কতটুকু আর্য্যত্ব মিশ্রিত আছে? এককালে যে পুণ্ড্রজাতির এখানে অবিসংবাদী অধিকার ছিল, তাঁহারা অনার্য্য ছিলেন কি আর্য্য ছিলেন?

ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ও সমাজতাত্ত্বিকগণের সকল মত আমরা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহি, কিন্তু তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তকে উপহাসে উড়াইতে সম্প্রতি আমাদের অধিকার নাই। অন্ততঃ যতদিন হাণ্টারের গেজেটিয়ার ও রিজলির সেন্সাস্ বহির পাতাই আমাদের আত্মপরিচয় লাভের একমাত্র অবলম্বন

থাকিবে, ততদিন সেইরূপ উপহাসে আমাদিগের অধিকার নাই। ইংরেজ লেখকেরা বলিতে চাহেন, বঙ্গদেশের সমাজ মুখ্যতঃ অনর্য্য সমাজ—বাঙ্গালীর শোণিতের চৌদ্দ আনা অনার্য্যরক্ত। এমন কি, অনেকে ইহাও বলিতে চাহেন যে, আধুনিক বাঙ্গালী যে ভাষায় কথা কহেন, সে ভাষা সংস্কৃত আর্য্যভাষার পরিচ্ছদ পরিয়া থাকিলেও উহা মূলে অনার্য্য ভাষা; উহার অস্থিমাংস আর্য্য উপকরণে গঠিত হইলেও উহার মজ্জামধ্যে অনার্য্যত্ব প্রচ্ছন্ন আছে। বিদেশী পণ্ডিতদের এই সকল সিদ্ধান্ত আমাদের রুচিকর হয় না। অথচ এই সকল সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ জন্য যে প্রমাণের প্রয়োজন, অবশ্য সে সকল প্রমাণ আমাদের হাতে নাই, আমরা সেই প্রমাণ সংগ্রহের জন্য কোন চেষ্টা করি নাই। প্রাচীন পৌণ্ড্রজাতিই অনার্য্য ছিল, কি আর্য্য ছিল, তাহা আমরা ঠিক জানি না। অতি প্রাচীনকালে আমরা পৌণ্ড্রক জাতির আধিপাত্যর নিদর্শন পাই। বৈদিক সাহিত্যে এই জাতির উল্লেখ আছে, মহাভারতে পুরাণে, ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাদের উল্লেখ আছে। পৌণ্ড্রক নরপতি বাসুদেব ভগবান দ্বারকাপতি বাসুদেবের রাজচিহ্ন ধারণে সাহসী হইয়া তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতার স্পর্দ্ধা করিতেন, এই কাহিনী পুরাণমধ্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে জাতির এক সময়ে এইরূপ প্রভাব ছিল, তাঁহারা আর্য্য না অনার্য্য? আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহাদের সভ্যতার অধিকার পাইয়াছি, না বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিজস্ব অপহরণ করিয়াছি, এই মূল তথ্যের এখনও মীমাংসা হয় নাই। বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ পিতৃকর্ত্তৃক নির্ব্বাসনের পর পূর্ব্বদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া দস্যুর সংখ্যা বাড়াইয়াছিলেন, এই আখ্যায়িকার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে? আর্য্যবংশীয়েরা আর্য্যজাতির মধ্যদেশের আর্য্য-সমাজ হইতে দূরে সরিয়া শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়া-লোপহেতু নিন্দিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই উক্তির মধ্যেই বা কতটুকু সত্য আছে? ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা হয়ত একবাক্যে বলিবেন, পৌণ্ড্রজাতি অনার্য্য জাতি, কিন্তু আমরা এই সকল প্রাচীন কিংবদন্তীকে একবারে উপেক্ষা করিতে পারি না। সাহিত্য-সম্মিলনের বৈজ্ঞানিক সভাপতি মহাশয় আমাকে সমর্থন করিবেন যে, বৈজ্ঞানিক বিচার-পদ্ধতি কোন পণ্ডিতেরই বাক্যকে অভ্রান্ত বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে—সেই পণ্ডিতের গায়ের চামড়া কালই হউক আর ধ'লই হউক।

আমরা রাজসাহীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা এই প্রশ্নের মীমাংসার পথ একটু প্রশস্ত করিয়া দিন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দেশের ইতিহাস

লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু ইতিহাসের প্রচুর উপকরণ এখনও দেশের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ক্রমে সেই উপকরণ সংগৃহীত হইলে তাহা হইতে দেশের ইতিহাস আবিষ্কৃত হইবে। সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি মহাশয় কিমিয়া বিদ্যাকে আপনার বশীভূত করিয়াদেন; তিনি আমাদিগকে শিখাইতেছেন, কিরূপে উৎকট যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষণ দ্বারা তাহার অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন মূল উপকরণগুলি বাহির করিতে পারা যায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কেবল কিমিয়া বিদ্যার একচেটিয়া নহে। ঐতিহাসিকেরাও সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আশ্রয় করিয়া আমাদের এই যৌগিক সমাজকে বিশ্লেষণ দ্বারা তাহার অন্তর্গত মূল উপাদান গুলি আবিষ্কারে সমর্থ হইতে পারেন। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত,যিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিনিধি স্বরূপে এই সভায় উপস্থিত আছেন, তিনি আমাদিগকে বুঝাইবেন, কিরূপে পদ্মা মহানদীর তীরদেশের মাটি খুঁড়িয়া প্রচ্ছন্ন জীবাস্থির বা উদ্ভিজ্জদেহের আবিষ্কার দ্বারা দেখান যাইতে পারে, পদ্মাদেবী কিরূপে এবং কত বৎসরে হিমালয়ের বুক চিরিয়া হিমাদ্রি পাষাণকে দ্রবীভূত করিয়া সেই দ্রবীভূত পাষাণের স্তরের উপর স্তর গাঁথিয়া এই সুজলা সুফলা বরেন্দ্র ভূমিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। কোন ইতিহাস লেখক এই পদ্মাদেবীর এই বিচিত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই, কিন্তু আমার ভূতত্ত্ববিৎ বন্ধু পদ্মাদেবীর কত লক্ষ বৎসরের ইতিবৃত্ত এক নিশ্বাসে আপনাদিগকে শুনাইয়া দিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিবেন না। সেইরূপ, আমি বলিতে চাহি,আপনাদের বর্ত্তমান এই বরেন্দ্র সমাজের অভ্যন্তরে প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন ভাষা, প্রাচীন রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, গ্রাম্য গীত ও লৌকিক বচন উপকথা ও ব্রতকথা ছেলে ভুলান ছড়া ও দিদি মায়ের রূপকথা মধ্যে যে সকল প্রাচীন নিদর্শনের ভগ্নাবশেষ প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত আছে, তাহার আবিষ্কার দ্বারা শত শতাব্দ ধরিয়া স্তরের উপর স্তর গাঁথিয়া যে মানব সমাজ গঠিত হইয়াছে, তাহার ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের আশা দুরাশা নহে।

এই ইতিহাস সঙ্কলনে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আমরা অতিথি ও ভিক্ষুকরূপে আপনাদের দ্বারদেশে আজ আঘাত করিতেছি, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন যেথায় যে জেলায় উপস্থিত হইয়া গৃহস্থের দ্বারে করাঘাত করিবে, তখন সেই দ্বারে দাঁড়াইয়া আমরা আমাদের প্রার্থনা জানাইব। সকলের সমবেত চেষ্টায় আমাদের, অর্থাৎ এই নবজীবনের স্পন্দনে স্পন্দমান বাঙ্গালী জাতির, জাতীয়-

তার মূল উৎস আবিষ্কৃত হইবে ও ইহার মূল ভিত্তি প্রকাশিত হইবে। সেই উৎস হইতে ধারাসেচনে ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিয়া আমাদের জাতীয়তা কলনাদিনী স্রোতস্বতী তরঙ্গিণী পদ্মার প্রাবৃট্‌কালের বিপুলকায় ধারণ করিবে, সেই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের জাতীয় ভাবের সুরম্য হর্ম্ম্য গগনমূলে উঠিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দিবে। এক বৎসরে এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন যদি শতবৎসর জীবিত থাকে, তবে সেই শতবৎসর পরে আমাদের প্রপৌত্রগণ এই রাজসাহী নগরে পুনরায় সম্মিলিত হইয়া এই কার্য্যের আংশিক সফলতা দেখিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। আমরা সেই কার্য্যের আরম্ভ করিয়া যাইতে পারিলেই চরিতার্থ হইব এবং বঙ্গদেশের সাহিত্যিক সমাজের মুখপাত্রস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমরা যে কয়জন আপনাদের সাদর আহ্বানে উপস্থিত হইয়া, আপনাদের বোঝার উপর এই শাকের আঁটি চাপাইতে বসিয়াছি, তাঁহারাও কৃতার্থম্মন্য হইবেন।"

প্রস্তাবক বলেন,—

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় ও মাননীয় সাহিত্য-সেবিগণ, এই পঠিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে, আমাদের সময় যেরূপ সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে অতি অল্পের মধ্যে এ বিষয়ে আমার বক্তব্য শেষ করিতে হইবে। এই প্রস্তাবটির কিরূপ গুরুত্ব আছে, তাহা অপর কোন যোগ্যতর ব্যক্তি বিবৃত করিলে ভাল হইত। তথাপি আমার উপর যখন ভার পড়িয়াছে, তখন যাহা পারি আমাকে বলিতেই হইবে।

আপনারা সকলেই ইহা বিশেষরূপে জানেন যে, কোন ভাষাকে সম্যক প্রকারে জানিতে ও বুঝিতে হইলে তাহার ভাষাতত্ত্ব আলোচনা নিতান্ত আবশ্যক। ভাষাতত্ত্ব না জানিলে তাহার অন্তস্তলে প্রবেশ করা যায় না। বঙ্গসাহিত্যে "বিহান" কথা প্রচলিত আছে এবং আমরা জানি যে তাহার অর্থ প্রাতঃকাল। কিন্তু কিরূপে তাহার অর্থ প্রাতঃকাল হইল, তাহা অনেকেই অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই। এখানে আমাদিগকে ভাষাতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তখন জানিতে পারিব যে, তাহা সংস্কৃত "বিভান" শব্দ হইতে হইয়াছে। সংস্কৃতে "বিভাত" শব্দ অতি প্রসিদ্ধ এবং ভ স্থানে প্রাকৃতে হ অনেক স্থানেই হইয়া থাকে। রাজসাহীতে "গাভার" বলিয়া একটা কথা আছে এবং ইহা গর্ত্তকে বুঝাইয়া থাকে। ভাষাতত্ত্বের দ্বারাই আমরা জানিতে পারি যে, সংস্কৃত "গহ্বর" ক্রমশঃ "গাভার" হইয়াছে (গহ্বর—গরহ্বর—গরভর—গাভার)।

এখানে কোথায় এই অর্থে "কো" শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইহা সংস্কৃত "ক" হইতে হইয়াছে। এরূপ অসংখ্য উদাহরণ দিতে পারা যায়।

আমরা যদি নানা স্থানের প্রাদেশিক সর্ব্বনাম শব্দগুলি সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাদের মূল নির্দ্ধারণ করা সুন্দর হইয়া উঠিবে এবং এইরূপে বঙ্গভাষাকে সম্যকরূপে জানিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে।

এই প্রসঙ্গে আমি আর একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমাদের বঙ্গভাষার সহিত সংস্কৃতের কত নিকট সম্বন্ধ, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু ঠিক বলিতে হইলে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, খাঁটি বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃতের সম্বন্ধ অধিকতর সন্নিকৃষ্ট। অতএব যদি বাঙ্গালার সম্যক্ আলোচনা করিতে হয়, তবে আমাদিগকে প্রাকৃত ভাষা রীতিমত আলোচনা করিতে হইবে। কেবল ভাষাতত্ত্বের জন্যই নহে, প্রাকৃত ভাষার যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা বাঙ্গালায় আনিতে পারিলে ইহার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইবে। প্রাকৃত প্রসঙ্গে আমি জৈনগণের প্রাকৃত (আর্য্য) ও বৌদ্ধগণের প্রাকৃত পালির কথা বিশেষভাবে বলিতেছি। বঙ্গসাহিত্য সেবিগণের এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক, ইহাই আমি প্রার্থনা করিতেছি।"

সমর্থক বলিলেন :—

"এই প্রস্তাব সমর্থনের ভার এক অতি অসমর্থের উপর পড়িয়াছে—ইহা বিনয়ের কথা নহে।

প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করা বাহুল্য, বক্তৃতা অনেক হইতেছে; উহার আর কাজ নাই। এখন কার্য্য করিতে হইবে। বক্তৃতায় আমরা পঞ্চমুখ কিন্তু কাজে সততই পরাঙ্মুখ; আমাদের এই দুর্নাম কি দূর হইবে না?

আমরা আজ একরূপ ত্যাগী কর্ম্মবীর সভাপতিরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছি, তাঁহার আদর্শে আশা করি, আমরা কর্ম্মে উৎসাহিত হইব।

বঙ্গের নানা স্থানে প্রচলিত শব্দের (অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণ সর্ব্বনাম ক্রিয়া ইত্যাদির) যে সকল ভিন্ন ভিন্ন আকার, ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিযোগে—দেখা যায়, তাহা সংগ্রহার্থ সাহিত্যিক সভাগুলির যোগে শিক্ষিত সমাজকে আহ্বান করা হইতেছে। সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন, সাহেবেরা আমাদিগকে বাঙ্গালা ভাষা সম্পর্কীয় নানা বিষয়ে পথপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন—প্রস্তাবিত বিষয়েও তাঁহারাই আমাদিগকে পথ দেখাইয়া রাখিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া ডাঃ গ্রিয়ারসন Linguistic Survey of India উপলক্ষে বঙ্গের

ভিন্ন ভিন্ন জিলার ভিন্ন ভিন্ন শব্দের বিভক্তি সম্প্রতি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থকারে মুদ্রিত হইয়াছেন। ইহাতে যে সকল অসম্পূর্ণতা আছে, তাহা সারিয়া নিতে হইবে। কিন্তু কাজ অতিশয় সুগম হইয়া আছে।

এই সকল সংগ্রহের উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে বঙ্গভাষার ইতিবৃত্তানুসন্ধানে সহায়তা হইবে। বিশেষতঃ প্রাচীন কবিগণ স্বীয় রচনায় জন্মস্থানের গ্রাম্য-ভাষার বহুল আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ সংগ্রহদ্বারা তাঁহাদের লিখিত কাব্যের অর্থাবোধের সাহায্য হইবে।

নচেৎ অধুনা ভাষার একতা সাধনই সাহিত্যিক মাত্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এমন কি, যাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষ মধ্যে আমরা পরস্পরের ভাষা অনায়াসে বা অল্পায়াসে বুঝিতে পারি, তজ্জন্য আপন আপন মাতৃভাষাকে তৈয়ার করিতে হইবে। সেই নিমিত্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে গ্রাম্য অপভাষা বা শব্দের অপপ্রয়োগ বর্জ্জন করিতেই হইবে।

কিন্তু বর্জ্জনের পূর্ব্বে তাহাদের হিসাব নিকাশ করাটা মন্দ নয়। তজ্জন্যও প্রস্তাবটী সমর্থনীয় বটে।

আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম-এ উত্থাপন এবং শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় সমর্থন করেন। তদ্যথা—

"বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যপ্রণালী স্থির করণের নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপর ভার অর্পিত হউক।"

শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সভাপতি।
„ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।
„ কুমার শরৎকুমার রায়।
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র।
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

সপ্তম প্রস্তাব—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ উত্থাপন এবং প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম-এ সমর্থন করেন। তদ্যথা,—

"বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা ও মধ্য পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর ইচ্ছানুসারে ইতিহাস, ভূগোল ও গণিত শাস্ত্রে মাতৃভাষায় অধ্যাপনা ও পরীক্ষা-গ্রহণ হইতে পারে, তজ্জন্য সম্মিলন বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করিতেছেন।"

প্রস্তাবক বলেন,—

"বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী আশানুরূপ ফল প্রদান করিতেছে না—গবর্ণমেণ্ট এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় ইহার উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। মাতৃভাষার ভিত্তির উপর প্রোথিত না হইলে কোন শিক্ষাই শিক্ষা নামের উপযুক্ত হইতে পারে না। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট ইংরেজি স্কুলের নিম্নশ্রেণী সমূহে যাহাতে বঙ্গভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রদত্ত হয়,তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয় উচ্চ পরীক্ষা সমূহে বাঙ্গালাকে একটী স্বতন্ত্র সম্মানের স্থান দিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বঙ্গভাষা যেরূপ উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহাতে ভারতবর্ষীয় আধুনিক ভাষা সমূহের মধ্যে বাঙ্গালাই যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয় বাঙ্গালার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিলে অচিরকালে ইহা বিভবশালিনী হইয়া উঠিবে। বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাঙ্গালার সাহায্যে ইতিহাসের পরীক্ষার গ্রহণের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, মধ্যে পরীক্ষায় গণিত ও ইতিহাসের অধ্যাপনা ও পরীক্ষার পক্ষে সেইরূপ বিকল্প-ব্যবস্থা করিলে বঙ্গভাষার প্রসার বৃদ্ধি হইবে এবং শিক্ষাপদ্ধতি ও আশানুরূপ ফলপ্রসূ হইবে। এই অধিবেশন শিক্ষা ও মাতৃভাষা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করিবার ভার আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে, আমি সে প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা বরিব।"

পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়।

দ্বিতীয় দিবস।

১৯শে মাঘ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

পূর্ব্বাহ্ন ৮টা হইতে অপরাহ্ন ২টা পর্য্যন্ত।

প্রারম্ভে পূর্ব্ববৎ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন মহাশয় ও অন্যান্যে তদ্রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী গান করেন।

জ্ঞান শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সেব্য জ্ঞান পুরুষকার,
জ্ঞান কুশল-সার;
জ্ঞান ধর্ম্ম, জ্ঞান মোক্ষ, জ্ঞান অমৃত-ধার,
জড় জীবন যার, অলস অন্ধকার,
জ্ঞান বন্ধুতার।

সমালোচন।

সৃষ্টিতে সমালোচন নাই; তখন কেবল বিস্ময়, কেবল আনন্দ। বিশ্বব্যাপিনী তমসার কোলে প্রথম যে দিন জ্যোতিষ্কমণ্ডল একে একে বা যুগপৎ ভাসিয়া উঠিল, তখন কেহ সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান থাকিলে, তাঁহার চিত্ত অভাবনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইত, অবেশ্য বিস্ময়ে অভিভূত হইত। জ্যোতিষ্কগণ স্থিতিশীল হইলে কি গতিশীল হইলে ভাল হয়, মাস-রূপ বিহঙ্গের এক পক্ষ শুক্ল আর এক পক্ষ কৃষ্ণ হওয়াতে সুবিধা হইয়াছে কি অসুবিধা হইয়াছে, এ কথা ভাবিবার অবসর তখন সে কল্পিত চিত্তে স্থান পাইত না। তাহার পর বিস্ময়ের নিবিড় গাঢ়তা ক্রমে যেমন অপনীত হইতে লাগিল, জীব যেমন বিশ্বযন্ত্রে আপনার স্থান চিনিয়া, আপনার সুখ-দুঃখে আপনার ভোগের মাত্রা বুঝিয়া, প্রথমে যাহা নিরবচ্ছিন্ন অনুগ্রহ ছিল, তাহাতে আপনার একটা দাবী অনুভব করিয়া ভালমন্দ বিচারের অবসর পাইল; তখন তাহার গায়ে একটা অতৃপ্তির বাতাস আসিয়া লাগিল, তাহার হৃদয়ে একটা সমালোচনের তাড়না স্ফুরিত হইয়া উঠিল। তখন বিস্ময়ে এবং আনন্দের বিপরীত ভাব হৃদয়কে অধিকার করিতে লাগিল, কেহ সৃষ্টিকৌশলে অসামঞ্জস্য কল্পনা করিয়া নাস্তিক হইয়া উঠিল, কেহ বা—

> "স্বর্ণে ন গন্ধঃ ফলমিক্ষুদণ্ডে,
> নাকারি পুষ্পং খলু চন্দনস্য।
> বিদ্যাবিনোদী নহি দীর্ঘজীবী,
> ধাতুঃ পুরে কোঽপি ন বুদ্ধিদাতা॥"

বলিয়া আপনাকে বিশ্বস্রষ্টা হইতেও অধিক বুদ্ধিমান মনে করিতে লাগিল।

ভারতের (অথবা জগতের) আদি কবির কণ্ঠ হইতে প্রথম যেদিন ভারতী—"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ" বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইলেন, তখন কবি নিজেই বুঝিবা আনন্দাতিশয্যে অভিভূত হইলেন এবং বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চারিদিক চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এ স্বর্গীয় ধ্বনি কিরূপে কোথা হইতে উত্থিত হইল!" সেই দিনের পর কত যুগযুগান্তর অতীত হইয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে কত সালঙ্কৃত মাধুর্য্যগর্ভ কবিতার কতরূপ সমালো-

চনা হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু সেই প্রাচীন কবিতাটী পবিত্র মন্ত্রের ন্যায় সমালোচনার অতীত রহিয়া কণ্ঠেকণ্ঠে আজিও ধ্বনিত হইতেছে। ঈশ্বরের সৃষ্টি-কার্য্যের সমালোচনা হইয়াছে ; কিন্তু বাল্মীকির প্রথম কবিতার সমালোচনা আজিও হয় নাই।

শিশু মাতৃ-কুক্ষি হইতে ধরণীর কোলে অবতারিত হইয়াই এক অভিনব বিস্ময়ের রাজ্যে প্রবেশ করে। তখন তাহার নিকট সকলই নূতন, সকলই অপরিচিত, সকলই এক একটী বিস্ময়ের আকর। মাতা, ধাত্রী, সূতিকা-সঙ্গিনী, জল, বস্ত্র, গৃহ, দীপ-শিখা,—যাহার উপরে তাহার দৃষ্টি পড়ে, তাহা-কেই সে মনে মনে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কে ?" তখন ভালমন্দ বলিয়া তাহার জ্ঞান নাই, সুন্দর কুৎসিত বলিয়া তাহার বোধ নাই, খঞ্জকুব্জ সুঠাম কলেবরে তাহার ভেদজ্ঞান নাই ; তখন সে যাহা দেখে, যাহা শুনে, তাহাই শোভন, মোহন, অপূর্ব্ব বিস্ময়কর !

ক্রমে মানুষ, গরু, বিড়াল, কুক্কুর শিশুর পরিচিত হইতে লাগিল, ক্রমে বিস্ময়ের পরিধি দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিল। শিশু যেদিন প্রথম বাদ্য আবিষ্কার করিল—যেদিন তাহার হাতের খাড়ু, দুধের বাটীর কাণায় লাগিয়া বাজিয়া উঠিল, সেদিন কি যে তাহার আনন্দ, তাহার মুখভরা হাসি এবং পুনঃ পুনঃ সেই শব্দ উৎপাদন করিবার চেষ্টাই সে বিষয়ের প্রমাণ। শৈশবের অনন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার অনন্ত বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে ; কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে এক-খানি ছিন্ন শিশুবোধকে ছাপার অক্ষরে গঙ্গার বন্দনা এবং গুরুদক্ষিণা পাঠ করিয়া যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, উচ্চতম কাব্যে আজ অনুসন্ধান করিয়াও সে আনন্দ পাই না, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইল বলিয়া মনে করি না।

নিরন্ন দরিদ্র আজ হঠাৎ রাজ-ভোগের অধিকারী হইল,—যাহার শাকান্ন জুটিত না, আজ অসংখ্য উপকরণে সজ্জিত অন্নস্থালী তাহার সম্মুখে উপস্থিত। সে যাহা মুখে দিতেছে, তাহাই তাহার রসনা-উপাদেয় অমৃত বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, আজ তাহার বাছিয়া লইবার শক্তি বা অবসর নাই ; কিন্তু কিছুদিন গেলেই আর সে অবস্থা থাকে না ; তখন সে পলান্নে ঘৃতের দুর্গন্ধ পায়, সন্দেশের ভালমন্দ বিচার করে, মিষ্টান্নের দোষ বাহির করিয়া দেয়।

এই দৃষ্টান্তগুলি চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, কিছুরই আরম্ভে, বিরলত্বে বা একত্বে সমালোচনের অবসর নাই, যেখানে পরিণতি, বৈচিত্র্য এবং বহুত্ব বর্ত্তমান, সেখানেই সমালোচনা আসিয়া দেখা দেয়। আর একটুকু নিবিষ্টচিত্তে

চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, যেখানে বুদ্ধিবৃদ্ধির পরিচালনা আছে, যেখানে পুরুষকার-প্রদর্শনের অবসর আছে, যেখানে ভাল বা মন্দ করিবার স্বাধীনতা আছে, সেইখানেই সমালোচনা চলে, অন্যত্র নহে। কৃত্রিমতাই সমালোচনার বিষয়, প্রকৃতি ইহার অধিকারের বাহিরে। প্রকৃতির কার্য্যে আলোচনা চলে, তত্ত্বানুসন্ধান চলে, কিন্তু সমালোচনা চলে না। সমালোচনার তিনটি অঙ্গ—প্রশংসা, নিন্দা এবং আদর্শ-নির্দ্দেশ; কিন্তু প্রকৃতির কর্ণ এই তিনেতেই বধির; সুতরাং প্রকৃতিকে—সমগ্র বিশ্ব-ব্যাপারকে ছাড়িয়া—সমালোচনাকে কেবল মানবীয় কার্য্যাবলীর গণ্ডীর ভিতরে আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

কিন্তু গণ্ডীর ভিতরে আছে বলিয়া যে সমালোচনাকে কায না পাইয়া অবসর বসিয়া থাকিতে হইয়াছে, এমন নহে। মানবের কার্য্য যেখানে বর্ত্তমান, সমালোচনাও সেইখানেই রহিয়াছে; মানবের কার্য্য যেমন অশেষ, সমালোচনাও সেইরূপ অশেষ মূর্ত্তিতেই প্রকাশ পাইতেছে। এমন কার্য্য নাই, যাহা একেবারে নিন্দা-প্রশংসা-বর্জ্জিত, যাহার একটা না একটা নিন্দা বা প্রশংসা না হইতে পারে।

মানবীয় কার্য্য অশেষ হইলেও, তাহার মধ্যে কয়েকটিকে প্রধান বলা যাইতে পারে। ধর্ম্ম প্রধান বটে, কিন্তু ইহাকে গুণ বলিব কি কর্ম্ম বলিব বুঝি না; সম্ভবতঃ উভয়ই বলিতে হইবে। ধর্ম্ম কর্ম্ম হইলেও তাহা আধ্যাত্মিক সাধনের ব্যাপার, তাহার একগুণ বাহিরে প্রকাশ পাইলে, শতগুণ ভিতরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়; সুতরাং তাহার তলা পাইয়া সেখানে সমালোচনা নিরস্ত—নির্ব্বাক্ থাকে। বিজ্ঞান তত্ত্বান্বেষণে ব্যাকুল, মানবের জ্ঞান-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করাই যেন তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানের ভাগ্যে বিশ্রাম লেখা নাই, সে বহুদিনের অনুসন্ধানে যেমন একটি তত্ত্ব লাভ করিল, অমনি আর একটী নূতন তত্ত্বের সংবাদ তাহার প্রাণে আসিয়া পঁহুছিল; সে আবার তাহার পেছনে পেছনে ছুটিল। এই অনুসন্ধানেই বিজ্ঞানের আনন্দ, বিশ্রামে তাহার মৃত্যু। বিজ্ঞান এইরূপে প্রাণপাত করিয়া যে তত্ত্ব সংগ্রহ করিতেছে, তাহাই মানবজাতির স্থায়ী সম্পত্তি, তাহাই উন্নতির নিদান, তাহাই কার্য্যের নিয়ামক এবং তাহাই কার্য্যের ভালমন্দ বিচার করিবার মাপকাঠি। যে কার্য্য বিজ্ঞানের অনুমোদিত, তাহাতেই সাফল্যের আশা করা যায়; বিজ্ঞান-বিরোধী কার্য্য পণ্ডশ্রম মাত্র। বিজ্ঞানই যখন সমালোচক, অর্থাৎ কার্য্যের বিজ্ঞান-সম্মত বিচারই যখন সমালোচনা, তখন তাহার আলোচনা সম্ভাবিত হইলেও সমালো-

চনা সম্ভাবিত নহে। বিজ্ঞানের আলোচনায় ভ্রান্তি প্রবেশ করিতে পারে বটে, কিন্তু স্বয়ং বিজ্ঞান আবিলতাশূন্য অগ্নি-দ্রাবিত সুবর্ণের ন্যায় শ্যামিকা-পরিবর্জ্জিত, বিশুদ্ধ। অগ্নি শীতল, এই কথা বলিলেই তাহার সমালোচনার প্রয়োজন; কিন্তু অগ্নিতে দাহিকা শক্তি আছে, একথা কেহ বলিলে যাহা বুঝি, নিজের মনে মনেও তাহাই অনুভব করি,সুতরাং ইহার আবার আলোচনা কি? এস্থলে বিজ্ঞান বলিতে আমি—জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত বিজ্ঞানই বুঝিয়া লইতেছি।

যাহাতে উদ্ভাবনা শক্তির পরিচালনা হয়, যাহাতে মানবহৃদয়ের ভাব-সম্পদ্ প্রকাশিত, স্ফুরিত এবং অভিব্যক্ত হয়, যাহার সম্পাদনে কর্ত্তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে, যাহা পাঁচজনে করিলে পাঁচ রকম হয়, অথবা একজনেই পাঁচ রকম করিতে পারে, যাহার উৎকর্ষাপকর্ষ কর্ত্তার শিক্ষা, রুচি, উদ্দেশ্য, যোগ্যতা, আগ্রহ এবং অভিনিবেশের উপরে নির্ভর করে এবং যাহার ফলাফল পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত সমাজের বা মানবমণ্ডলীর স্বার্থকে স্পর্শ করে, মানবের সুখ-সৌভাগ্যের পথকে প্রশস্ত করে, মানবের সৌন্দর্য্য-পিপাসাকে বর্দ্ধিত ও পরিতৃপ্ত করে, এমন সকল কার্য্যই সমালোচনার বিষয়ীভূত।

এ কথাগুলি ঠিক হইলে মানবীয় কার্য্যাবলীর অতি অল্প বাদে প্রায় সমস্তই সমালোচনার আমলে আসিয়া পড়ে। এমন কি, কে কিরূপে আহার করে, কে কি ভাবে চলে, কে কি প্রকারে কথা কহে, ইত্যাদি বিষয়েরও সমালোচনা লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়; সুতরাং নাম করিয়া সমালোচ্য কার্য্যের অবধি নির্দ্দেশ করা অসম্ভব; কিন্তু এ সমস্ত প্রকৃত সমালোচন-পদের বাচ্য নহে। সাধারণতঃ কাব্যাদি, সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সুকুমার বিদ্যার যে সমালোচন, তাহাই সুধী-সমাজে সমালোচনা বলিয়া পরিচিত, পরিগৃহীত এবং সম্মানিত।

চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি বিদ্যার কিছুই জানি না, সুতরাং যাহা দেখি, যাহা শুনি, তাহাতেই বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া থাকি। যদি কেহ সঙ্গীতচ্ছলে চেঁচাইতে থাকে, আমি মনে মনে বলি, "বা! বেশ চেঁচাইতেছে, আমি ত এমন করিতে পারি না!" বটতলার অমরকীর্ত্তি চিত্রকর স্বর্গীয় (সম্ভবতঃ এখন তিনি স্বর্গবাসী) নৃত্যলাল শীল মহাশয় আমাকে অনেক আনন্দ দিয়াছেন, বটতলার রামায়ণ মহাভারত পাইলে এখনও পাতা উল্টাইয়া ছবিগুলি দেখি। মধ্যে মধ্যে ঐ

সকল ছবির হাতে মুখে লাল রঙের এক একটা পোঁচ দেখিয়া অর্থ বুঝিতে পারিতাম না, কিন্তু এমন বুঝিতে পারি ঐ গুলি রঙ্গীন ছবি। সীতার বনবাসে পড়িয়াছিলাম, সীতা পঞ্চবটীর চিত্র-দর্শনে বাস্তব দৃশ্য মনে করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন; এক একবার মনে করিতাম, সে কি এইরূপ চিত্র? একবার কোথায় দেখিলাম, একটি ছবি হাত মেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কিন্তু হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী নিম্নদিকে চিত্রিত আছে; তথাপি ছবি দেখিবার লালসা ছাড়িতে পারিলাম না।

কিন্তু বিদ্বান হইবার দুরাশায় এক সময়ে কিছু লেখাপড়া শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, আর নিরুপলক্ষ হইয়া থাকা মানুষের স্বভাব-বিরুদ্ধ বলিয়া এখনও তাহারই নাড়াচাড়া করি, সুতরাং মাতৃভাষায় সাহিত্যের সমালোচনা দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে মনে বড়ই আকাঙ্ক্ষা হয়। যাহার দোষ গুণ জানি না, তাহার দোষ গুণ জানিবার আকাঙ্ক্ষা দূষণীয় নহে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবার কোন উপায় নাই। যাঁহারা বঙ্গভাষার প্রাণস্বরূপ, যাঁহারা বাঙ্গালী জাতির গৌরব, যাঁহারা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশের শিক্ষাগুরু ও পথপ্রদর্শক, যাঁহারা এই সম্মিলনের অনুষ্ঠান দ্বারা বাঙ্গালীর বিক্ষিপ্ত মনীষাকে কেন্দ্রীভূত করিবার প্রশংসনীয় চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন, যাঁহাদের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দিন দিন বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করিতেছে, তাঁহারাই যখন সমালোচনে উদাসীন, তখন বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের এ অভাব কে দূর করিবে, এ আকাঙ্ক্ষা আর কে পূর্ণ করিবে?

শুনিয়াছি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে একটা অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম আছে, তাঁহারা কোন জীবিত গ্রন্থকারের গ্রন্থ সমালোচনা করিবেন না। এ শুনা কথা, সত্য মিথ্যা জানি না; তবে এ কথা বোধ হয় সত্য যে, উক্ত পরিষদের পত্রিকায় কোন জীবিত গ্রন্থকারের সমালোচনা হয় না। যদি এরূপ কোন নিয়ম থাকে, তাহা নিন্দা করা যায় না, তাহার উদ্দেশ্যে কোন দোষ আরোপ করা যায় না। বাঙ্গালা-সাহিত্যের মহারথিগণ সমবেত হইয়া যে নিয়ম অবধারিত করিয়াছেন, তাহাতে ভুলভ্রান্তির কল্পনা করিতে পারে, এমন ধৃষ্ট বাঙ্গালীর অস্তিত্ব বোধ নিতান্তই বিরল; কিন্তু মানুষের একটা স্বভাব এই, যে স্থলে কোন কার্য্যের হেতুবাদ দেখা যায় না, সে সেখানে একটা হেতু কল্পনা করিয়া লয়, একটা উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিয়া বসে।

সর্ব্বত্র যেমন হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও সেরূপ হইয়াছে; যাহারা এই নিয়ম সম্বন্ধে চিন্তা করে, তাহারা স্পষ্ট কোন হেতুবাদ না পাইলে একটা হেতু কল্পনা করিয়া লইতেছে। সে কাল্পনিক হেতু এই—যাঁহারা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভ্য, তাঁহারা প্রায় সকলেই সাহিত্য-জগতের সুপরিচিত গ্রন্থকারশ্রেণী-ভুক্ত। সমালোচনার ভার পরিষৎ গ্রহণ করিলে, তাঁহাদিগের মধ্যেই পরস্পরের গ্রন্থ পরস্পরকে সমালোচনা করিতে হইবে। এরূপ করিলে একপ্রকার নিজের গ্রন্থ নিজেরই সমালোচনা করা হয়। এরূপ কাযে লাভ কি? বরং এখন লেখা হইয়া থাকুক, ভবিষ্যৎ বংশ সমালোচনা করিবে। আর একটা কথা এই, সমালোচনা করিতে বসিলেই দোষ প্রদর্শন করিতে হইবে, তখন লেখকের পক্ষ হইতে দোষকে গুণ বলিয়া সমর্থন আরম্ভ হইবে, তাহার ফলে বাদপ্রতিবাদ হইতে মনোমালিন্য, মনোমালিন্য হইতে বিরোধ, বিরোধ হইতে পরিষদের বিনাশ! সমালোচনা হইতে যখন যখন একটা অনিষ্টের আশঙ্কা রহিয়াছে, তখন ইহাকে দূরে রাখাই ভাল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই হেতু প্রদর্শন কাল্পনিক মাত্র, কারণ যাঁহারা নিয়ম করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই, বলিয়া থাকিলেও আমি তাহা শুনি নাই; কিন্তু ইহাই যদি সমালোচনা-পরিত্যাগের কারণ হয়, তাহা হইলে সেজন্য পরিষদকে দোষ দেওয়া যায় না। কয়েক বৎসর মাত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে, ইহার মধ্যেই ইহা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পর যদি সমালোচনা আরম্ভ হয়, তাহা হইলে যত সভ্য তত ভাগ হওয়া বিচিত্র নহে; কিন্তু বাঙ্গালী হইয়া কেহ এমন মারাত্মক কামনা করিতে পারে না। সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালীমাত্রেরই অতি আদরের জিনিস। ইহা বাঙ্গালীসাহিত্য-সেবকদিগের শক্তির একটা কেন্দ্র, দাঁড়াইবার একটা সাধারণ অধিষ্ঠানভূমি, ভ্রাতৃত্বের একটা বন্ধন-রজ্জু। চতুর্দ্দিক যখন ঝড়-বৃষ্টিপাতে ছিন্নভিন্ন, তখন ইহাই মাথা রাখিবার স্থান। সাহিত্যের জন্যই সমালোচন, সমালোচনের জন্য সাহিত্য নহে; যদি সমালোচন সাহিত্যের উপকার না করিয়া অপকার করিতে চায়—মূলচ্ছেদ করিতে উদ্যত হয়, তবে এমন সমালোচন অবশ্যই চাই না। কোন কোন শাখাকে ছেদন করিয়াও যদি বৃক্ষকে বাঁচাইতে পারা যায়, বুদ্ধিমানের তাহাও কর্ত্তব্য।

কিন্তু এ বিপদের কি উদ্ধার নাই? এ সমস্যার কি একটা মীমাংসা হইতে পারে না? যেখানে এত প্রতিভার সম্মিলন, সেখানে কি "মরে সাপ না ভাঙ্গে নড়ি" রকমের একটা ব্যবস্থা হইতে পারে না—পরিষৎ না ভাঙ্গিয়া যায়, অথচ

সমালোচন চলিতে থাকে, এমন কি কোন উপায় হইতে পারে না? আমার ত বোধ হয় পরিষৎ মনোযোগী হইলে ইহার একটা ব্যবস্থা করিতে পারেন। কোন কোন পরীক্ষায় নাকি নিয়ম আছে, কাগজে পরীক্ষার্থীর নামধাম কিছুরই উল্লেখ থাকে না, কেবল একটা সংখ্যামাত্র থাকে, পরীক্ষক জানেন না, তিনি কাহার কাগজ পরীক্ষা করিতেছেন। পরে যখন ফল বাহির হয়; তখন তাহার নামের সহিত মিলাইয়া দেখা হয়। সমালোচন ছাড়িয়া দেওয়া অপেক্ষা এই প্রথা অবলম্বনে কি দোষ হয়? সমালোচনের জন্য একটি সমিতি গঠিত হইল, পুস্তকের আগাপাছা ছাঁটিয়া কেবল মূল গ্রন্থখানি সকালোচকদিগের হাতে দেওয়া গেল এবং তাঁহারা সমালোচন করিয়া প্রবন্ধটী পরিষদের হাতে দিলেন; ইহাতে গ্রন্থকার জানিলেন না সমালোচক কে, সমালোচকও জানিলেন না গ্রন্থকার কে, অথচ সাধারণে গ্রন্থের দোষগুণ অনায়াসে জানিতে পারিল, জানিয়া উপকৃত হইল।

কেহ বলিতে পারেন, পূর্ব্বকালে সমালোচনা ছিল না, তাই বলিয়া কি প্রাচীন সাহিত্যের আদর কিছু কমিয়াছে? বর্ত্তমান প্রণালীর সমালোচন পূর্ব্বকালে ছিল না বটে,তবে সমালোচন যে ছিলই না, একথা বলা যায় না। কথিত আছে, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ন্যায়-শাস্ত্র সম্বন্ধে এক গ্রন্থ লিখিয়া আর একজন পণ্ডিতকে তাহা শুনাইয়াছিলেন; গ্রন্থ শুনিয়া পণ্ডিত তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। গৌরাঙ্গ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, তিনিও ঠিক ঐবিষয়ে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন; কিন্তু গৌরাঙ্গের গ্রন্থ যখন এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তখন সেই গ্রন্থই সকলে পড়িবে, তাঁহার গ্রন্থ কেহ পড়িবে। গৌরাঙ্গ এই কথা শুনিয়া হাসিলেন এবং সেই পণ্ডিতকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্য তাঁহার নিজের গ্রন্থখানি তৎক্ষণাৎ গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, সেকালে যে কেবল সমালোচনা ছিল, এমন নহে, সেই সঙ্গে অসাধারণ উদারতা এবং অসীম স্বার্থত্যাগ আছে কিনা, গ্রন্থকারগণ এবং সমালোচকবর্গই বলিতে পারেন। একজন ইংরাজ লেখক কবিদিগকে লড়াইয়ে মোরগের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন; আমার কিন্তু বোধ হয়, পশ্চিমের বাতাস এদেশেও কিছু লাগিয়াছে।

প্রাচীন কাল বোধ হয় কেবল সমালোচন উপলক্ষ করিয়া প্রবন্ধ লিখিবার প্রথা বড় একটা ছিল না, টীকাটিপ্পনীতে প্রসঙ্গ উপলক্ষেই সচরাচর নানা গ্রন্থকারের মতামত সমালোচিত হইত। তখন সমালোচনার বড় বেশী প্রয়োজনও

হইত না; কেন না, গ্রন্থকারগণ জীবনব্যাপী অধ্যয়ন দ্বারা যে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেন, সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় যে সত্য আপন হৃদয়ে উপলব্ধি করিতেন, তাহা নিজেই ধীরভাবে সমালোচনা করিয়া, উপযুক্ত ভাষা, ভাব এবং অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করিতেন, কাজেই তাঁহাদের গ্রন্থে অন্যের সমালোচনের জন্য তেমন অবকাশ থাকিত না; কিন্তু আজকালকার এই ব্যস্ততার দিনে, এই অভিনবতার যুগে সে ভাবের কি আশা করা যায়, না তাহা সম্ভব হয়? কার্লাইল একস্থলে বলিয়াছেন, একখান ভাল গ্রন্থ লিখিতে বসিলে তাহাতে গ্রন্থকারের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়, গ্রন্থ সমাপনান্তে কিছু দীর্ঘকাল বিশ্রাম না করিলে গ্রন্থকার পুনরায় লেখনী-গ্রহণে সমর্থ হন না। আমাদের দেশে গ্রন্থকারদিগের মধ্যে কাহারও এ অবস্থা ঘটে কিনা জানি না; কিন্তু অনেকের যে সেরূপ দুরবস্থা ঘটে না, ইহা তাঁহাদিগের লেখনীর অবিরাম গতি দেখিয়া বুঝিতে পারি। তাঁহাদের গ্রন্থ-বাহুল্য দেখিয়া অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে চতুর্ভুজ বলিব কি দশভুজ বলিব,ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। তাঁহাদের সকল গ্রন্থই যদি সমান সারবান হয়, তাঁহাদের মস্তিষ্কের সবলতা তাহা হইলে অসাধারণ বলিতে হইবে। ভগবান্ করুন, তাঁহারা দীর্ঘ-জীবী হইয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধিযুক্ত,বঙ্গসমাজকে উপকৃত এবং বাঙ্গালী-জাতিকে গৌরবান্বিত করিতে থাকুন।

কিন্তু প্রতিভার সম্ভব ত সর্ব্বত্র হয় না, বাঙ্গালীর মধ্যে প্রতিভাশালী লেখক আছেন বলিয়া আমার মত বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ গ্রন্থকার এ দেশে জন্মিতে পারেন না, এ কথা ত কল্পনাই করা যায় না। প্রতিভার বাক্য অর্থ অনুসরণ করে না, অর্থই প্রতিভার বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে চলে, প্রতিভার উক্তির সমর্থন করিবার জন্যই সাহিত্যের আইনকানুন বা অলঙ্কার শাস্ত্রের সৃষ্টি, একথা অবশ্য সত্য হইতে পারে; কিন্তু যাহাদের প্রতিভা নাই, পরিশ্রম আছে, সাহিত্যের সেবায় কি তাহারা অধিকার পাইবে না? অথবা অধিকারের অপেক্ষাই বা কে করে? তাহারা আপনাদের পথ আপনারাই প্রস্তুত করিতে জানে। পুস্তকের বিক্রয় ধরিয়া যদি সাহিত্য-বিস্তারের পরিমাণ অবধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে আজিও বটতলার দাবী অগ্রগণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

অবশ্য বিজ্ঞানকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে, প্রতিভাও এমন সর্ব্বশক্তি-শালিনী নহে। বিজ্ঞানের একটী নিয়ম এই,কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বস্তুর বিস্তার যত বাড়ে, গভীরতা তত কমে। প্রতিভাশালী লেখকদিগের গ্রন্থ-সম্বন্ধে একথা

খাটে কিনা, তাহা তাঁহারা নিজেই বিচার করিয়া দেখিবেন, অন্যের কথায় অপেক্ষা করিবেন না; কিন্তু আমি যে সমালোচনার প্রয়োজন মনে করিতেছি, তাহা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অপ্রতিভ অর্থাৎ প্রতিভাবিহীন লেখক এবং সাধারণ পাঠকের জন্য। সমালোচনায় যে উপকার হয়, অনেক লেখকই তাহা প্রত্যক্ষ করেন। ইহা অতি স্বাভাবিক; নিজের দোষ সকল সময়ে নিজের চক্ষে পড়ে না, অন্যে দেখাইয়া দিলে তাহা সংশোধন করিবার অবসর ঘটে। প্রতিভা যত বড়ই হউক না কেন, তাহার কার্য্যে দোষ থাকিতে পারে না, ইহা বলিলে মানুষকে পূর্ণপ্রজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন, সৃষ্ট জীব পূর্ণপ্রজ্ঞ হইতে পারে না। যাহা হউক, প্রতিভাশালী লেখক সমালোচনের বাঁধাবাঁধি স্বীকার না করিলেও প্রতিভা যখন দুর্লভ,—সুতরাং শ্রমশালী লেখকের স্থান এবং উপকারিতা যখন সমাজে আছে, তখন অন্ততঃ তাঁহাদের উপকারের জন্যও সমালোচনার একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত। অনেকে পুস্তক লেখেন, পুস্তক লেখার জন্য হৃদয়ের একটা অদম্য উত্তেজনাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য। নূতন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া গ্রন্থকারকে উপদেশ দেওয়া এবং গ্রন্থ-প্রকাশের উদ্যম হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে যাওয়া যে কি কঠিন ব্যাপার, তাহা যাঁহারা কখনও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন। যদি সমালোচনার বহুল প্রচার থাকিত, তাহা হইলে অনেক লেখকই যথাকালে এবং যথাপরিমাণে সাবধান হইতে পারিতেন, নিজের যোগ্যতা বুঝিবার একটা সুযোগ পাইতেন। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দুই একজনকে চাবুক মারিয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু সেই চাবুক বঙ্গ-সাহিত্যের কত উপকার করিয়াছে, তাহা দেখিয়া কতজনের পৃষ্ঠ সাবধান হইয়াছে, তাহার পরিমাণ কে করিতে পারে? সময়ের একটা কথায় যত উপকার হয়, অসময়ের চাবুকেও তত উপকার করিতে পারে না। কলিকাতার নিকটস্থ কোন গ্রামে একজন ভদ্রলোক আছেন, তাঁহার এক সময়ে সখ হইল, মদের কুল্পি খাইবেন। তখন তাঁহার ধনের অভাব ছিল না, সুতরাং ইচ্ছামাত্র কলিকাতা হইতে বাড়ী বরফের পর্য্যন্ত ডাক বসিয়া গেল, প্রত্যহ পুঞ্জ পুঞ্জ বরফ আসিতে লাগিল, কুল্পি জমাইবার জন্য অবিরাম উৎকৃষ্ট যত্ন চলিল; কিন্তু ক্রমান্বয়ে আট দিন যত্ন করিয়াও দেখা গেল, পোড়া মদ আর জমিল না। তখন একটি বন্ধুর নিকট তিনি আক্ষেপ করিলে, বন্ধুটি এক কথায় বলিয়া দিলেন, "মদ জমে না।" আট দিন আগে এই কথাটা শুনিলে তাঁহার কত উপকার হইত! সমালোচনা বর্ত্তমান

থাকিলে, অনেক কথা তাঁহার মুখে শুনিয়া সময়ে সাবধান হওয়া যাইতে পারে।

গ্রন্থের সমালোচনা ভাবী বংশের জন্য রাখিয়া না দিয়া গ্রন্থকারের জীবিত-কালে হওয়াই ভাল—ইহাতে তাঁহার নিজের লাভ। অতি অল্প সংখ্যক স্বভাব সংগীত ছাড়া প্রায় সমস্ত সাহিত্যেরই উদ্দেশ্য সমাজের শিক্ষা, সমাজের অভাবমোচন। সমাজের প্রয়োজন কি, তাহার সাধনে কোন্ উপায়টি প্রশস্ত এবং সেই উপায় প্রদর্শনে আমার যোগ্যতা কতকটা, এই তিন বিষয়ে জ্ঞান থাকা গ্রন্থকার মাত্রেরই অপরিহার্য্য। সমালোচনার পথ উন্মুক্ত থাকিলে এই ত্রিবিধ জ্ঞানলাভ যত সহজ হয়, নিজের সর্ব্বজ্ঞতার উপর নির্ভর করিলে ততটা সহজ হয় না। অনেক কার্য্য এমন আছে, যাহার আরম্ভেই একটা পরিষ্কার ধারণা না থাকিলে জিনিসটাত ভাল হয়ই না, সমালোচনা দ্বারা পরে তাহার সংশোধনেরও সম্ভাবনা থাকে না। "এখন ত একটা গড়িয়া তুলি, পরে দোষ গুণ দেখিয়া সংশোধন করিয়া লইব।"—এইরূপ ধারণা লইয়া কায করিলে 'ড্রেড্‌নটে'র মত যুদ্ধজাহাজ বা তাজমহলের মত স্মৃতিমন্দির কখনও নির্ম্মিত হইতে পারিত কি না সন্দেহ; বরং তাহাও সম্ভব—ড্রেড্‌নট বা তাজ-মহল ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করা কষ্টসাধ্য হইলেও মানুষের পক্ষে অসাধ্য না হইতে পারে; কিন্তু একটা জাতীয় ভাষা একবার গঠিত হইয়া গেলে, আবার তাহাকে ভাঙ্গিয়া পুনর্গঠন করা কঠিন ত বটেই, সম্ভব কিনা তাহাই বিবেচ্য।

বঙ্গভাষা এখনও গঠনের অবস্থাতেই আছে; এ গঠন-ক্রিয়া কবে সম্পূর্ণ হইবে, কবে এই বিচিত্র প্রাসাদের উপরে চূড়া বসিবে, তাহা ত্রিকালজ্ঞ না হইলে কেহ বলিতে পারিবেন না; কিন্তু এখন যদি ইহাতে দোষ-বাহুল্য থাকিয়া যায়, এখনই যদি ইহার অঙ্গে অঙ্গে অপূর্ণতা প্রবেশ করে, তবে ভাষা একবার জমাট বাঁধিয়া গেলে, আর তাহা দূর করিবার সুবিধা পাওয়া যাইবে না। ঝাঁটা-প্রয়োগে পার্থিব আবর্জ্জনা দূর হয় বটে, কিন্তু সাহিত্য-দেহে যে আবর্জ্জনা একবার অঙ্গীভূত হইয়া যায়, তাহা দূর করিবার ঝাঁটা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। অস্ত্র-প্রয়োগে যে রোগীর জীবন নিরাপদ রহিবে, দৃঢ়তার সহিত এমন কথা বলিবার ডাক্তারও দেখি না। তবে ভরসা আছে, বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিভা জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, কেন না "কালোহ্যয়ং নিরবধির্ব্বিপুলা চ পৃথ্বী।" কিন্তু ভবিষ্যতে যে সকল প্রতিভাশালী

মহাপুরুষ জাতীয় সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ লইয়া আবির্ভূত হইবেন, তাঁহারা যে বর্ত্তমান যুগের প্রতি ঐকান্তিক অন্ধভক্তির বশীভূত হইবেন, এখনকার সাহিত্যের ভাষা, ভাব এবং রীতিতে দোষ থাকিলে তাহা দেখিয়াও দেখিবেন না, প্রয়োজন বোধ করিলে নির্দ্দয় ভাবে ছুরী হাতে লইয়া তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিবেন না, তাহার প্রমাণ কি? বড় জোর না হয়, ভক্তির আবেগে তাহার অঙ্গ স্পর্শ না করিলেন, বড় জোর না হয়, প্রাচীন বলিয়া শ্রীপঞ্চমীর দিন পুষ্পচন্দনে গ্রন্থগুলির পূজা করিলেন; কিন্তু ইহাতেই কি বর্ত্তমান লেখকদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? ইহার জন্যই কি এত আয়োজন, এত উদ্যোগ, এত কাণ্ড? যদি ভবিষ্যতেও এদেশে প্রতিভার অভ্যুদয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস থাকে, যদি বর্ত্তমান সাহিত্য দ্বারা বাঙ্গালীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষা, সভ্যতা, চরিত্র এবং মনস্বিতাকে চিরদিনের জন্য পরিস্ফুরিত এবং পরিচালিত করিবার আশা থাকে, যদি ভারতের ভাষাসমিতির মধ্যে আদর্শ গাম্ভীর্য্য, শক্তি, সৌন্দর্য্য, বৈচিত্র্য, মাধুর্য্য, ভাব-প্রবণতা এবং স্বাভাবিকতার নিমিত্ত মাতৃভাষার জন্য উচ্চ সিংহাসন রচনা করিয়া রাখিয়া যাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বৈচিত্র্যের মধ্যে শৃঙ্গলা আনিতে হইবে, স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একতাস্থাপন করিতে হইবে, স্বেচ্ছাচারকে সংযত করিয়া বিজ্ঞানের আদেশের নিকট মস্তক নত করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলেই, সমালোচনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে বহুলোকের কর্ত্তৃত্ব এবং অধিকার রহিয়াছে, যাহার সম্পাদনে এবং উন্নতি-বিধানে বহুলোকের সাহচর্য্য একান্ত অনিবার্য্য, একতা এবং শৃঙ্খলার অভাবে তাহা কখন কোথাও সুসম্পাদিত হয় নাই, হইবেও না। এই একতা এবং শৃঙ্খলা কেবল বিজ্ঞানই দিতে পারে, আর সমালোচনাই সাহিত্যের সেই বিজ্ঞান।

প্রতিভা কেবল লেখকেরই থাকে, পাঠকের থাকিতে পারে না, এমন নহে। পাঠকের মধ্যেও প্রতিভাশালী লোক অনেক থাকেন এবং লেখনী হাতে হইলে তাঁহারাও সাহিত্য-সমাজে উচ্চাসন অধিকার করিতে পারেন; তবে কেহবা আলস্যে, কেহ অমূলক ভয়ে, কেহবা অবসর ও রুচির অভাবে, আর কেহ হয়ত কালীর আঁচড়ে লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হইবেন মনে করিয়া লেখনী গ্রহণ করেন না। যাহা হউক, পাঠকের প্রতিভা না থাকিলেও চলে, কেহ ইচ্ছা করিলে সাধারণ বুদ্ধি লইয়া পরিশ্রম করিলে গ্রন্থকারও হইতে পারে; কিন্তু বিনা প্রতিভায় পরের বুদ্ধি ধার করিয়া সমালোচক

হওয়া যায় না। সাধারণ বুদ্ধিতে গালাগালি, ঝাড়ঝাড়া, বিদ্বেষ-প্রকাশ এবং বিদ্রুপতামাসা চলিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত সমালোচনা চলিতে পারে না। সমালোচক সাহিত্য-রাজ্যের শাসক, বিচারক এবং বিধি-প্রবর্ত্তক। যাহাকে প্রতিভার উপরেও প্রভুত্ব করিতে হইবে, প্রাকৃতিক বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সে নিজে প্রতিভাসম্পন্ন না হইলে, সেরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি, সেরূপ নিরপেক্ষতা, সেরূপ সহানুভূতি, সেরূপ ন্যায়পরতা এবং যুগপৎ লেখক ও পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ করিবার সেরূপ ক্ষমতা কোথায় পাইবে? আর তাহা যদি না থাকে, হইলে অযোগ্য বিচারকের বিচার-বিভ্রাট দেখিয়া তাহার প্রতি সাধারণের মনে যেমন ঘৃণা ও অনাস্থা জন্মে, এইরূপ সমালোচকের প্রতিও পাঠক-সমাজের সেইভাবই জন্মিয়া থাকে।

এইজন্যই সুধী-সমাজে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবকদিগের এই সম্মিলন-সভায় সমালোচনের কথাটা তুলিবার প্রয়োজন মনে করিয়াছি। সমালোচনের প্রয়োজন ইঁহারা উপলব্ধি না করিলে আর কে করিবে? আবার, সমালোচনে যেরূপ প্রতিভার প্রয়োজন, তাহার প্রত্যাশা কেবল ইঁহাদের নিকটেই করি; ইঁহারা যদি এই অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যের ভার গ্রহণ না করেন, তবে এমন যোগ্যপাত্র আর কোথায় পাইব, আর কে উপযুক্ত শক্তি লইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-তরণীর কর্ণধার হইয়া দাঁড়াইবে?

সত্য মিথ্যা জানি না, সমালোচন আরম্ভ হইলে সাহিত্যিক সভা-সমিতিগুলি আত্মবিরোধে ভাঙ্গিয়া যাইবে বলিয়া বাস্তবিকই যদি কোন আশঙ্কা থাকে, তাহা নিবারণ করিতে যতটুকু প্রতিভার প্রয়োজন, প্রয়োগ দ্বারা তাহার সার্থকতা সম্পাদন করুন। যে অবস্থা যত প্রতিকূল, প্রকৃষ্ট উপায় দ্বারা তাহাকে বশে আনিয়া ততদূর অনুকূল করাই প্রকৃত প্রতিভার কার্য্য। প্রকৃত প্রতিভাশালী লেখক নিজের দোষ দেখিলে আনন্দিত না হইয়া ক্ষুব্ধ হইবেন, অথবা বুঝিতে না পারিয়া কেহ ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিলে, তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইবেন, এ কথা মনে করাও যেন প্রতিভার অবমাননা বলিয়া মনে করি। গ্রন্থ যতদিন লিখি, ততদিনই আমার; কিন্তু যেদিন উহা প্রচার করিলাম, যেদিন উহা একটা স্বতন্ত্র নামরূপে চিহ্নিত হইয়া পাঠকের নিকট উপস্থিত হইল, সেদিন হইতে উহা জাতীয় ভাণ্ডারের সম্পত্তি, জাতীয় জন-সাধারণের উহাতে সম্পূর্ণ এবং অবিসম্বাদিত অধিকার। যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া আমার গ্রন্থের সমালোচনা করেন এবং যে সকল দোষ আমার চক্ষে পড়ে নাই, তাহা

দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার উপর বিরক্ত না হইয়া, বরং তিনি যে, আমি জীবিত থাকিতেই, দোষ সংশোধনের এই সুযোগটা উপস্থিত করিলেন, এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি যে উপকার বুঝিতে পারে, প্রতিভা তাহা দেখিতে পায় না, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, অনেক সময়েই ইহা ঘটিতে দেখা যায়, অনেক স্থলেই প্রতিভার অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়। ছাত্রাবস্থায় একবার একজন ইংরাজ-কবির কয়েকটী কবিতা পাঠ্য ছিল। কবিতাগুলি ভালরূপে বুঝিবার জন্য তাঁহার জীবন-চরিতখানি একবার পড়িতে হইল; কিন্তু জীবন-চরিত পড়িতে যাইয়া দেখি, কবি নিয়ত আত্মসমর্থনেই ব্যস্ত; কোথায় কে তাঁহার কবিতার নিন্দা করিল, সর্ব্বদা যত্নসহকারে তাহাই সংগ্রহ করিতেছেন এবং অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাহারই প্রতিবাদে লেখনীচালনা করিতেছেন। তাঁহার সে সকল বাদ প্রতিবাদ কিছুই মনে নাই; কিন্তু তাঁহার কবিতা এখনও পড়িতে ভাল লাগে। পত্র লিখিয়া তাহা পড়িয়া বুঝাইবার জন্য সেই পত্রের সঙ্গে যাওয়া যেমন, তাঁহার এই ব্যবহারও সেইরূপ মনে করিয়া হাসি পাইত। অবশ্য কোন নূতন গ্রন্থ বাহির হইলে, পাঠক-সমাজে তাহা লইয়া বাদ প্রতিবাদ গ্রন্থকারের পক্ষে অতীব সুখ এবং সৌভাগ্যেরই বিষয়; কিন্তু স্বয়ং গ্রন্থকারের পক্ষে সেই বাদ প্রতিবাদে যোগ দেওয়া অথবা ইন্দ্রজিতের ন্যায় নিজে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া প্রতি-শোধের জন্য বাণ নিক্ষেপ করা, এ উভয়ই তেমন গৌরবাস্পদ বলিয়া বোধ হয় না।

বলিয়াছি, নিন্দা, প্রশংসা এবং আদর্শনির্দ্দেশ, এ তিনই প্রকৃত সমালোচ-নের কার্য্য; কিন্তু অনকেরই ধারণা, সমালোচনের অর্থই কেবল নিন্দা, কেবল ভর্ৎসনা, কেবল বিদ্রূপ, এই ধারণা আছে বলিয়াই গ্রন্থকারেরা সমালোচনার নামে শিহরিয়া উঠেন এবং কেবল বিজ্ঞাপনদাতার সমালোচনেই পরিতৃপ্ত থাকা নিরাপদ মনে করেন। এরূপ ভয়ের যথেষ্ট কারণও আছে। গ্রন্থে দোষ থাকিলে তাহা এরূপ ভাষায় এবং এরূপ ভাবে দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, যাহাতে লেখকের হৃদয় কিছুমাত্র ব্যথা না পায়; কিন্তু অনেকস্থলে সমালোচনা পড়িলে বোধ হয় দোষপ্রদর্শন একটা উপলক্ষ মাত্র, গ্রন্থকারের হৃদয়ে যন্ত্রণা উৎপাদন করাই যেন প্রধান উদ্দেশ্য। সুস্থদেহে একটা বিস্ফোটক জন্মিলে, সুনিপুণ অস্ত্র চিকিৎকের কর্ত্তব্য, এমন ভাবে অস্ত্রটি প্রয়োগ করেন, যাহাতে রোগী কিছুমাত্র যন্ত্রণা অনুভব না করে, এইরূপে যন্ত্রণার পরিহারের

জন্য কত রকম বোধ-হারক ঔষধেরও আবিষ্কার হইয়াছে; কিন্তু একটী বিস্ফোটকের চিকিৎসা করিতে যাইয়া যদি রোগীর সর্ব্বাঙ্গ কাটিয়া ক্ষতবিক্ষত করেন, তাহা হইলে রোগী কি চিকিৎসককে আশীর্ব্বাদ করিবে, না এরূপ চিকিৎসা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ মনে করিবে? বাক্যাঘাতের যন্ত্রণা যে অস্ত্রাঘাতের যন্ত্রণা হইতে কিছু ন্যূন, এমন কথা মনে করি না। যিনি সমালোচকের উচ্চাসন গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে বিশেষ সাবধানতার সহিত রোগীকে বাঁচাইয়া রোগ সারাইতে হইবে, আপনার প্রত্যেক বাক্যের সমালোচনা আপনাকেই করিতে হইবে। আবার এমনও দেখা গিয়াছে, যথেষ্ট শিষ্ট ভাষায় সমালোচনা করিলেও গ্রন্থকার বিরক্ত হন। এরূপ গ্রন্থকার হয়ত মনে করেন, তিনি ভুল-ভ্রান্তি এবং সমালোচনার অতীত; কিন্তু যে প্রশংসা বই নিন্দার নাম শুনিতে পারে না, তাহার উন্নতি সমাপ্তি-বিন্দুতে দাঁড়াইয়াছে। সে বালকই হউক আর বৃদ্ধই হউক, তাহার আর চৈতন্যের পথে অগ্রসর হইবার আশা নাই। তাহার অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহাকে নিরাবিল প্রশংসা শুনাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, আর যদি ততদূর নীচে নামিবার শক্তি না থাকে, নীরব হইয়া থাকা ভিন্ন উপায় নাই।

ভাষার ওজন এবং ভাবের মাত্রা ঠিক রাখিয়া সমালোচনা করা বড় কঠিন ব্যাপার। অত্যন্ত সাবধান হইতে না পারিলে নিন্দার সময় সেই ওজন এবং মাত্রা লক্ষ্যের নিম্নে নামিয়া যায় এবং প্রশংসার সময়ে তাহার ঊর্দ্ধে উঠিয়া পড়ে। বহু বৎসর হইল কোন সাপ্তাহিক কাগজে একখানি কাব্যের সমালোচনা পাঠ করিয়াছিলাম, সে কথা এখনও মনে আছে। সমালোচক কবিকে একেসারে সপ্তম স্বর্গে তুলিয়াছেন এবং তাঁহার উক্তির সমর্থনের জন্য কাব্যের অনেকগুলি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। সমালোচন পড়িয়া হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়, যাহা উপলক্ষ করিয়া সমালোচন লিখিত, অতি আগ্রহের সহিত সেই উদ্ধৃতাংশ পড়িতে যাই; কিন্তু পড়িয়া বুঝিতে পারি না, সমালোচক মহাশয় কেন এত বাক্যব্যয় করিলেন। একবার মনে করিলাম, বুঝি ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আছে; কিন্তু দুই তিন বার প্রবন্ধটি পড়িয়া তাহারও কোন আভাস পাইলাম না; তখন এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম যে, ইহার মূল হয় সমালোচকের লিপি-চাতুর্য্য প্রকাশের অভিলাষ, আর না হয় কবি যতটা বড় নহেন, তাঁহাকে ততটা বড় দেখাইবার প্রয়াস বর্ত্তমান। নিন্দাতেই হউক, আর প্রশংসাতেই হউক, মাত্রা অতিক্রম করা কিছুতেই সঙ্গত নহে,

অতিরঞ্জন কোন পক্ষেরই উপকার করে না। সুধীগণ অগ্রসর না হইলে প্রতিভা-স্পর্শে ইহাকে পরিশোধিত না করিলে, সমালোচন কখনও সাহিত্যের উপকার করিতে সমর্থ হইবে না।

কেহ কেহ মনে করেন, কেবল দোষ ঘোষণা করিলেই সমালোচনের কার্য্য শেষ হইল, গুণকীর্ত্তনে লাভ কি? কিন্তু বাস্তবিক গুণেরও সমালোচনের প্রয়োজন আছে। কাব্যের সৌন্দর্য্যে সকলের হৃদয়ই আকৃষ্ট হয় বটে এবং কাব্যের প্রভাবে মানব-হৃদয় উন্নত হয় বটে, কিন্তু যে যে পরিমাণে বুঝে, সে সেই পরিমাণেই আকৃষ্ট এবং উন্নত হয়। কেবল কাব্য কেন,সাহিত্যের অনেক অঙ্গই সকলে সমানভাবে এবং একরূপে বুঝেন না। বুদ্ধি অনুসারে বুঝিবার তারতম্য ত আছেই, তা' ছাড়া শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, প্রবৃত্তি, সংসর্গ, আলোচনা এবং অভিনিবেশের তারতম্যানুসারে একই কথা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বুঝে। কোন কোন তীর্থযাত্রী স্বাধীনভাবে স্বৈরগতিতে নানা তীর্থে নানা দেশে ভ্রমণ করে,সাথীর অপেক্ষা রাখে না; কিন্তু অধিকাংশ যাত্রীই সাথীর উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, সাথী যেখানে লইয়া যায়, সেখানেই তাহারা যায়, সাথী যাহা দেখায়, তাহাই তাহারা দেখে, সাথী যাহা জানায় তাহাই তাহারা জানে—সাথী ছাড়া একপদও তাহারা অগ্রসর হইতে সাহস পায় না। পাঠকদিগের মধ্যেও এইরূপ দুইটী শ্রেণী আছে; এক শ্রেণীর পাঠক আপনাআপনি সাহিত্য-কাননের সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন, আর এক শ্রেণীর পাঠক সাথী না থাকিলে যেমন অধিকাংশ যাত্রীরই তীর্থদর্শন ঘটে না, কেহ বুঝাইবার না থাকিলে সেইরূপ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকের পক্ষেও সাহিত্য-সৌন্দর্য্য বুঝিবার চেষ্টা ঘটিয়া উঠে না; সুতরাং তাঁহারা সাহিত্য-পাঠের ষোল আনা ফল লাভ করিতে পারেন না। যাঁহারা ছাত্র-চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত আছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, এক শ্রেণীর ছাত্র আছে যাহারা পাঠ্য-বিষয় আগে নিজেই বুঝিবার চেষ্টা করে, কেবল যেখানে বুদ্ধি একেবারেই প্রবেশ করে না,সেইখানেই টীকাটিপ্পনী মিলাইয়া দেখে; আর এক শ্রেণীর ছাত্র আছে, যাহারা প্রত্যেকটি বাক্য পড়িয়াই টীকার পুস্তক খুলে, নিজে নিজে বুঝিবার জন্য একবার চেষ্টা করিয়াও দেখে না। এইটি হইল অভ্যাসের কথা; আর বুদ্ধি এবং শিক্ষার অল্পতা যাহাদের আছে, তাহাদিগকে ত' কাযেকাযেই অন্যের উপরে নির্ভর করিতে হইবে; সুতরাং অর্থ, ভাব এবং সৌন্দর্য্য বুঝাইবার জন্য সমালোচনের বিশেষ প্রয়ো-

জন বঙ্গভাষায় কত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিত হয়; কিন্তু সমাজে তাহার আশানুরূপ ফল দৃষ্ট হয় না। বুঝাইবার লোকের অভাব—প্রকৃত সমালোচনের অভাবই কি তাহার একটা কারণ নহে?

দোষ-উদ্ঘাটন হইতে সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ আরও কঠিন; আবার আদর্শ-নির্দ্দেশ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। যে সমালোচনা এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে যতদূর সমর্থ, তাহা সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট।

আদর্শ-প্রদর্শন কেবল উপদেশে হয় না। সত্যবাদী হও, এ একটা নীরস নির্জ্জীব মাধুর্য্যবিহীন উপদেশ কাহারও প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না, কাহারও হৃদয়ে স্থায়িত্ব লাভ করিয়া জীবনকে তাহার প্রভাবে গঠিত এবং পরিচালিত করিতে পারে না; কিন্তু ঐ উপদেশই যখন নল, হরিশ্চন্দ্র, দশরথ প্রভৃতির চরিত্রে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, যখন সত্যকে উজ্জ্বল করিবার জন্য তাহার পশ্চাতে একটী রক্ত-মাংস-সৌন্দর্য্যময় জীবন্ত উদাহরণ আসিয়া দাঁড়ায়, তখন হৃদয় বাস্তবিকই মোহিত হয়, তখন বাস্তবিকই অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও সত্যের জন্য জীবন দিতে পারিলে জন্মসার্থক বোধ হয়।

আদর্শ দেখাইবার, সুতরাং শিখাইবার দুইটী উপায় আছে;—প্রথমতঃ কাব্যাদিতে চিত্রিত চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ দ্বারা মনস্তত্ত্বের সূত্রগুলির মানবীয় কার্য্যের উৎসগুলি, মানবীয় ভাব-কুসুমের-বৃন্তদল-কেশরাদি খুলিয়া পুঙ্খানুরূপে এক একটী চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া, আর দ্বিতীয়তঃ সেই সকল সামগ্রী উপাদান-স্বরূপ গ্রহণ-পূর্ব্বক কাব্য, নাটক, উপন্যাসাদিতে আদর্শ বা লক্ষ্যের অনুরূপ চরিত্র চিত্রিত করিয়া। প্রথমোক্ত কার্য্য সমালোচকের, দ্বিতীয় কার্য্য কবির। সমালোচক বিষয়ের ঔচিত্য এবং অনৌচিত্য বিচার করেন,ভাবের পৌর্ব্বাপর্য্য, মাত্রা, অনুপাত এবং যোগ্যতা অবধারণ করেন; আর কবি এই বিচার এবং অবধারণকে কঙ্কালস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহার উপরে ভাষারূপ রক্তমাংসের সাহায্যে আপনার শক্তি এবং রুচির অনুরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। অতএব শীর্ষভূষণস্বরূপ কাব্যের কথাই যদি চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, সমালোচনা এবং কাব্য পরস্পর বিরোধী নহে, বরং সমালোচনা কাব্যের পুরোবর্ত্তী সাহায্যকারী। সমালোচক হইলেই কবি হওয়া যায়, একথা মিথ্যা; কিন্তু কবিকে সমালোচক হইতেই হইবে, একথা নিতান্তই সত্য। "নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ" একথা সর্ব্বত্র সমানভাবে খাটে না। কবি ইচ্ছা করিলে, অবশ্য তাঁহার সৃষ্ট তিন হস্ত দীর্ঘ সূর্পনখাকে সাত শত যোজন দীর্ঘ নাসা অনায়াসে দিতে পারেন;

কিন্তু সে কুৎসিৎ মূর্ত্তি দেখিবামাত্র লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণবাণ তাহার নাসিকা ছেদন করিবে।

সমালোচন যখন কাব্যের শত্রু নহে, বরং একটা প্রবল সহায়,তখন ইহাকে কি আর অধিক কাল উপেক্ষা করা উচিত? বিধিব্যবস্থাশূন্য রাজ্য যেমন, সমালোচনাশূন্য সাহিত্য-সমাজ কি সেইরূপ নহে? সূত্র এবং দৃষ্টান্ত, এই দুইটীর সাহায্যে সকলপ্রকার শিক্ষা সম্পাদিত হয়। সূত্র বিষয়টা বলিয়া দেয়, দৃষ্টান্ত তাহার অর্থ বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়। সূত্র বুঝিয়া দৃষ্টান্ত দেখা ছিল প্রাচীন প্রথা, দৃষ্টান্ত দেখিয়া সূত্র বুঝা হইয়াছে নূতন প্রথা। জীবনধারণ যেমন আহারের উদ্দেশ্য,তৃপ্তিবোধ তাহার আনুষঙ্গিক মাত্র; সেইরূপ আমি মনে করি, কাব্যাদির প্রধান উদ্দেশ্যই শিক্ষা, আনন্দবোধ তাহার আনুষঙ্গিক অবস্থামাত্র; সমালোচনই এই শিক্ষার সূত্র,কাব্যাদি ইহার দৃষ্টান্ত। অলঙ্কার-শাস্ত্র এই শিক্ষার শৃঙ্খলাবদ্ধ সূত্র-সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অলঙ্কার-শাস্ত্রের নাম লইতে আমি সঙ্কুচিত হইতেছি। হয়ত কেহ মনে করিতে পারেন, আমাদের অলঙ্কার গ্রন্থ অনেক আছে, তাহাইত পর্য্যাপ্ত। আমি এই ভয়েই আদ্যোপান্ত সমালোন-শব্দের ব্যবহার করিতেছি। আজ আমরা যাহাকে সমালোচনা বলিতেছি, কালে তাহাই বঙ্গভাষায় অলঙ্কার-শাস্ত্র হইবে। যে অলঙ্কার আছে, তাহা আমাদের দিদিমার অলঙ্কার, মার গায়ে খাটিবে না, আমাদের নবযৌবনা মার অঙ্গে সেই অলঙ্কারই শোভা পাইবে,কিন্তু শোভা দিতে পারিবে না। আমাদের স্বভাবসুন্দরী মার অঙ্গেঅঙ্গে সৌন্দর্য্য রাশি উথলিয়া পড়িতেছে; এই নবীন দেহের নবীন অলঙ্কার জ্ঞান-বিজ্ঞানে গঠিত হইবে,প্রেমভক্তিতে বিধৌত হইবে, শক্তিসৌন্দর্য্যে মার্জ্জিত হইবে, তবেত শোভা পাইবে? জগদম্বার কৃপায় আজ বাঙ্গালী জাতির উপরে জগতের চক্ষু পড়িয়াছে; যদি আমরা যত্নের সহিত, ভক্তির সহিত, প্রাণের সহিত, একাগ্রতার সহিত, ঠিক উপাসনার মত পবিত্র নিঃস্বার্থ ভাবের সহিত মাতৃভাষার জন্য খাটিয়া প্রাণপাত করিতে পারি, তবে একদিন আমাদের মাতৃভাষার সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও জগৎ চমৎকৃত এবং মোহিত হইবে। প্রকৃত সমালোচনা না থাকাতে আমাদের জাতীয় ক্ষতি কতটা হইতেছে, আমাদের শক্তির কিরূপ অপচয় হইতেছে, সেই সম্বন্ধে গোটাদুই কথা বলিলেই আমার বক্তব্যের উপসংহার হয়।

কাব্যাদি সুকুমার সাহিত্যের বোধ হয় একটা আকর্ষণ, একটা মাদকতা, একটা সম্মোহিনী এবং উন্মাদিনী শক্তি আছে; নতুবা এ ফুলে এত ভ্রমর

জুটিবে কেন —ইহার দিকে এত বালক-বৃদ্ধ ছুটিবে কেন? তরুণ হৃদয় ত স্বভাবতই সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছুই নাই; কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায়, বৃদ্ধকে পর্য্যন্ত কাব্যানুরাগে গ্রাস করিয়া ফেলে। শিক্ষা নাই, শক্তি নাই, কিন্তু অনুরাগে পাগল। সংসারের কত ক্ষতি হইয়া যাইতেছে, হয়ত অন্নাভাবও আছে; কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, নিয়ত কাগজ কলম লইয়া কবিতার ভাঙ্গন-গড়নে ব্যস্ত, নিজের রচনা উচ্চৈঃ-স্বরে পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়া তাহারই মাধুর্য্যে বিভোর, তাহারই রসাস্বাদনে উন্মত্ত! কেহ সে রচনা শুনিতে চাহে না, তথাপি তাহাকে শুনাইতে হইবে; কেহ তাহাতে প্রশংসার কিছু পায় না, তথাপি তাহার মুখ দিয়া অন্ততঃ "বেশ হইতেছে" কথাটি বাহির করিতে হইবে। এ বিষয়ে অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই, রাজসাহীর নিকট স্বর্গীয় জয়নাথ বিশি মহাশয়ের নামোল্লেখই যথেষ্ট। স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত মহাশয়ের কাব্যানুরাগ স্মরণ করিয়া পুঁঠিয়াবাসী অদ্যাপি আমোদ উপভোগ করিয়া থাকেন। এই সকল বৃদ্ধের কাব্যানুরাগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। কাব্যোপাসনায় যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা তাঁহারা নিজে পূর্ণমাত্রাতেই ভোগ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কতকগুলি অপরি-হার্য্য ক্রটির জন্য আমরা সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত। যাহা হউক, যাঁহাদের কর্ম্মলীলা শেষ হইয়া আসিয়াছে, এখন "হাতে বৈঠা ঘাটে না" কেবল নৌকায় চড়িয়া "বদর বদর" বলিয়া নৌকাখানি ছাড়িয়া দেওয়ার অপেক্ষা, তাঁহারা না হয় আপনার ভাবে ডুবিয়া, আপনার আনন্দে বিভোর হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কাটাইলেন, সমাজকে কিছু না দিলেন; কিন্তু যাহাদের শক্তি-সামর্থ্য, জ্ঞানগৌরব, কর্ম্মঠতা এবং উদ্যমশীলতার উপরে জাতীয় ভাগ্য নির্ভর করিতেছে, সেই সকল তরুণ যুবক যদি শিক্ষক এবং পদপ্রদর্শক না হইয়া সাহিত্যের বিজ্ঞানস্বরূপ সমালোচনে অনভিজ্ঞ থাকিয়া, কেবল নিজের যত্ন, অনুরাগ এবং অপক্ক জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে সুকুমার সাহিত্য লিখিতে থাকে, তবে তাহা অসার এবং অপাঠ্য ভিন্ন আর কি হইবে? অবশ্য বাঙ্গালীর সাহিত্য-ভাণ্ডারে এখন অনেকগুলি আদর্শ গ্রন্থও জমিয়াছে এবং তাহা যত্নের সহিত পাঠ করিলে নূতন লেখকদিগের প্রভূত উপকারও হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু সাহিত্যের বিজ্ঞান ভাগ উপেক্ষা করিয়া কেবল আদর্শ গ্রন্থ পড়িয়া গ্রন্থপ্রণয়ন করিলে বড় জোর তাহা সেই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অপকৃষ্ট অনুকরণমাত্র হইতে পারে; কিন্তু ইহাই কি তাহাদের চরম লক্ষ্য হইবে? বর্ত্তমান যাহা আছে, যথাকালে তাহার উপরে যদি

সমৃদ্ধি-শালিনী হইবে, বঙ্গীয় সাহিত্য বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিবে, এ আশা কেমন করিয়া করিব? বাঙ্গালী ভবিষ্যতে মাতৃভাষার যে বিচিত্র এবং উন্নত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবে, তাহার ভিত্তিভূমির অতি নিম্নস্তরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়াও, যাঁহারা সেই গৌরব-পুঞ্জ পৃষ্ঠে বহন করিবার অধিকার পাইবেন, তাঁহারাও ধন্য, তাঁহারাও পুণ্যবান্।

এই উৎসাহী যুবকেরা যাহাতে সাহিত্য-সেবায় কৃতকার্য্য হইতে পারে, তাহার সুযোগ-দান এবং উপায় নির্দ্ধারণ সাহিত্যের বর্ত্তমান মহারথীদিগের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা আছে কিনা, জানি না—নাই বলিয়াই বোধ হয়; না থাকিলে অনতিবিলম্বেই কোনরূপ ব্যবস্থা করা একান্ত সঙ্গত। অতি নগণ্য বস্তুরও অপব্যয়-নিবারণ বর্ত্তমান যুগের একটা প্রধান লক্ষণ। ছেঁড়া ন্যাকড়া, ভাঙ্গা বোতল, পরিত্যক্ত কেশনখ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান সভ্যতা কত বিলাসের উপকরণ নির্ম্মাণ করিয়াছে; আর আমাদের উৎসাহী যুবকদিগের অমূল্য সময় এবং শক্তি এইভাবে বিনষ্ট হইতে থাকিবে, ইহা ভাবিতেও যে হৃদয়ে যন্ত্রণা বোধ হয়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী।

শিক্ষা ও মাতৃভাষা।

আমাদিগের দেশে শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অধিক সংখ্যক লোকেরই কোনরূপ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। শিক্ষা সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষগণ যেরূপ ব্যবস্থা করেন, আমরা তাহারই অনুবর্ত্তন করি মাত্র। সাধারণ লোক এ সম্বন্ধে একরূপ উদাসীন। পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতির মধ্যে শিক্ষার যেরূপ প্রসার ও সমাদর হইতেছে, তাহাতে আমাদের এরূপ ঔদাসীন্য যে নিতান্তই লজ্জাকর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জর্ম্মণী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রত্যেক বালক বালিকা যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে, গবর্ণমেণ্ট নিজব্যয়ে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রমজীবিদিগের জন্য, মূক ও বধিরের জন্য, অন্ধদিগের জন শিক্ষার যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

শিক্ষাই সভ্যজাতির একমাত্র মহাশক্তি। যে জাতি যত শিক্ষিত হয়, জীবন-সংগ্রামে ততই সে স্থায়িত্ব লাভ করে। তাই এখনও হিন্দুজাতি বহিরাক্রমণের প্রলয়-বন্যায় পুনঃ পুনঃ বিক্ষুব্ধ হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। গ্রীসের গৌরবসূর্য্য বহুকাল অস্তমিত হইয়াছে—তাহার স্বাধীনতা পরপদদলিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার সাহিত্য-দর্শনময়ী প্রতিভা মানবসমাজে এখনও চির-নূতন রহিয়াছে। রোম গিয়াছে, তাহার সভ্যতার ভাতি সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। সভ্যজগৎ ক্রমশঃই উপলব্ধি করিতেছে যে, নৈতিক শক্তি, শারীরিক শক্তি অপেক্ষা মহীয়সী। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যে যুদ্ধবিগ্রহের যুগ চলিয়া যায় নাই, তাহা আধুনিক সভ্যতার অসম্পূর্ণতার নিদর্শন। সমগ্র মানবজাতির আশা, উদ্যম ও লক্ষ্য সভ্যতার দিকে কেন্দ্রীভূত। শিক্ষা মানবসমাজের কেন্দ্রগামিনী শক্তি। সমাজের বিভিন্ন অংশকে একত্র গ্রথিত করিতে হইলে, দুরূহ জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে, সভ্যজাতিসমূহের মধ্যে আসন প্রাপ্ত হইতে হইলে শিক্ষা ভিন্ন অন্য কোন উপায় আছে বলিয়া আমি জানি না। অথচ এই শিক্ষাসম্বন্ধে আমরা কর্ত্তৃপক্ষের উপর ভার দিয়াই

নিশ্চিন্ত। ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে সকলেরই ব্যক্তিগত ভাবে ও সাধারণ ভাবে স্বার্থ রহিয়াছে। অথচ এমন দুরদৃষ্ট যে এ বিষয়ে আলোচনার একান্তই অভাব!

শুধু জ্ঞানোপার্জ্জন শিক্ষা নহে, শিক্ষা সর্ব্বতোমুখী হওয়া আবশ্যক। প্রকৃত শিক্ষা মানবপ্রকৃতির গভীরতম প্রদেশকে স্পর্শ করে, পরিবর্ত্তন করে ও আলোকিত করে। যে শিক্ষা চরিত্রোৎকর্ষ বিধান করে না, মানসিক ভাব ও বৃত্তিসমূহের সম্যক্‌স্ফূরণে সহায়তা করে না, যাহা কেবল পরকীয়া বিদ্যার অনুবৃত্তি মাত্র, তাহা কখনও শিক্ষা নামের উপযুক্ত হইতে পারে না। শিক্ষা মানবপ্রকৃতির পশুত্ব অপনোদন করিয়া তাহাকে দেবত্বে দীক্ষিত করিবে, তবেই সে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল; নহিলে শিক্ষার অভিনয় হয় মাত্র।

আজকাল অনেকস্থলে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশস্থলেই সে নিন্দা শিক্ষা-নীতির উপর বর্ষিত না হইয়া, শিক্ষিত যুবকদিগের ভাগ্যেই হইয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-প্রাপ্ত যুবককে এক অদ্ভুত জীব বলিয়া প্রমাণ করা যেন একটা উপাদেয় কাযের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের প্রকৃত জ্ঞানপিপাসা হয় না, বিশ্ববিদ্যালয় একবার ছাড়িতে পারিলে আর তাহার কথা মনে করে না, এ অপবাদ ত মুখে মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ অপবাদ কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিমণ্ডিত যুবক স্বেচ্ছায় মস্তকে বহন করিতেছে? আমরা পরীক্ষাপাশ করিয়াই যদি অপরাধ করিয়া থাকি, তবে আর কাহারও পরীক্ষা পাশ করিয়া কাজ নাই। কিন্তু যে কারখানা বা Factoryতে পাশ করা যুবক নামে বিস্ময়কর পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে, সে কারখানার কি কোনো দোষ নাই? যদি তাহা থাকে, তবে জনসাধারণ কবে ইহার সমবেত-প্রতিবাদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন? কবে এ কলঙ্ক-কালিমা আমাদের গাত্র হইতে প্রক্ষালিত হইবে?

শিক্ষানীতির সংস্কার সম্বন্ধে যে বিপুল প্রশ্ন নিহিত আছে, তাহার মীমাংসা করা এ ক্ষুদ্র লেখকের সীমা ও সাধ্য, উভয়েরই অতীত। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে দুইটি বিষয়ের অবতারণা করিব মাত্র। প্রথম, প্রকৃত-শিক্ষা-বিস্তারের বাঞ্ছনীয়তা; দ্বিতীয়, প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে মাতৃভাষার অপরিহার্য্যতা। প্রথমটি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কোনও জাতি কখনও শিক্ষা ব্যতীত অভ্যুদয় প্রাপ্ত হয় নাই, কখনও হইবে না। এক সময়ে কতকগুলি অসভ্য বর্ব্বর জাতি বিপুল সংখ্যা এবং প্রভূত পাশব বলের প্রভাবে মধ্য-এসিয়া ও

উত্তর-ইউরোপ খণ্ডে এক প্রবল ঝঞ্ঝার ন্যায় সভ্যতার সূর্য্য বিলুপ্ত করিবার উপক্রম করিয়াছিল বটে, কিন্তু ধ্বংসের অনুচরগণ অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল, সময়ের গাত্রে একটিও রেখা রাখিয়া যাইতে পারিল না। অথচ রোমক সভ্যতা আজিও স্নিগ্ধ উষার ন্যায় মানবজাতির বিচিত্র জ্ঞানাকাশ ব্যাপিয়া আছে। বাহুবল অচিরস্থায়ী, সভ্যতা অজর অমর। সেই সভ্যতার মূল শিক্ষা।

ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ধর্ম্মের আলোকে প্রদীপ্ত ছিল, তাই আজিও রম্য গোধূলির ন্যায় সে পুরাতন সভ্যতা আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার খরজ্যোতি তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়াছে সত্য, কিন্তু বিলুপ্ত করিতে সক্ষম হয় নাই। দেবভাষা সংস্কৃত আমাদের সম্মুখে তাহার অতুলনীয় বিভব সর্ব্বদা উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বগৌরব কোথায়? সংস্কৃত ভাষার কুঞ্জকাননে আর ত নিত্যনূতন সঙ্গীত শুনিতে পাই না, আর ত সে পুরাতন বীণায় নূতন রাগিণী বাজে না। সংস্কৃত সভ্যতার যুগ চলিয়া গিয়াছে! পাশ্চাত্য শিক্ষার সংঘাতে সংস্কৃতকে পরিম্লান হইতে হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই নাই। ইংরেজি ও সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যখন ইংরেজি ভাষা এদেশে শিক্ষাবিস্তারের অবলম্বন স্বরূপ বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, তখন দেশের ভাগ্য গঠন বিষয়ে দেশীয়গণের অংশ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল। ইংরেজি জয়লাভ করিল; পাশ্চাত্য সভ্যতার বন্যায় দেশ প্লাবিত হইতে চলিল। কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া এই বিদেশীয়া বাগ্‌দেবীর আরাধনা করিয়া আমাদের মুক্তিপথ প্রশস্ত হইল কৈ? প্রতি বৎসর অগণিত যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার দিয়া ভারতীর মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতেছেন; প্রকৃত অর্ঘ্যদান কতজনের ভাগ্যে ঘটে? পুণ্যজ্ঞান-পিপাসা মনে জাগে না; অমরত্বের আস্বাদনও ভাগ্যে ঘটে না। উপাধিধারী যুবকের অধ্যবসায়ের অভাব নাই; তাহার শিক্ষা ভিত্তিহীন।

কিন্তু কালের স্রোত ফিরিয়াছে। উষার আগমনে সর্ব্বত্র উন্মেষের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে; দীনত্বের গৌরব আমাদিগকে ঋণ গ্রহণে সঙ্কুচিত করিতেছে। শুধু যে বিদেশীয় শিক্ষার গৌরব কমিয়াছে, তাহা নহে, বিদেশীয় আচারে উপহাস বর্ষিত হইতেছে, বিদেশীয় শিল্প ধনীর বিলাসগৃহে শোভা হারাইতে বসিয়াছে, বিদেশীয় বুলি বাঁকাইয়া বলিয়া বাহাদুরী লওয়া কঠিন হইয়াছে। বক্তারা অভ্যস্ত ইংরেজির ছটা ছাড়িয়া মাতৃভাষার দীন খঞ্জ কলেবরে নির্ভর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুষুপ্তির বিস্রস্তালস

জড়তার অবসানে চৈতন্যের আভাস দৃষ্ট হইয়াছে। খেলাধুলার অবসানে ক্ষুধার্ত্ত সন্তান মাতার আহ্বান শুনিয়া ছুটিয়াছে। জোয়ার আসিয়াছে, পালে অনুকূল বাতাস লাগিয়াছে, দিক্ সকল নির্ম্মল হইয়াছে, যাত্রার এই প্রশস্ত সময়। মাতৃভাষার প্রোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দিব্য আলেখ্যের ন্যায় দূর হইতে প্রলুব্ধ করিতেছে। এ শুভলগ্ন যদি ভ্রষ্ট হয়, তবে আর কলঙ্কের সীমা থাকিবে না।

বঙ্গভাষাই আমাদের—বাঙালীর—শিক্ষার একমাত্র স্বাভাবিক ভিত্তি। সর্ব্বজাতির মধ্যেই মাতৃভাষা জাতীয় শিক্ষার অবলম্বন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। জাতীয়তার দিক ছাড়িয়া দিলেও, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সুকুমারস্বভাব শিশু-গণের চিত্তবৃত্তিস্ফুরণের পক্ষে মাতৃভাষা যেমন অনুকূল ও স্বাভাবিক, অন্য ভাষা কোন ক্রমে তেমন হইতে পারে না। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, অতুল সম্পদ-শালিনী সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ করিয়া দীনা বঙ্গভাষার শরণ গ্রহণ করিব কেন? বহু শতাব্দীর জ্ঞানপুষ্ট ভাষাকে বিদায় দিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে কি? তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সংস্কৃতকে পরিত্যাগ করা আমাদের পক্ষে কখনও সম্ভব নহে। বঙ্গভাষাকে পরিপুষ্ট করিতে হইলে দুইটি স্রোতকে মিশাইয়া দিতে হইবে। বঙ্গভাষা নূতন ও সজীব আকারে সংস্কৃতকে আলিঙ্গন করিবে। বাঙ্গালা সংস্কৃতের এক নূতন সংস্করণ হইবে। আমার মনে হয় সংস্কৃত সাহিত্যের সজীবতা সম্পাদন করিতে বাঙ্গালাই কেবল সক্ষম। সংস্কৃতকে বাঁচাইয়া রাখা প্রত্যেক বাঙালীর কর্ত্তব্য। সুসংস্কৃত বঙ্গ-ভাষা সংস্কৃতকে বাঁচাইয়া রাখিবে। দর্শন বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি বঙ্গ-ভাষায় হইতে হইলে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠ মিলন অবশ্যম্ভাবী। কেননা, নূতন ভাব প্রকাশের জন্য নূতন শব্দের প্রয়োজন হইলে, সংস্কৃত অপেক্ষা অন্য কোন ভাষাই আমাদের নিকটতর আশ্রয় নহে। পাছে বঙ্গ-ভাষার উৎকর্ষ ইংরেজি ভাষার অধিকারকে খর্ব্ব ও সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে, এজন্য কেহ কেহ এরূপ উৎকর্ষকে সন্দিহান নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে পারেন। যদি বাস্তবিক তাহাই হয়, তাহা হইলেও উপায় নাই। প্রকৃত শিক্ষা মাতৃ-ভাষার অনুগামিনী। প্রকৃতির ইহাই নিয়ম। যে নিয়মে বসন্তে কোকিল গাহে, প্রভাতের বাতাসে ফুল ফোটে,—মাতৃভাষার সংসর্গে শিশুর মানসিক শক্তিনিচয় স্ফুরিত হওয়া তেমনি একটী নিয়ম। আমরা সে প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছি, কাযেই শিক্ষা-বিভ্রাট ঘটিয়াছে। চীনেরা যেমন সৌন্দর্য্যের কুহকে লৌহের জুতা পরাইয়া রমণীগণের পা ছোট করিয়া লয় এবং সেই সঙ্গে

সঙ্গে পায়ের যাহা স্বাভাবিক কার্য্য,—ভ্রমণ—তাহার শক্তিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে, তেমনি বিদেশীয় ভাষার কঠিন আবরণে বঙ্গীয় যুবকের মনোবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। যাহা অস্বাভাবিক, তাহাই অমঙ্গলপ্রসূ। এই অমঙ্গলকে প্রতিরোধ করিবার জন্য মাতৃভাষার শরণ লইতে হইবে। শিশু যখন হাটিতে শিখে, তখন মাতৃভূমির উপরেই সে পা ফেলিয়া ফেলিয়া শিখিয়া থাকে। Parallel Bar বা তারের উপর অভ্যাস করে না। হাঁটিতে শিখিলে তখন Parallel Bar বা Rope dancing-এ বাহাদুরী লওয়া সম্ভব হয়। আমরা নিজের ভাষা দিয়া আরম্ভ করিলে পরের ভাষাও আমাদের নিকট সরল ও উপকারক্ষম হইবে, শিক্ষাও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ! উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যেখানে ইংরেজির নাগপাশ তত কঠিন নহে, সেখানে বাঙালী প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতে বিমুখ হয় নাই। বিজ্ঞানে বাঙ্গালীর প্রতিভা অসঙ্কুচিত,আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র তাহার উদাহরণ স্থল। গণিতেও বাঙ্গালী যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

একটী কথা এই,ইংরেজি সাহিত্যের সংসর্গে বাঙ্গালা এত পুষ্টিলাভ করিয়াছে, ইংরেজি আমলেই বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টি হইয়াছে,ইংরেজি ভাষা প্রায় 'পঞ্চবিংশতি শতাব্দীর সভ্যতার ইতিহাস আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়াছে, আমরা ইংরেজিকে পরিত্যাগ করিব কি প্রকারে? করিবই বা কেন? ইংরেজির প্রভাব তিরোহিত হইলে বাঙ্গালার দশা কি হইবে, কে বলিতে পারে?

আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, ইংরেজির সাহায্য আমাদের ভাষার পক্ষে আদৌ আবশ্যক নহে। তাঁহারা বলেন,ইংবেজির সংসর্গ প্রাপ্ত না হইলে বঙ্গভাষা শৈশব অতিক্রম করিতে পারিত না,ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু আর এ সংসর্গ শুভাবহ নহে। তাহার যেটুকু কায ছিল,তাহা সম্পন্ন হইয়াছে,এখন তাহাকে তাহার সুদূর জন্মস্থানে ফিরাইয়া দাও। এই শ্রেণীর লোকেরা মনে করেন যে, বস্ত্র-শিল্প সম্বন্ধে বিদেশী-বর্জ্জন যেমন অপরিহার্য্য, ভাষা সম্বন্ধেও তাহাই কর্ত্তব্য। বিদেশীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে বয়নশিল্প ও ভাষা অচিরকালের মধ্যে উন্নতিলাভ করিবে।

আমি ঠিক বলিতে পারি না, বস্ত্র-শিল্প ও ভাষা সম্বন্ধে একই যুক্তি প্রযোজ্য কি না, তবে আমার মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষার—বাঙ্গালা সাহিত্যের—পুষ্টিবিধানের জন্য ইংরেজিকে 'বয়কট' করা অত্যাবশ্যক নহে। 'বয়কট' বলিতে যে বিদ্বেষের ভাব মনে আসে, তাহা যে এরূপ গভীর তত্ত্বমীমাংসার পক্ষে একেবারেই

অনুকূল নহে, ইহা বলা বাহুল্য। ইংরেজি সাহিত্যের নিকট বঙ্গভাষা কৃতজ্ঞ। তাহার ঋণ অপরিমেয় ও অপরিশোধনীয়। ইংরেজি সাহিত্যের মধ্য দিয়া বঙ্গভাষা তাহার গতি ও ভবিষ্যৎ গঠন করিয়া লইতেছে। বঙ্গভাষার সে গতিকে ব্যাহত না করিলেই তাহার উন্নতির সহায়তা করা হইবে। যাহা স্বাভাবিক, তাহাকে প্রতিরোধ না করিলেই আপনি সে প্রসার লাভ করে। বঙ্গভাষা ইংরেজির সঙ্গত্যাগ না করিয়াও অল্পে অল্পে তাহার ন্যায্য অধিকার আদায় করিয়া লইতেছে। এমন একদিন ছিল যে প্রাথমিক শিক্ষার সংকীর্ণ ক্ষেত্র লইয়া বঙ্গভাষাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সমূহের মধ্যে নিতান্ত নগণ্য একটী স্থান পাইবার জন্য বঙ্গভাষাকে দীনভাবে যাচ্ঞা করিতে হইয়াছিল। পদক ও পুরস্কারের লোভে পরীক্ষার্থিনীগণ ইচ্ছা-সুখে একদিন মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য বাঙ্গালারচনার পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে কোন কোন ছাত্র বাঙ্গালা গ্রহণ করিতেন, কিন্তু সেরূপ বিকল্প যে নিতান্ত অভাবপক্ষে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষগণ জানাইয়া দিতে ত্রুটি করিতেন না। কারণ তাহা না হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় যাঁহারা বাঙ্গালা গ্রহণ করিতেন, এফ-এ পরীক্ষায় তাঁহাদের পথ রুদ্ধ করিয়া দিবার প্রয়োজন কি? এফ-এ পরীক্ষার্থীরা বাংলা গ্রহণ করিতে পারিতেন না। কেবল মেয়েদের জন্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত। তাঁহাদিগকে এফ-এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইত।

এরূপ বৈষম্য যে সুব্যবস্থার বিরোধী, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের নববিধান উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। নববিধানে বঙ্গভাষাকে পূর্ব্বের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া সমধিক প্রসার দেওয়া হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষাসমূহে বঙ্গভাষা তাহার ন্যায্য অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন প্রত্যেক বি-এ পরীক্ষার্থীর পক্ষে বঙ্গভাষা অবশ্য গ্রহণীয়। মধ্য পরীক্ষায়ও বাঙ্গালা সংস্কৃতের ন্যায় একটী স্বাধীন স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী, ইতিহাসের প্রশ্নের উত্তর, ইচ্ছা করিলে, মাতৃমাষায় লিখিতে পারিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য যে কমিশন বসিয়াছিল, সেই সমিতি উচ্চ-শিক্ষায় বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা সমর্থন করিয়া এম-এ পরীক্ষাতেও বাঙ্গালা প্রবর্ত্তনের জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনকে বাঙ্গালা ভাষার রীডার (Reader) নিযুক্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের মাতৃভাষাকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন।

বঙ্গীয় বালকের অনেক অমূল্য সময় যে নিতান্ত অনাবশ্যকরূপে বিদেশীয় ভাষার বন্ধুর ও কঙ্করময় পথে বিচরণ করিতে কাটিয়া যায়, তাহা বহুদিন হইতে শিক্ষাসংস্কারার্থিগণের মন আন্দোলিত করিতেছিল। বাঙ্গালা যাহাতে শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ গৃহীত হয়, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রথম হইতে এজন্য যথেষ্ট পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। দশ বার বৎসর পূর্ব্বে পরিষৎ বাঙ্গালা সাহিত্য বিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। তখন সে আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছিল। কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যে শিক্ষানীতির যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যাহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উপেক্ষা ও উপহাসের সামগ্রী ছিল, আজ তাহাই সম্পূর্ণ সফল হইতে চলিয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে পেড্‌লার সাহেব যখন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন, তখন গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া ইংরাজি স্কুলে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলেন। এতদিনে পরিষদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। ইংরাজি স্কুলের নিম্নশ্রেণী সমূহে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত হইল। যদিও তাহার ফলে অনেক অদ্ভুত বাঙ্গালা সম্বলিত পাঠ্যপুস্তকের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু সে সকল গুল্মকণ্টক তিরোহিত হইয়া বঙ্গভাষা অচিরকালে দিব্য শাখাপল্লবসমন্বিত হইয়া উঠিবে, আশা করা যায়।

শিক্ষাবিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য-নিরপেক্ষভাবে শিক্ষার নিম্নস্তরে যাহা করিতেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় নববিধানে বঙ্গভাষাকে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত করিয়া সম্যকরূপে তাহার সমর্থন করিয়াছেন।

জাতীয় শিক্ষাপরিষৎও বাঙ্গালাভাষার সমুচিত আদর করিতে ত্রুটী করেন নাই। শিক্ষাপরিষদের নিয়মানুসারে বাঙ্গালাভাষার সাহায্যেই নিম্ন ও উচ্চ উভয়বিধ শিক্ষাই প্রদত্ত হইয়া থাকে। শিক্ষাপরিষদের পরীক্ষা সমূহে বঙ্গ-ভাষাকে মুখ্য ও ইংরেজিকে গৌণ স্থান দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গভাষাকে উচ্চশিক্ষার স্তরে উন্নীত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ—বিশেষত আমাদের বর্ত্তমান ভাইস্‌-চান্সেলার মহোদয়—সমগ্র বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালী জাতির অসীম কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, এই নবব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিতে অনেক বাধা ও বিরোধ খণ্ডন করিতে হইয়াছে। যাঁহারা ইংরেজিশিক্ষার পৃষ্ঠপোষক, তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা উপলব্ধি করিতে

পারিয়াছেন যে নবপ্রবর্ত্তিত প্রথার ফলে ইংরেজির প্রভাব ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর হইয়া আসিবে। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে,বাঙ্গালীর শুভাশুভ এই শিক্ষানীতির উপর নির্ভর করিতেছে। যদি ইহা সত্য হয় যে, প্রকৃতশিক্ষা মাতৃভাষার সহিত অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থির দ্বারা জড়িত, তাহা হইলে সেই মাতৃভাষারই শ্রীবৃদ্ধি সাধন প্রত্যেক সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিরই অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাতে যদি ইংরেজীর প্রভাব পরিম্লান হয়, তবে তাহাই বিধাতার বিধান বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। একটী জাতির শুভাশুভের তুলনায় এ ক্ষতি অতি তুচ্ছ।

কিন্তু তাহা বলিয়া এখন হইতেই বিলাতী পণ্যের ন্যায় ইংরেজিভাষাকে "বয়কট" করিতে হইবে, ইহা কখনও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ এইরূপ প্রবৃত্তি ঠিক স্বদেশ-প্রীতির পরিচায়ক কিনা সন্দেহ স্থল। বরং বঙ্গ-ভাষাকে সৌষ্ঠব-সমন্বিত করিবার জন্য ইংরেজি বা পৃথিবীর অন্য কোন শ্রেষ্ঠ ভাষার ঋণ গ্রহণ করা অধিকতর জাতীয়তার পরিচায়ক। হিন্দুরা শিক্ষার জন্য অপরের দাসত্বগ্রহণ পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, ইংরেজি-সাহিত্য পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, ইংরেজি ভাষা ভারতের বিভিন্ন বিশ্লিষ্ট অংশগুলিকে একতার বন্ধনে বাঁধিয়াছে, পাশ্চাত্যশিক্ষা সংস্কৃতসভ্যতার স্রোতোহীন স্থির যমুনায় খরস্রোতা ভাগীরথীর ন্যায় তরঙ্গ তুলিয়া দিয়াছে—তাহার সজীবতা সম্পাদন করিয়াছে। এখন পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন যাহাতে ধীর সরলপথে এবং নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে পরিচালিত হয়, তাহাই করা শুভাবহ। অকস্মাৎ কোন দৈহিক পরিবর্ত্তন ঘটিলে শারীর-প্রণালী যেমন বিকল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, সমাজতন্ত্র তেমনি আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বিপর্য্যস্ত হয়। শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধেও রক্ষণশীলতার প্রয়োজন আছে। অবিমিশ্র উদারনীতি বা রক্ষণশীলতা অপেক্ষা বিবর্ত্তনশীল জাতীয় জীবনে উভয়ের সংমিশ্রণই অধিকতর মঙ্গলজনক। পূর্ব্বপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে, স্বাভাবিক নিয়ম আপনি সে পরিবর্ত্তনের সূচনা করিয়াছে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তনকে বিপ্লবে পরিণত করিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা কি ?

কয়েক বৎসর যাবৎ, বঙ্গীয় মুসলানদিগের মাতৃভাষা কি,—এই প্রশ্ন লইয়া নানারূপ আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। এই প্রশ্ন উপযুক্তরূপে মীমাংসিত হওয়ার উপর বঙ্গীয় মুসলমানদিগের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ অল্পাধিক পরিমাণে নির্ভর করে বলিয়াই এই সভায় বর্ত্তমান প্রবন্ধটী পেশ করা গেল।

এই প্রশ্ন মীমাংসা করিবার পূর্ব্বেই একটী অতি গুরুতর কথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। "হইত" এবং "আছে" এই দুইটী কথায় অনেক প্রভেদ। "যদি আমি নবাব হইতাম তবে কি ভাল হইত" একথা আলোচনা করিয়া সময় নষ্ট করা নিতান্ত মূর্খতা মাত্র। "আমি কি আছি" ইহাই আমাদিগকে দেখিতে হইবে। বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা কি হইলে ভাল হইত, কিম্বা কি হওয়া উচিত, এ বিষয় আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে ; তাহাদের উদ্দেশ্য কি, আমরা কেবল তাহাই দেখিব।

এইখানেই হয়ত অনেক প্রবীণ ও অভিজ্ঞ লোকের সহিত এ নবীন লেখকের মতভেদ হইবে। "যাহা করা উচিত তাহা করিতেই হইবে" এ উপদেশ অতি মূল্যবান হইলেও বর্ত্তমান স্থলে তাহার প্রয়োগ হইতে পারে না। ভাষার স্বভাব হইতে উৎপত্তি এবং স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী ইহার গঠন ও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে ; ইহা একপ্রকার মনুষ্য ক্ষমতার বহির্ভূত।*

অনেকেই বলিয়া থাকেন, বঙ্গীয় মুসলমানদিগের পক্ষে উর্দ্দু মাতৃভাষা হইলে ভাল হইত ; তাহা হইলে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদিগের সহিত তাহাদের একতাবন্ধন অধিকতর দৃঢ় হইত। আমি বলি, আরবী হইলে আরও ভাল হইত ; কারণ তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদিগের সহিত তাহাদের একতাসূত্রে গ্রথিত হইবার সুবিধা হইত।

অনেকে আবার উর্দ্দুকেই বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের অজুহাত এই যে বঙ্গীয় মুসলমানগণ যে

---

* "Language is a natural organism possessed of a separate existence and as litttle subject to the will of the individual as the power of changing its song to the will of the nightingale."—Schleicher.

ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন,তাহাতে অনেক আরবী ও পারসী শব্দ দেখা যায়, সুতরাং উহাকে বাঙ্গলা বলা যায় না। বরং উর্দ্দু ভাষার সঙ্গে উহার একটা সম্বন্ধ স্থাপন করা যাইতে পারে। তাঁহাদের এই অজুহাত মানিয়া লইলে ইংরাজী ভাষাকেও আমরা ইংরাজী বলিতে পারি না, কারণ তাহাতে অনেক লাটিন ও গ্রীক শব্দ আছে;এবং স্পেনিশ ভাষাকেও আরবী ভাষার একটা শাখা বলিতে হইবে, কারণ উহাতে অনেক আরবী শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক কেবল শব্দের ঐক্য দেখাইয়া এক ভাষাকে অপর ভাষার সঙ্গে সংযোগ করা যায় না, উভয় ভাষার ব্যাকরণের মিল দেখাইতে হইবে এবং যে পর্য্যন্ত বঙ্গীয় মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষার ব্যাকরণের ও উর্দ্দু ভাষার ব্যাকরণের সাদৃশ্য না দেখান যাইতে পারে,সে পর্য্যন্ত উর্দ্দু ভাষাকে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বলা যাইতে পারে না।*

কেহ কেহ আবার ঝগড়া ফসাদে না যাইয়া একটা মাঝামাঝি রকমের বন্দোবস্ত করিতে চাহেন। তাঁহারা বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষাকে মুসলমানদের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নহেন ; মুসলমানী বাঙ্গালা বলিয়া তাঁহারা একটা আলাহিদা বাঙ্গালা ভাষা তৈয়ার করিতে ইচ্ছুক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভাষা কাহারও ইচ্ছাপূর্ব্বক তৈয়ার করিতে হয় না ; উহা মনুষ্যের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া থাকে। † যদি বঙ্গীয় মুসলমানগণ বাঙ্গালা ভাষার উপর তাঁহাদের যে অধিকার পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে,তাহা চিনিয়া উঠিতে পারেন, তাহা হইলে এই বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষাকেই তাঁহাদের মুসলমানী বাঙ্গালা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

দুঃখের বিষয়, মুসলমানদের একটা জাতিগত দোষ হইয়া পড়িয়াছে এই যে, তাঁহাদের যাহা আছে, তাঁহারা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক নহেন, অথচ যাহা গ্রহণ করিবার তাঁহাদের কোন দাবী দাওয়া নাই, তাহা লইবার জন্য তাঁহারা ব্যগ্র।

* "Unless the grammar agrees, no amount of similarity between the roots of two languages could warrant us in comparing them together."—Sayce.

† "Language, in fact, is a social creation ; we may term it if we like, a human invention, but we must remember that it is no deliberate invention of an individual genius, but the unconscious invention of a whole community."—Sayce.

"A society never met together to *make* a language"—*The Same.*

বাঙ্গালা ভাষা নিজে বলিতেছে যে "আমি তোমাদের" তবুও বঙ্গীয় মুসলমানগণ বলিবেন যে এ বাঙ্গালা ভাষা আমাদের নহে। যে ভাষার মাল, মত্তা, দৌলত, আসবাব মুসলমানের প্রদত্ত, সে ভাষা মুসলমানের নহে, তবে কাহার? যে ভাষার কাগজ, কলম, দোয়াত পর্য্যন্ত মুসলমানের দেওয়া, সে ভাষা মুসলমানের নহে তবে কাহার? যে ভাষার আইন, আদালত, মুন্সেফ, সেরেস্তাদার, নকলনবীশ, আমিন, উকীল, মোক্তার সমস্তই মুসললানের দাবী সমর্থন করিতেছে, সে ভাষা মুসলমানের নহে তবে কাহার? যে ভাষার রঙ্গবেরঙ্গের লোক হরেক রকমের কাজ কারবারে বাঙ্গালা ভাষা একদিন অজ্ঞাতভাবে মুসলমানের হাতে তৈয়ারী হইয়াছিল বলিয়া গাওয়া দিতেছে, সে ভাষা মুসলমানের নহে তবে কাহার? এত সাক্ষী সাবুদ সত্ত্বেও অনেক নাছোড়বান্দা বাঙ্গালী মুসলমান মাথা নাড়িয়া বলিবেন যে এ বাঙ্গালা ভাষা আমাদের নহে!!!

যদি বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালা ভাষাকে পায় না ঠেলিয়া নিয়মিতরূপে তাহার চর্চ্চা করিত, তবে আমার বিশ্বাস আরও অনেক মুসলমানী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় জায়গা পাইত। বর্ত্তমান সময় যে দুই একজন মুসলমান বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা আবার বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞতা দেখানের জন্য এতদূর ব্যস্ত যে, অতি দুরূহ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিবেন, অথচ যে দুই একটী মুসলমানী শব্দ পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালা ভাষায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে, তাহার কাছ দিয়াও ঘেষিবেন না। সুতরাং মুসলমান সাম্রাজ্যের পতনের পর হইতে এ পর্য্যন্ত কোন নূতন মুসলমানী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় দাখিল হইয়াছে কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিতে হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদেরই যেন শরম কিছু জেয়াদা বলিয়া বোধ হয়।

এইরূপ জিনিস নিজে গ্রহণ না করাতে তামাদি দোষে বাঙ্গালা ভাষার উপর মুসলমানদের স্বত্ব রহিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। হয়ত এক শতাব্দীর পর এ সমস্ত শব্দ যে মুসলমানী, তাহার কোন প্রমাণ থাকিবে না। আমার মনে পড়ে এক সময় আমার একজন হিন্দু বন্ধু 'আসালতন' এই শব্দের উৎপত্তি ব্যাখ্যা কোন মুসলমানের নিকট হইতে এইরূপ শুনিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন, যথা :—

"আসালতন"—আশালতা হইতে, যেহেতু আশাকে লোকে চিরকালই

পোষণ করিয়া থাকে, কখনই ছাড়িতে পারে না, সেই হেতু 'আসালতন, অর্থ চিরকালের জন্য।

এই উৎপত্তি ব্যাখ্যা হিন্দু বন্ধুর স্বকপোল-কল্পিত কি তাঁহার মুসলমান শিক্ষক হইতে গৃহীত, বলিতে পারি না, তবে মুসলমানগণ এরূপ খামখেয়ালির ঘোরে পড়িয়া থাকিলে কালে যে প্রায় মুসলমানী শব্দেরই এই ধরণের উৎপত্তি ব্যাখ্যা শুনিতে হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃ ধরিতে গেলে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি মুসলমানদের হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গে হিন্দু রাজত্বের সময় বিদ্বান ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সংস্কৃত ভাষারই চর্চ্চা করিতেন, বাঙ্গালা ভাষার বড় ধার ধারিতেন না। মুসলমানদের আমলে সংস্কৃতের চর্চ্চা অনেক কমিয়া যায় এবং বাঙ্গালা ভাষা অল্পাধিক পরিমাণে বাদসাহী সুনজরে পতিত হয়।* সেই সময় হইতেই বাঙ্গালা ভাষায় নানা মুসলমানী শব্দ ঢুকিয়া উহার কলেবর বৃদ্ধি করিতে থাকে।

ইংলণ্ড নরম্যানদিগের দ্বারা অধিকৃত হইলে ইংলণ্ডের ভাষার যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, মুসলমানগণ বঙ্গ অধিকার করিলে পর বঙ্গীয় ভাষারও কতকটা সেইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। পুরাতন "এংগ্‌লো সেক্সন" নরম্যানদের হাতে পড়িয়া যেরূপ বর্ত্তমান ইংরাজী ভাষায় পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ পুরাতন "সাধুভাষা" মুসলমানদের হাতে পড়িয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা হইয়া পড়িয়াছে। নরম্যান অধিকারের পর যেরূপ ইংলণ্ডের ভাষায় bilingualism অথবা দ্বিভাষাত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল, বঙ্গীয় ভাষায়ও যে মুসলমান অধিকারের পর সেইরূপ ঘটিয়াছিল, তাহার প্রমাণ আজকালও পাওয়া যায়, যথা :—

কাগজপত্র	খালখন্দক	সীমাসরহদ্দ
ধনদৌলত	কাণ্ডকারখানা	হাটবাজার
চাষ আবাদ	খরিদ বিক্রী	ঝড় তুফান

ইত্যাদি।

কিন্তু নরম্যানদের ইংলণ্ড বিজয়ে ও মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ে অনেক ফরাক। নরম্যান ও সেক্‌সন জাতিতে ও ধর্ম্মে একই ছিল; তাহাদের কেবল ভাষা বিভিন্ন ছিল। হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্ম, জাতি ও ভাষা সকলই বিভিন্ন ছিল। সুতরাং কয়েক শতাব্দীর পর ইংলণ্ডে নরম্যান ও সেক্সনের মধ্যে কোন প্রভে-

---

* হুসেনশাহ ও পরাগল খাঁ ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দই রহিল না, কিন্তু বহু শতাব্দীর পর বঙ্গে এখনও হিন্দু মুসলমানের সেরূপ অবস্থা ঘটে নাই। অন্ততঃ ধর্ম্মে এখনও তাহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বঙ্গে হিন্দু মুসলমানের অবস্থারও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং সেই অনুসারে বাঙ্গালা ভাষারও যে কিছু তারতম্য না হইয়াছে, এরূপ নহে। "সহরের চক-মিলন দালান ইমারৎ" ছাড়িয়া এখন মুসলমানগণ "দেহাতের গয়রাবাদী জমী" সমূহ দখল করিয়াছে। "জবরদস্ত জমীদারের আসা সোটা" এখন "গরিব রায়তের আসানড়ি" হইয়া পড়িয়াছে। "কাজীসাহেব" এখন আর "মিয়াদ" দেন না, তিনি "কাবিন" "রজষ্টরী" করিয়াই খালাস। তাঁহার সেই অর্দ্ধগজ লম্বা "তাজ" এখন ক্ষুদ্র "টুপী'র আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে "সহরে" থাকিতে আরবী ভাষা হইতে গৃহীত "চক" বাজার বুঝাইত, এখন "দেহাতে" আসিয়া তাহার অর্থ হইল ক্ষেত। এখন মুসলমানেরা আর "টাকা" লইয়া "খাজানা তহসীল" করে না, বরং "রুপিয়া" দিয়া "দেয় কর শোধ" করিয়া থাকে। মুসলমানগণকে উচ্চ "মসনদে" বসিয়া এখন আর "বাদসাহী খেয়ালে" ঝিমাইতে হয় না, "জিরাতির মসুম বেমসুম" ঠাওরাইতেই এখন "হয়রান পেরেসান লবেজান।"

মোটের উপর দেখিতে গেলে তিন শ্রেণীর মুসলমান তিন ভাষা লইয়া বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন; রাজা আসিয়াছিলেন পারস্য ভাষা লইয়া, সৈন্যগণ আসিয়া ছিলেন তুর্কী ভাষা লইয়া এবং ধর্ম্মপ্রচারকগণ আসিয়াছিলেন আরবী ভাষা লইয়া। সুতরাং এই তিন ভাষারই প্রচুর মুসলমানী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়।

মুসলমানগণ যোদ্ধাবেশে প্রথম বাঙ্গালা দেশে প্রবেশ করেন, সুতরাং অনেক যুদ্ধ সম্বন্ধীয় মুসলমানি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়; যথা, তীর, কামান, তোপ, রেকাব, জীন্, লাগাম, নিসান, নাকাড়া, বন্দুক, বারুদ ইত্যাদি। কালক্রমে মুসলমানগণ বাঙ্গালা দেশের রাজা হইলেন এবং রাজকীয় কার্য্য সম্বন্ধীয় অনেক মুসলমানী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় স্থান পাইল; বর্ত্তমান সময় আফিস আদালতের ব্যবহৃত শতকরা নিরানব্বই শব্দই সমুলমানি। "হাকিম" হইতে "পেয়াদা", "উকীল" হইতে "মওয়াক্কেল", "ফরিয়াদি" হইতে "কয়েদী" সমস্তই যে মুসলমানের হাতে গড়া, ইহা সকলেই জানেন, সুতরাং তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণ ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন, সুতরাং বর্ত্তমান সময় ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধীয়

প্রচুর মুসলমানী শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। আমদানী, রপ্তানী, মাশুল, তেজারতী, পেশা, জমা খরচ, হাওলাত বরাত ইত্যাদি সমস্তই মুসলমানী। এইরূপ রাজকার্য্য ও বাণিজ্য উপলক্ষে মুসলমানগণ বাঙ্গালা দেশে বসবাস করা হেতু গৃহের অনেক জিনিসপত্রও মুসলমানী হইয়া পড়িল; যথা—জিনিস, মাল, আসবাব, কুরসি, মেজ, চামচ, তক্তপোষ, পাপোষ, বালিশ, ফরস, চাদর, হুকা, পরদা, আতরদান, গোলাবপাশ ইত্যাদি।

এ সব ত গেল দ্রব্যের নাম; ক্রমে অনেক মুসলমানী ভাবব্যঞ্জক শব্দও বাঙ্গালা ভাষায় ঢুকিতে আরম্ভ করিল। এই সমস্ত ভাবব্যঞ্জক শব্দের মধ্যে কতকগুলি যুদ্ধ সম্বন্ধীয়; যথা হাঙ্গামা, ফসাদ, জোর, জুলুম, জবরদস্তি, ফরিয়াদ, ইত্যাদি। কতকগুলি মনুষ্য প্রকৃতি সম্বন্ধীয়; যথা মেজাজ, গোসা, জেদ, তবিয়ত ইত্যাদি এবং কতকগুলি আমোদ প্রমোদ সম্বন্ধীয় যথা খুসী, তামাসা, মজা, শিকার, ইত্যাদি। এ সমস্ত বিশেষ্য ছাড়া অনেক মুসলমানী বিশেষণও বাঙ্গালা ভাষায় দেখা যায়, যেমন গরিব, বেচারা, বেহায়া, বেমালুম, বজ্জাত, বদ, খারাপ, গোলাবী, দরকারী ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত আরবী ভাষা হইতে গৃহীত 'ওয়ালা' ও পারস্য ভাষা হইতে গৃহীত 'মন্ত' এই উভয়ের সংযোগে এক প্রকার কর্তৃবাচক শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় গঠিত হইয়া থাকে; যথা শ্রীমন্ত, ভাগ্যমন্ত, আক্কেলমন্ত, দানেশমন্ত, তামাকওয়ালা, টিকিওয়ালা ইত্যাদি। আবার পারস্য ভাষার "খোর" নানা শব্দের সহিত সংযুক্ত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় গালির ভাণ্ডার বাড়াইয়া দিয়াছে; যেমন গাঁজাখোর, নেশাখোর, তামাকখোর, সরাবখোর, হারামখোর ইত্যাদি।

মোটের উপর বিশেষ্য ও বিশেষণ পর্য্যন্তই বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমান প্রভাব পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছে। কোন মুসলমানী সর্ব্বনাম কি ক্রিয়া বাঙ্গালা ভাষায় দেখা যায় না; যদি দেখা যাইত, তবে বাঙ্গালা ভাষা আর বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা থাকিত না। উর্দ্দুর সঙ্গে ও বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে এই খানেই বেমিল দেখা যায়।* আরবী ও পারসী বিশেষ্যের সঙ্গে বাঙ্গালা সহযোগী ক্রিয়া "করা" যোগ করিয়া এক প্রকার মুসলমানী ক্রিয়া গঠন করা হয় বটে, কিন্তু উহাকে ঠিক খাঁটি মুসলমানী ক্রিয়া বলা যায় না।

* বাঙ্গালা, উর্দ্দু, পারসী ও সংস্কৃত সকলই এক মূল ভাষা হইতে গঠিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের সর্ব্বনাম গুলি প্রায়ই এক ধরণের, কিন্তু উর্দ্দু ভাষার সর্ব্বনাম গুলিতে পারস্য ভাষার সর্ব্বনাম গুলির ছায়া অতি স্পষ্ট।

উদাহরণ স্থলে উপরে যে সমস্ত মুসলমানী শব্দের তালিকা দেওয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রায় সমস্তই লিখিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত দেখা যায়। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ঐ সমস্ত শব্দ দ্বারা আরও অনেক মুসলমানী শব্দ বঙ্গীয় মুসলমানগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। বটতলার যে সব মুসলমানী পুঁথি আছে এবং যাহা অর্দ্ধ শিক্ষিত মুসলমানদের অতি আদরের বস্তু, ঐ সকল পুঁথির মধ্যেও এরূপ অনেক আরবী ও পারসী ভাষার শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা এখনও বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বত্র গৃহীত হয় নাই। ঐ সকল শব্দের মানি অনেক সময় বাঙ্গালী মুসলমানগণই ভালরূপ বুঝিতে পারেন না, হিন্দু-গণত দূরের কথা। যেমন কারবালা যুদ্ধি ক্ষেত্রে মহাত্মা হোসেন (রাঃ আঃ) তনয়া বিবি সখিনার সঙ্গে তদীয় ভ্রাতুস্পুত্র মহাবীর কাসিমের বিবাহ সম্পন্ন হওয়া মাত্রই যখন কাসিম যুদ্ধ ক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, তখন কোন পুঁথিলেখক বিবি সখিনার মুখে বলাইতেছে :—

"আগে যদি জান্‌তাম্ কাসিন তুমি জঙ্গের পেয়ারা। *
"না দিতাম্ বিয়ার এজিন না পরিতান সেয়ারা ॥"

এই দুই পংক্তিতে 'জঙ্গ,' 'পেয়ারা,' † 'এজিন' ও 'সেয়ারা' এই চারিটীই মুসলমানী শব্দ। "জঙ্গ" এবং 'পেয়ার,' হিন্দু মুসলমান সকলেই হয়ত বুঝি-বেন ; 'এজিন' শব্দটী মুসলমানগণ বুঝিলেও হিন্দুগণ বুঝিবেন না ; এবং 'সেয়ারা' শব্দটীর সঠিক অর্থ অনেক মুসলমানও ভালরূপ বুঝিবেন কি না সন্দেহ। এই সব পুঁথিতে শতকরা প্রায় পঞ্চাশটীই মুসলমানী শব্দ ; কিন্তু তাহা হইলেও ইহাদের ভাষাকে উর্দ্দু বলা যাইতে পারে না। কারণ যে সকল মুসলমানি শব্দ ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহাদের সকলেই বিশেষ্য কি বিশেষণ, সর্ব্বনাম কি ক্রিয়া নাই বলিলেও চলে ; সুতরাং ইহাদের ভাষার ব্যাকরণের সঙ্গে উর্দ্দু

* জঙ্গ—লড়াই যুদ্ধ
পেয়ারা—প্রিয়
এজিল—অনুমতি
সেয়ারা—মাথার অলঙ্কার বিশেষ

† সংস্কৃত ও পারসী উভয়ই আর্য্যভাষা, সুতরাং পারসী ও সংস্কৃত শব্দ সমূহের মধ্যে যথেষ্ট আত্মীয়তা রহিয়াছে। 'পেয়ারা' শব্দটী সংস্কৃত 'প্রিয়' হইতে আসিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন কিন্তু পারসী 'পেয়ারা' হইতে উহার উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা কিছু বেশী বলিয়া বোধ হয়।

ভাষার ব্যাকরণের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই নাই। † অতএব আরবী ও পারসী শব্দ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেন, কেবল এই অজুহাতে বঙ্গীয় মুসলমানগণ উর্দ্দু ভাষাকে তাঁহাদের মাতৃভাষা বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

বাঙ্গালা ভাষায় অনেক মুসলমানী শব্দ এরূপ অবিকৃত ভাবে স্থান পাই-য়াছে যে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সুদূর আরব দেশের মরু-ভূমি হইতে উত্থিত তামাসা, খেয়াল, ফউত, ফেরার, ইত্যাদি শব্দ সমূহের বঙ্গীয় প্রতিধ্বনি অতি শুদ্ধ ও সঠিক। আরব দেশের 'আতরের' ও প্যারস্য দেশের 'গোলাবের' সুগন্ধ বঙ্গীয় 'আতরে' ও গোলাবে প্রায় অটুট রহিয়াছে। আরবী 'বন্দুক' ও তুর্কী 'তোপ' বাঙ্গালায় আসিয়া একেবারে বেকল হইয়া পড়ে নাই। অথচ এমন অনেক মুসলমানী শব্দও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা বাঙ্গালা দেশের জল পানিতে একেবারে খাস বাঙ্গালী হইয়া পড়িয়াছে, যেমনঃ—

বে আরাম = ব্যারাম = ব্যাম

বাহির = বাইর = বের

সেপাহী = সিপাহী = সিপাই

কেতাব (?) = খাতা

খানা (?) = খাতা

আবার অনেক মুসলমানি শব্দ বাঙ্গালা দেশে পদার্পণ করিয়া নূতন মানি হাসিল করিয়াছে। "খালি" এই শব্দ আরবী ভাষায় শূন্য" (empty) বুঝায়, বাঙ্গলায় আসিয়া তাহার অন্য একটা অর্থ হইয়াছে কেবল; যেমন "তুমি খালি বান্দরামী করিতে পার।" "জবত" এই শব্দ আরবীতে কেবল "ধরা" বুঝায়। বাঙ্গালায় আসিয়া উহার আর একটী অর্থ হইয়াছে "নাকাল করা"; যেমন তাহাকে ভারি "জব্দ" করিয়াছি। "বাহার" এই শব্দ পারস্য ভাষায় "বসন্তকাল" বুঝায়, বাঙ্গালায় আসিয়া উহার অর্থ হইয়াছে "সৌন্দর্য্য"। "বহর" এই শব্দ আরবীতে সমুদ্র বুঝায়, বাঙ্গালায় আসিয়া উহার অর্থ হইয়াছে, বহুসংখ্যক নৌকার "সমষ্টি"।

মুসলমানগণ হিন্দুর অস্পৃশ্য হইলেও খাঁটি মুসলমানী শব্দগুলির আলিঙ্গনা-বদ্ধ হইতে সংস্কৃত শব্দসমূহকে বড় নারাজ দেখা যায় না। পারস্য শব্দ "সহর"

† উর্দ্দু ও বাঙ্গালা উভয়েই আর্য্যভাষা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষার ও উর্দ্দু ভাষার মধ্যে এরূপ কোন সম্বন্ধ নাই, যাহাতে উর্দ্দু ভাষাকে তাহাদের literary ভাষা বলা যাইতে পারে।

প্রায়ই সংস্কৃত শব্দ "অঞ্চলের" অঞ্চল ধরিয়া থাকে ; এই দুইয়ের সংযোগেই "সহরাঞ্চল" শব্দটীর উৎপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃত "অন" মুসলমানী "আদায়ের" গায়ে পড়িয়া উহাকে অনাদায় করিয়া ফেলিয়াছে। পারস্য "জোর" সংস্কৃত "স"কে আলিঙ্গন করিয়া সজোরে পরিণত হইয়াছে। সংস্কৃত 'স' আরবী নজরকে বুকে লইয়া সুনজর করিয়াছে। এতৎসত্ত্বেও উহাদের সংস্কৃতত্ব এখনও বহাল, বজায় ও অটুট রহিয়াছে!!!

বঙ্গ ভাষার বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে এই যে, যাহাতে বঙ্গ ভাষার একখানা প্রকৃত অভিধান প্রণয়ন করা হয়, তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী হয়েন। যে সকল বাঙ্গালা অভিধান বর্ত্তমান সময় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত সমুদয় শব্দগুলি স্থান পাইয়াছে কিনা, তদ্বিষয় ঘোর সন্দেহ আছে ; সকল শব্দের আবার উৎপত্তি ব্যাখ্যাও সঠিকরূপে দেওয়া হয় নাই। বিদেশী শব্দ মাত্রকেই সার্ব্বজনীন "যাবনিক" আখ্যা দিয়াই অনেক অভিধানপ্রণেতা ক্ষান্ত রহিয়াছেন ; উহা আরবী কি পারসী, তুর্কী কি ইংরেজী, তাহার কোন উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এই সভার গত অধিবেশনে এ বিষয় কিছু আলোচনা করা হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ কতদূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে, সর্ব্বসাধারণ তদ্বিষয়ে বিশেষ অবগত নহেন।

বঙ্গীয় মুসলমানগণের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা এত নিম্নস্তরে পৌঁছিয়াছে যে, তদ্দরুণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গভাষাকে যে সব শব্দ দান করিয়াছিলেন, তাহাদিগকেও কিছু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে। মুসলমানী শব্দগুলি যেন বঙ্গ ভাষায় ঢং সাজাইবার কতকগুলি উপকরণ হইয়া পড়িয়াছে। যখনই একটু বিদ্রূপ কৌতুকের প্রয়োজন, তখনই মুসলমানী শব্দ লইয়া টানাটানি পড়িয়া যায়। যখনই হাস্যের ফোয়ারা ছুটাইতে চাহেন, তখনই বঙ্গীয় লেখকগণের সুনজর মুসলমানী শব্দের উপর পতিত হয়। নবীন বঙ্গীয় লেখক "কলমের" স্থানে "লেখনী" ধারণ করিবেন, কাগজ না লইয়া "তুলট" দিয়া কোনরূপে কাজ চালাইবেন, "দোয়াতের" স্থানে হয়ত "মস্যাধার" নামক একটী দুর্লভ সংস্কৃত জিনিসের আমদানী করিবেন, কিন্তু যেই একটু রসের প্রয়োজন, অমনই মুসলমানী শব্দ না হইলেই নয়! "কাকার" স্থানে যখনই "চাচার" ব্যবহার হয়, তখনই যেন লেখক ও পাঠক উভয়েরই বদনমণ্ডলে হাসির ঈষৎ বক্র রেখা প্রকটিত হয়, অথচ ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতানুসারে 'কাকা' পুরাতন কর্কশ gutteral দ্বারা

গঠিত এবং 'চাচা' উক্ত শব্দেরই একটু মার্জ্জিত ও নব্য সভ্য আকার মাত্র ?!*

গেঁয়ার ছেলের হাতের জিনিসকে খারাপ বলিলে সে যেমন উহা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া কাঁদিতে থাকে, বঙ্গীয় মুসলমানগণও তেমনি বঙ্গভাষায় মুসলমানী শব্দ সমূহের এরূপ নিগ্রহ দেখিয়া এ বাঙ্গালা ভাষা তাঁহাদের নহে বলিয়া মুখ ফিরাইয়া লইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না যে, বঙ্গ ভাষায় মুসলমানী শব্দের এ নিগ্রহের জন্য হিন্দুগণ অপেক্ষা তাঁহারাই অধিকতর দায়ী। কয়জন বঙ্গীয় হিন্দুলেখকের মুসলমানী বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে যথোচিত ব্যুৎপত্তি আছে? এ বিষয় শিক্ষিত বঙ্গীয় মুসলমানগণের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।† হিন্দুলেখকগণ বাঙ্গালা মুসলমানী শব্দ সমূহের প্রকৃত তথ্য নিরূপণে অসমর্থ হইয়াও অনেক সময় হাতের কাছের, ঘরের কোণে ব্যবহৃত মুসলমানী শব্দ ছাড়িয়া পরিশ্রমোপার্জ্জিত দুরূহ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হন। সুতরাং অন্যায় হঠকারিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃ ভাষা বলিয়া মনে করিয়া প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমানের তাহার যথোচিত চর্চ্চা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বস্তুতঃ মাতৃভাষার অনিশ্চয়তাই বঙ্গীয় মুসলমানদের শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ হওয়ার অন্যতম কারণ। মাতৃভাষা হৃদয়ে সুদৃঢ়ভাবে আসীন না হইলে অন্য কোন ভাষা তথায় দখল পায় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মাবলী দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এ কথাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণও স্বীকার করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মানুযায়ী মাতৃভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য হওয়াতে মুসলমান ছাত্রগণ বিষম সমস্যায় পতিত হইয়াছে। বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্রগণ ত উর্দ্দুকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিতে সাহস পায় না, অধিকন্তু বাঙ্গালা ভাষার যথোচিত চর্চ্চা না থাকার দরুণ বাঙ্গালা ভাষায়ও

---

* "......gutterals usually an importaut class of sounds in savage idioms.—Sayce.

† শ্রদ্ধেয় বাবু দীনেশচন্দ্র সেনের যদি একজন মুসলমান সাহায্যকারী থাকিতেন, তবে হয়ত তিনি বঙ্গভাষায় মুসলমান প্রভাব আরও একটু ভালরূপে বুঝিতে পারিতেন। মাণিকচাঁদের গানে প্রাপ্ত আসা নড়ি (হাতের লাঠি) কইতর (পায়রা) আউল (সিদ্ধপুরুষ) শব্দ গুলি যে মুসলমানী, তাহা যে কোন শিক্ষিত মুসলমান তাঁহাকে অনায়াসে শিখাইয়া দিতে পারিতেন। তাহা হইলে মাণিকচাঁদের সময় নিরূপণে তাঁহাকে এত বিব্রত হইতে হইত না।

তাহাদের হিন্দুসহপাঠিগণের সমকক্ষ হইতে তাহারা কখনই আশা করিতে পারে না। এদিকেত মাতৃভাষা লইয়া এই গোল, অন্যদিকে পারসীর সহিত আরবী শিক্ষা করার নিয়ম হওয়াতে মুসলমান ছাত্রগণের প্রতি জুলুমের একশেষ হইয়াছে। পরসীর স্থলে আরবী শিক্ষা করা খুবই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাই বলিয়া যে সব ছেলে আরবী ভাষার বিন্দুমাত্রও অবগত নহে,তাহারা কি প্রকারে মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ করায়ত্ত করিবে, বাস্তবিকই তাহা ভাবিবার বিষয়। যে সব ছেলে নূতন নিয়মানুযায়ী এণ্ট্রেন্স পাশ করিবে, তাহাদের পক্ষে এত কষ্টকর নাও হইতে পারে। সুতরাং ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষায়, আরও দুই বৎসর পরও বি, এ, পরীক্ষায়, আরও চারি বৎসর পর নূতন নিয়মানুযায়ী আরবী ও পারসী শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলে হয়ত মুসলমান ছেলেদিগের একটু হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ হইত।

এই মাতৃভাষার অনিশ্চয়তার দরুণই আবার মুসলমান ছেলেরা প্রতিযোগিতায় তাহাদের হিন্দুসহপাঠীদের সমকক্ষ হইতে অনেক সময় অক্ষম হইয়া পড়ে। যে স্থানে হিন্দু ছাত্রগণকে তিন ভাষা শিক্ষা করিতে হয়, সে স্থানে বেচারা মুসলমান ছাত্রগণকে পঞ্চ ভাষা শিক্ষা না করিলে চলে না। এই Penta Lingua বা পঞ্চ ভাষার গোলে পড়িয়াই যে অনেক মেধাবী মুসলমান ছাত্রকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষা-ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মুসলমান ছাত্রগণকে বাড়ীর কাজ কারবার চালানের জন্য কিছু বাঙ্গালা শিখিতে হয়, ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য কিছু আরবী না শিখিলেও নয়, সহজে পরীক্ষা পাশকরার জন্যই হউক, কি মুসলমানদের গৌরব পরিচায়ক ভাষা বলিয়াই হউক, কিছু পারসী শিক্ষা না করিলেও চলেনা, আবার স্কুলের মৌলবী সাহেব বাঙ্গালা ভাষাকে“নফরৎ”করিয়া উর্দ্দুতে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন,সুতরাং তাঁহার খাতিরে কিছু উর্দ্দু ভাষার অভিজ্ঞতার দরকার; সকলের উপর রাজভাষা ইংরেজীত আছেই। এই পঞ্চ ভাষার মারামারিতে মুসলমান ছাত্রগণ কোনটীই ভাল করিয়া শিখিবার অবসর পায় না।

যদি বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা ঠিক করিয়া মুসলমান ছাত্রগণ কেবল বাঙ্গালা, আরবী ও ইংরেজী শিক্ষা করে, তাহা হইলে বোধ হয় সব দিক বজায় থাকিতে পারে। যাঁহারা ভয় করেন যে, বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিলে মুসলমান ছাত্রগণ অতি দরকারী ধর্ম্ম বিষয়ক শব্দগুলিও শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারিবে না, তাঁহাদিগকে আমি এই বলিতে চাই, যদি বর্ত্তমান সময়ের মত

তোতা পাখীর ন্যায় আরবী না পড়াইয়া নিয়মিত মতে অর্থ সহ আরবী পড়ান যায়, তাহা হইলে মুসলমান ছাত্রগণও শুদ্ধভাবে ধর্ম্মশব্দগুলি উচ্চারণ করিতে ত পারিবেই, অধিকন্তু তাহার মানিও বুঝিবে। যাঁহারা বলেন যে, পারসী ভাষার মত সুললিত ও মুসলমানদের গৌরব-পরিচায়ক ভাষাকে একেবারে ত্যাগ করা উচিত নহে, তাঁহাদিগকে আমি এই বলিতে চাই যে, আরবী ভাষা জানা থাকিলে পারসী ভাষা শিক্ষা নিজে নিজেও করা যায়, কিন্তু পারসীভাষাভিজ্ঞ কেহই সহজে আরবী ভাষা শিখিতে পারিবেন না। যাঁহারা বলেন যে, উর্দ্দু জানা না থাকিলে ভদ্র সমাজে ও অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় সুবিধা হয় না, তাঁহাদিগকে আমি এই বলিতে চাই যে, ভারতের সকল প্রদেশেরই শিক্ষিত ও ভদ্র মুসলমানদের সঙ্গে ইংরাজী ভাষাতে আলাপ চলিতে পারে ; অপরদিকে আরবী জানা থাকিলে প্রয়োজন মত যে, উর্দ্দু ভাষায় দুই চারিটী কথা না বলা যায়, এরূপ নহে।

সুতরাং বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্রগণকে সর্ব্বপ্রথম কিছু বাঙ্গালা শিখাইয়া বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে আরবী ও ইংরেজী শিক্ষা দিলে সময়ও অল্প লাগিবে এবং আমার বিশ্বাস, শিক্ষাও ভাল হইবে। এ কথাগুলি চিন্তাশীল মুসলমানগণ একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি ?

আবদুল মজীদ খাঁ,

[রাজশাহী কলেজের আরবীর অধ্যাপক]।

মুসলমান বৈষ্ণব কবি।

দুই এক দিনে বা দুই একজনের চেষ্টায় কোন সামাজিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে পারে না। দেশে যখন কোন ধর্ম্মযুগের পরিবর্ত্তন হয়, তখন অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বহুদিন পূর্ব্ব হইতে ঐ পরিবর্ত্তনের বীজ রোপিত হইয়াছিল, কালক্রমে তাহা এক দিন অকস্মাৎ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। এক দিন যে ধর্ম্মান্দোলন 'হরের্ণামৈব কেবলং' ধ্বনিতে বঙ্গদেশ মাতাইয়া তুলিয়াছিল, এক দিন যে ধর্ম্মযুগ প্রবর্ত্তনে 'চন্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ' নীতি প্রচারিত হইয়া আর্য্যভূমির জাতিবর্ণ ভেদের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছিল, সে পরিবর্ত্তন কি এক দিনে বা একজনের দ্বারা সংসাধিত হইয়াছিল? প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের সমস্ত দেহ মন প্রাণ যে প্রেম বন্যায় ভাসমান হইয়াছিল, যে প্রেমসুধাপানে উন্মত্ত হইয়া "অয়ি দীন দয়ার্দ্র নাথহে" বলিয়া তিনি কাঁদিয়া মাটী ভিজাইতেন, সেই উন্মাদকারী প্রেম-স্রোত কি একদিনেই বহিতে আরম্ভ হইয়াছিল? নিমাইচাঁদের আবির্ভাবের বহু বৎসর পূর্ব্বে বৈষ্ণব কবি জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতির অমর লেখনী হইতে যে প্রেম-স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাই শ্রীচৈতন্যের সময়, বাধা বিঘ্ন বিপত্তি প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া বর্ষার ভরানদীর মত উভয় কূল প্লাবিত করিয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। এই প্রেম-বন্যার প্রবল প্লাবনে বঙ্গদেশ হইতে ভেদবিচার ভাসাইয়া লইয়া গেল, হিন্দুর হিন্দুত্ব, মুসলমানের মুসলমানত্ব, এক অসীম অনন্ত অগাধ প্রেম-পারাবারে বদ্ধ করিয়াছিল। কত সৌভাগ্যবান্ মহাত্মা যে সেই অপূর্ব্ব প্রেম-সরোবরের এক এক বিন্দু প্রেম-সুধা পানে অমর হইয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গীয় কাব্যোদ্যানের কুসুম-পেলব কুঞ্জদ্বার উদ্‌ঘাটন করিলে প্রতীয়মান হইবে।

বহু-দেববাদী হিন্দুগণের কথা এ প্রবন্ধে কিছু বলিব না, একেশ্বরবাদী মুসলমানগণ যে, শ্রীচৈতন্যের বিজয় বৈজয়ন্তীমূলে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহাই বিস্ময়কর এবং তাঁহাদের বিবরণ সংকলন করাই আমার এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সকল কবিদের প্রকৃত ধর্ম্মমত অভ্রান্তরূপে জানিতে না পারিলেও তাহারা যে প্রভূত পরিমাণে বৈষ্ণব ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন এবং অনেকেই যে

বৈষ্ণব ধর্ম্মাচার প্রতিপালন করিতেন, তাহার প্রভূত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' কেবল এগার জন মুসলমান বৈষ্ণব কবির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা এ পর্য্যন্ত ৪৬ জন মুসলমান বৈষ্ণব কবির অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছি। আমার এ কার্য্যে বিশেষ সাহায্যকারী বন্ধু শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করিম। তাঁহার সহায়তা লাভ করিতে না পারিলে, আমি এত শীঘ্র মুসলমান বৈষ্ণব কবিদিগের সমগ্র পদাবলী উদ্ধার করিতে পারিতাম কি না সন্দেহস্থল। তৎপর বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম-এ, বি-এল মহাশয়ের নিকটও আমি কম ঋণী নহি। তিনিও অনুগ্রহ করিয়া আমায় একজন নূতন কবির পরিচয় জানাইয়াছেন এবং পরে আমার অনুরোধক্রমে তাহার পদাবলী সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকটও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই সকল কবির পদাবলী পাঠ করিলে, এখনকার এই হিন্দু মুসলমান-বিদ্বেষ-বহ্নি প্রধূমিত হইত না। জ্ঞান-গরিমার অবাধ আধিপত্যের দিনের সহিত সুদূর অতীতের ভাই-ভাইয়ে মিলনের শান্তিস্রোত-প্রবহমান কালের তুলনা করিতে বস্তুতই ইচ্ছা জন্মে। হিন্দু একদিন মুসলমানের যে গুণের পক্ষপাতী হইয়া প্রাণের প্রবল আবেগে মুসলমানকে 'জগদীশ্বরো বা' বলিয়া উদারতার ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করতঃ গুণের ও সম্ভ্রমের সমাদর রক্ষা করিয়াছিল, মুসলমানও সেইরূপ এক সময় প্রতিবাসী বন্ধু হিন্দুর ভক্তি ভালবাসা হৃদয়ে ধারণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতে কুণ্ঠিত, লজ্জিত বা শঙ্কিত হয়েন নাই। এখনকার এইরূপ ঘোর দুর্দ্দিনে এইরূপ পদাবলীর বহুল প্রচলন বাঞ্ছনীয়।*

'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' (১ম খণ্ড)—সৈয়দ মর্ত্তুজার সংস্করণে আমি লিখিয়াছিলাম যে, হরিদাস জাতিতে 'যবন' হইলেও অনেক ব্রাহ্মণ ভক্তগণ তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া কৃতার্থ হইতেন। প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিলে জানা যাইবে, হরিদাসের ন্যায় বহুতর একেশ্বরবাদী মুসলমান, বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রাচীন সাহিত্যাভিজ্ঞ একজন মুসলমান সাহিত্য-বন্ধু আমায় লিখেন,—"ভক্ত হরিদাস জাতিতে হিন্দু কি মুসলমান ছিলেন, তৎসম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। 'মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ' সে কথা কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। কেহ বৈষ্ণব কবিতা লিখিলেই যে

* মৎসম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' (২য় খণ্ড) আলিরাজা পুস্তকের সমালোচনায়, রাজসাহীর 'হিন্দুরঞ্জিকা' পত্রিকায় এইরূপ অভিমত প্রকাশিত হয়।

তাঁহাকে 'বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী' বলিতে হইবে, এমন কথা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। এমনও হইতে পারে যে, মুসলমান কবিগণ তৎকাল-সুলভ মধুর-কবিতা-বিমুগ্ধ হইয়াই হিন্দু কবিগণের দেখাদেখি বৈষ্ণব কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। সকলেই জানেন, রাধা ও কৃষ্ণ শব্দদ্বয়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। মুসলমান ফকিরেরাও 'তন'কে (তোকে) 'রাধা' এবং 'মন'কে 'কানু' জ্ঞানে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন, শুনিয়াছি। আলিরাজা নিজকে 'রাধাকানুচরণভক্ত' প্রভৃতি রূপে পরিচিত করিয়া গেলেও তিনি অতি নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন বলিয়াই শুনিতে পাই। অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানও যখন 'রাধা' 'কানু' বিষয়ে কবিতা লিখিয়াছেন, দেখা যাইতেছে, তখন সকল মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণকেই 'বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী' মনে করা যাইতে পারে না। মুসলমান বৈষ্ণব কবি নামে আমি 'বৈষ্ণব কবিতা লেখক' মুসলমান কবিই বুঝিয়া থাকি। সাহিত্যের হিসাবে ভিন্ন মুসলমানেরা ধর্ম্মের হিসাবে কখনও বৈষ্ণব কবিতা লিখিয়াছেন, এমন বোধ হয় না।" দুঃখের বিষয়, আমি বন্ধুবরের সহিত ঐক্যমত হইতে পারি নাই। প্রথমতঃ, হরিহাস যে যবন ছিলেন, তাহা বহু বৈষ্ণবীয় প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থে উল্লিখিত আছে। নীলাচলে প্রেমোন্মত্ত হইয়া শচীদুলাল হরিদাসকে আলিঙ্গন দান করিলে,

"হরিদাস কহে, শুন মোর নিবেদন।
হীন জাতি জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর।
হীন কর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর॥" ইত্যাদি
(চ, চ, অন্ত্যলীলা—একাদশ পরিচ্ছেদ)

ইহাতে হরিদাস যে নীচ জাতি, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। তৎপর হরিদাস যখন হরিনামে উন্মত্ত হইয়া উঠেন, তখন 'মুলুকের পতি' কুপিত হইয়া তাঁহাকে ধৃত করতঃ লইয়া গিয়া প্রথমে মিষ্টবাক্যে তাঁহার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিবার জন্য বলেন,—

"আপনে জিজ্ঞাসে তানে (হরিদাসে) মুলুকের পতি।
কেনে ভাই, তোমার কিরূপ দেখি মতি॥
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন॥" ইত্যাদি
(চ, ভা, আদিখণ্ড—১১শ পরিচ্ছেদ)

এইরূপ বহুতর স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া হরিদাসের যবনত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে।

তারপর বন্ধুবর যে লিখিয়াছেন, বৈষ্ণব কবিতা লিখিলেই তাঁহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী বলা যায় না, এ কথারও তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। যে ভক্ত মুসলমান, কানুকে পরাণের ধন করিয়া অসংখ্যবার তাঁহার কৃপা ভিক্ষা—প্রেম ভিক্ষা করিয়াছেন, তাহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? বর্ত্তমান কালের কোনও মুসলমান কবিইতো সখ করিয়া বৈষ্ণব কবিতা লিখেন না? কই আজ কালকার কোনও সুশিক্ষিত মুসলমানই তো 'মোরে কর দয়া, দেহ পদছায়া, শুনহ পরাণ কানু' বলিয়া কাঁদিয়া পড়েন না? যে ব্যক্তি যে ধর্ম্মাবলম্বী, সে সেই ধর্ম্মপ্রসঙ্গ লইয়াই প্রায়শঃ আলোচনা করে, এবং সেই সঙ্গে তাহার হৃদয়ের আবেগ রুদ্ধ করিয়া রাখিতে সক্ষম হয় না। হরিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী না হইলে এরূপ হরিনামের স্রোত তাঁহাদের হৃদয়কন্দর হইতে কখনই প্রবাহিত হইত না।

তারপর আধ্যাত্মিক ভাবের কথা। স্বীকার করিলাম, মুসলমান ফকিরগণ রাধা ও কানুকে তন ও মন অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার প্রমাণ কই? বরং তাহার বিপরীত প্রমাণই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। আলিরাজা সম্বন্ধে যতদূর জানা যায়, তাহাতে তিনি যে নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিনি অধিকাংশ সময় দরবেশের ন্যায়ই বৈষ্ণব কবিতা গাহিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ যদি কেবল বৈষ্ণব কবিতা লেখকই হইতেন, তবে তাঁহাদের পদগুলি এরূপ সরল ও আবেগময়ী হইত না। কার্লাইল বলিয়াছেন, 'অকপটতা' প্রতিভার অসাধারণ লক্ষণ। কপটতা পরিপূরিত থাকিলে মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী এত হৃদয়গ্রাহী ও আজ এত আদৃত ও সম্মানিত হইত না। কপটতা করিয়া কবিতা লিখিতে গেলেই তাহা ব্যর্থ হইবে।

গুরুপদে শির করি আলিরাজা কহে।
একালা চরণ বিনু মোর গতি নহে॥

যে মুসলমান, গুরুর চরণ উদ্দেশে মস্তকে ধরিয়া একথা বলিতে পারেন, তাঁহাকে আমরা অবশ্যই বৈষ্ণব ধর্ম্মানুরাগী বা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী বলিব।

আমাদের সংগৃহীত ৪৬ জন মুসলমান বৈষ্ণব কবির মধ্যে সতের জনের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইল। অবশিষ্ট কবিগণের নাম ও পদাবলী ভিন্ন বংশ-

গত কোনও বিবরণই অনুসন্ধানে অবগত হওয়া যায় নাই। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহাদের কীর্ত্তিও এই প্রথম প্রচারিত হইল।

১। মহম্মদ হাসিম। চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত পটীয়া থানার অধীন শ্রীমাই নামক গ্রামে কবি হাসিম জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাধারণতঃ হাসিম পণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম—আলিমিঞা, তিনিও একজন কবি ছিলেন। অল্পদিন হইল আলিমিঞা লোকান্তরিত হইয়াছেন। হাসিমের পুত্রবংশের আর কেহ বিদ্যমান না থাকায়, তাঁহার বংশ বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে,কেবল একটী কন্যা মাত্র জীবিতা থাকিয়া পিতার নাম বজায় রাখিয়াছে। হাসিমের একটী গান শুনুন,—

অনেক দিন সাধন করি,
পাইয়াছি শ্যাম প্রেমের বাজারে॥ ধু।
হাটে ঘাটে যার লাগি, বসাইলাম চৌকি,
তারে নিরলে পাইয়াছি, শ্যামরে! ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত গানটির ভণিতি হইতে হাসিমের নামটী তুলিয়া অপর কোনও হিন্দু বৈষ্ণব কবির নাম বসাইলে পাঠকালে ইহা মুসলমান কবির রচনা বলিয়া চিনিতে পারা যায় কি? অবশ্য মুসলমান বৈষ্ণব কবির রচিত কোন কোন পদে প্রচ্ছন্ন মুসলমানী ভাব আছে, নিম্নোদ্ধৃত হাসিমের গানটীতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রে মন শতদল!
হৃদের মাঝে মন ভোমরা চিনিতে না পারি।
রে মন শতদল! ধু।

* * * * *

মনে খানা খায়, তনে নিদ্রা যায়,
সদায় দেখে নিরঞ্জন।
দানা ফুরাইলে, পবন ঘটিলে,
অবশ্য মরণ॥
রে মন শতদল!
কহেন্ত হাসিমে, যেবা রহে ঝিমে,
বুঝিয়া মনের রীত।

গুরুর পদ, শিরে ধরি,
রচিলাম একটা গীত ॥
রে মন শতদল !

২। আলি মিঞা। আলি মিঞার জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলার সুলতানপুর নামক গ্রামে ছিল বলিয়া জানা যায়। তদ্দেশে তিনি 'আলি মিঞা পণ্ডিত' নামে খ্যাত। সুলতানপুরে বহু মুসলমান, ভদ্র, পণ্ডিত ও শিক্ষিত লোকের বাসস্থান। এই গ্রামেই 'আলাওনের বংশ' নামে বিখ্যাত একটী বংশ আছে বলিয়া শুনা যায়। মুসলমান-কাব্য-জগতে কবি আলাওনের স্থান বহু উর্দ্ধে। আলিমিঞার রচিত গান বেশী পাওয়া যায় নাই। একটী এইরূপ ;—

রসিক বাঁকা চিন্‌লি না তুই
কেমন জন, মর রে মন ! ধু।
রসিক হৈলে বুঝতে পারে রসিকের দরদ,
যেবা হয় বিশারদ ;
ইঙ্গিতে না বুঝতে পারে ঐ রসিকের আলাপন ॥
কদম ডালে নন্দলালে মুরলী বাজায় ;
রাধিকা জল ভরিতে যায় ;
হাসি হাসি প্রাণপ্রেয়সী
বসন দি' ছাপাই বদন ॥
আলিমিঞা কহে গো,তবে
মনের বাঞ্ছা সার,
কর যৌবন দান ;
মনের আশা পুরাইলে,
দিস্‌রে সোণার বাজুবন ॥

মহম্মদ আলী নামে অপর একজন কবি আছে, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইবে।

৩। চাম্পা গাজী। ইঁহার জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলার পটীয়া থানার অন্তর্গত ছতরপিটুয়া নামক গ্রামে। এই গ্রাম ও কমরআলী পণ্ডিতের জন্মস্থান 'করুল ডেঙ্গা' গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত। চাম্পাগাজী সাধারণ্যে চাম্পাপণ্ডিত নামে বিখ্যাত ছিলেন। অদ্যাপি লোকে এই নামেই তদীয় বংশধরগণের বাড়ীর নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তিনি সংগীত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন; সম্ভবতঃ

এতদ্দেশীয় হাড়িদিগকে সংগীত বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। হাড়িদিগের মধ্যে এখনও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য বর্ত্তমান আছে বলিয়া শুনা যায়। চট্টগ্রামে রাগনামা, তালনামা প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার অনেক ভণিতি পরিদৃষ্ট হয়। তৎসম্বন্ধে একস্থানে নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটি পাওয়া গিয়াছে,—

'আবদুল কাদের সুত চম্পাগাজী ভণে।
দণ্ডে দণ্ডে বহে তাল রাগ রাগীর সনে॥

সুতরাং তাঁহার পিতার নাম—আবদুল কাদের জানা গেল। তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তালুকদার ছিলেন বলিয়া 'চাম্পা তালুকদার' নামেও অভিহিত হইতেন। তাঁহার বংশ বর্ত্তমান আছে। এখন তাঁহার প্রপৌত্র বা তৎস্থানীয় লোকেরা বিদ্যমান আছে বলিয়া শুনা যায়। চাম্পাগাজীর একটী পদ;—

সোণা বন্ধুরে আমার প্রাণ বন্ধু, আইস যাও তুমি,
নিদ্রারে না দিও মন হে। ধু॥
মন্দ মন্দ করি, উত্তর দক্ষিণে,
বহত্র শীতল বাও (১)।
বন্ধুআ বলিআ, হাত বাড়াইলুম,
প্রেমরসে বাঝি গেল গাও (২)॥
প্রেমের সাগরে, হিল্লোল উঠিল,
কাম্পএ মুই নারীর হিয়া।
অধরে অধরে যুগল দিআরে (?),
নিবাও প্রেমরস দিআ॥
হেন সাধ লয়, মুই নারীর হৃদেত,
তোমারে রাখিতুম্ ভরিআ।
চাম্পাগাজী ভণে, না ভাবিঅ মনে,
নারিবা রাখিতে ধরিআ॥

মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের এই সকল গীত কি কৃত্রিম? কপটতা-পরিপূরিত? ইহা হইতে কি তাহাদের ধর্ম্ম মতের সন্ধান পাওয়া যায় না?

৪। সেখ জালাল। সেখ জালাল-রচিত কোন ক্ষুদ্র পদাবলী দেখিতে পাওয়া যায় না। মাননীয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয় 'বঙ্গভাষা ও

---

(১) বাও—বায়ু।

(২) বাঝি—বদ্ধ হইয়া। গাও—অঙ্গ, শরীর।

সাহিত্যে' বৈষ্ণব কবিগণের তালিকায় এক 'সেখ জালালের' নাম উল্লেখ করিয়াছেন। 'পরিষৎ পত্রিকায়' মৌলবী আবদুল করিমের 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণে' জালাল-কৃত 'সখীর বারমাসের' যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়, সম্ভবতঃ দীনেশ বাবু তাহা হইতেই উক্ত নামটী তদীয় তালিকায় গ্রহণ করিয়াছেন। জালালের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় নাই। তৎকৃত বারমাসের লিপিকালটী ৮৭ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং তাঁহাকে অন্ততঃ শতাধিক বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

৫। সৈয়দ মর্ত্তুজা। মুসলমান বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে আমার মতে সৈয়দ মর্ত্তুজাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। তদীয় পদাবলী লালিত্য, মাধুর্য্য ও কবিত্বে হিন্দু বৈষ্ণব কবির পদের সহিত সঙ্গতরূপে তুলিত হইতে পারে। 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি গ্রন্থে সৈয়দ মর্ত্তুজার যে কয়টী পদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটীও চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত নাই। অথচ আমাদের আবিষ্কৃত অধিকাংশ পদই উক্ত প্রদেশের হস্তলিখিত পুঁথি হইতে সঙ্কলিত। এরূপ ক্ষেত্রে 'পদকল্পতরুর' সৈয়দমর্ত্তুজা ও এই সৈয়দমর্ত্তুজা অভিন্ন ব্যক্তি কি না, এরূপ প্রশ্ন স্বতই মনে উদিত হয়, কিন্তু তাহার সমাধান সহজসাধ্য নহে। প্রথমোক্ত মর্ত্তুজাকে মুর্শিদাবাদ-জেলাবাসী বলিয়া বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রচারিত করিয়াছেন। 'সুধা' পত্রিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন,—"খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুর্শিদাবাদ প্রদেশে এক মুসলমান ফকীর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সৈয়দ মর্ত্তুজা। মর্ত্তুজার পূর্ব্ব পুরুষগণ উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ বরেলী জেলায় বাস করিতেন। মর্ত্তুজার পিতা সৈয়দ হোসেন—কাদেরীও একজন আউলিয়া বা ফকীর ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই প্রথমে বঙ্গদেশে আগমন করেন। মর্ত্তুজা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কি বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না, তবে এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, জঙ্গীপুরের নিকট বালিয়াঘাটায় তাঁহার জন্ম হয়। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হইয়া থাকে। মর্ত্তুজা হইতে এক্ষণে তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে কেহ ৮ পুরুষ এবং কেহবা নয় পুরুষ বলিয়া স্থির হইয়া থাকেন। তাহা হইলে এখন হইতে ন্যূনাধিক ২৫৫ বৎসর পূর্ব্বে মর্ত্তুজার আবির্ভাব স্থির করা যাইতে পারে। মর্ত্তুজা নিজে দীর্ঘজীবী ছিলেন, ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া শুনা গিয়া থাকে। শৈশব হইতে মর্ত্তুজা ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ করেন

এবং ফকীর বেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। জঙ্গীপুরের সন্নিহিত চড়কা নামক স্থানের রাজাব সাহেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তিনি সুতীর নিকট ছাপঘাটিতে এক আস্তানা নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতেন। তথায় অদ্যাপি তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। মর্ত্তুজা মুসলমান ফকীর হইয়াও হিন্দুদিগের তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান ছিলেন, এইজন্য মুসলমান গ্রন্থকারগণ তাঁহাকে মর্ত্তুজাহিন্দ বলিয়াছেন। আনন্দময়ী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ কন্যা ভৈরবীরূপে তাহার সহিত অবস্থিতি করিতেন বলিয়া উভয়কে মর্ত্তুজানন্দ বলিত। মর্ত্তুজা মদ্যপান করিতেন; তাঁহার বুজুর্গী বা অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাঁহার ভাষা এরূপ প্রাঞ্জল ও সুললিত পদ গুলিকে সহসা উত্তর পশ্চিম দেশবাসী মুসলমান ফকীরের রচিত বলিয়া বুঝা যায় না। প্রতি সন রজব মাসে তাঁহার ছাপঘাটীর আস্তানায় ফকীরগণ আগমন করিয়া দরগায় পূজা করেন; তৎকালে একটী মেলারও অধিবেশন হয়। আনন্দময়ী তাঁহার পার্শ্বে সমাধিস্থ হন; সকলে উভয় সমাধির প্রতিই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। মর্ত্তুজার পরিণীতা স্ত্রীর নাম নেজাম বিবি; তাহার গর্ভে মর্ত্তুজার চারিটী পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্মে। বালিঘাট-নিবাসী সৈয়দ কাসেমের সহিত তাঁহার আসিয়া নাম্নী কন্যার বিবাহ হয়। কাসেম ১১৫৫ হিজরী বা ১৪৭২ খ্রীঃ অঃ বালিয়াঘাটায় একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। তাহা অদ্যাপি তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।"

আমাদের আবিষ্কৃত পদগুলির মধ্যে একটীও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে প্রচলিত নাই। এই মুর্শিদাবাদবাসী এক কবির কীর্ত্তি সেই প্রাচীন কালে বহুদূরবর্ত্তী চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত হইল না, ইহা আমাদের নিকট বড়ই বিচিত্র বলিয়া অনুমিত হয়। যাহা হোক্ এক্ষণে আমরা পাঠকবর্গকে মর্ত্তুজার একটী পদ শুনাইব।

বেনাবলী।

শ্যাম বন্ধু চিত নিবারণ তুমি।

কোন শুভ দিনে, দেখা তোর সনে

পাশরিতে নারি আমি॥ ধু।

যখন দেখিয়ে, ও চান্দবদনে

ধৈরজ ধরিতে নারি।

অভাগীর প্রাণ, করে আন্ চান্
দণ্ডে দশবার মরি॥
মোরে কর দয়া, দেহ পদছায়া
শুনহ পরাণ কানু।
কুল শীল সব, ভাসাইনু জলে
প্রাণ না রহে তোমা বিনু॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে, কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া, রহিল তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি॥

বৈষ্ণব পদকর্ত্তৃগণের মধ্যে চণ্ডীদাস যেমন আত্মহারা প্রেমিক কবি, সহজ সরল ভাষায় পূর্ণ আবেগে হৃদয়ের রুদ্ধ উচ্ছ্বাস প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন, মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে সৈয়দ মর্ত্তুজাও তদ্রূপ প্রাঞ্জল ভাষায় মরমের কথাগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন। উভয়েই প্রেমিক এবং উভয়েরই অধিকাংশ পদ রাধা ভাবে লিখিত। সৈয়দ মর্ত্তুজার পদাবলী পাঠকালে অনেক সময়েই আমার মনে হয়, আমি যেন চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঠ করিতেছি। পূর্ব্বোক্ত পদটী পাঠকালে কি পাঠকগণের চণ্ডীদাসের ভাব-সম্মিলনের সেই অমিয়-মাখা পদগুলি স্মৃতি-পথে উদিত হয় না?

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে, জীবনে মরণে, প্রাণ বন্ধু হইও তুমি॥
অনেক পুণ্যফলে, গৌরী আরাধিয়ে, পেয়েছি কামনা করি।
না জানি কি ক্ষণে, দেখা তব সনে, তেঞি সে পরাণে মরি॥
বড় শুভক্ষণে, তোমা হেন ধনে, বিধি মিলাওল আনি।
পরাণ হইতে, শত শত গুণে, অধিক করিয়া মানি। ইত্যাদি।

৬। নাছির মহম্মদ। নসির মামুদ ও নাছির মহম্মদ, এই দুই নামেই কতিপয় পদাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য কল্পনা করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। উচ্চারণ ভেদেই এইরূপ নামাভেদ হইয়াছে। নাছির মহম্মদ চট্টগ্রামের কবি, তাঁহার অধিকাংশ পদই তদঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি 'ফাজিল' উপাধিধারী এবং 'এতিম' বা পিতৃ মাতৃ

হীন ছিলেন। সাহ আফজল নামক জনৈক মহাত্মা তদীয় পীর বা দীক্ষা-গুরু ছিলেন।

৭। সেরবাজ। প্রাচীন সাহিত্যে সেরচান্দ ও সেরবাজ নামে দুইজন কবি আছেন। কোন কোন পদে 'সেরবাজ' এবং কোন কোন পদে "সেরচান্দ" ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। সেরবাজের রচিত 'মল্লিকার হাজার সওয়াল' নামক একখানি পুঁথিরও অস্তিত্ব জানা গিয়াছে। তাহাতে সৈয়দ বাজী, মীর হাছন সরিপ এবং বদিউদ্দিন প্রমুখ মহাত্মাগণের নামোল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাদের চরণে প্রণতি করিয়াছেন।

৮। সৈয়দ নাছিরদ্দিন। নাছিরদ্দিনের একটী মাত্র বৈষ্ণব পদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত সাহিত্য-রাজ্যে তাঁহার অপর কোন ধনসম্পত্তি আছে কিনা, জানিতে পারি নাই। কবির উক্ত পদটী হইতে সাহ আবদুল্লা নামক এক ব্যক্তিকে তদীয় পীর বলিয়া জানা যায়।

৯। ফকির আবদুল ওহাব। ফকির ওহাব চট্টগ্রাম জেলার হাওলা গ্রামে বাস করিতেন। ১৮৯৮ অব্দে হাওলাবাসী শ্রীমান্ আবদুল গফ্ফার নামক শ্রীযুক্ত আবদুল করিম ছাহেবের জনৈক ছাত্র হইতে ওহাবের পদগুলি পাওয়া গিয়াছে। ছাত্রটি করিম ছাহেবকে কবি সম্বন্ধে ঐরূপ কথাই বলিয়াছিলেন।

১০। বক্সা আলী। বক্সা আলীর একটীমাত্র পদ পাইয়াছি, তাহাও সম্পূর্ণ নহে। তিনি চট্টগ্রাম—বাঁশখালী থানার অন্তর্গত 'ভিঙ্গরোল' নামক গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা মোহাম্মদ হারি পণ্ডিতও একজন কবি ছিলেন। 'জৈগুণের বার মাস' এবং মেহের নেগারের বারমাস, নামধেয় দুইটী সন্দর্ভ হারি পণ্ডিতের রচিত। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি ধরাতলে অবতীর্ণ হন। ১১৭৪ মঘী সন পর্য্যন্ত বক্সা আলী জীবিত ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তার কিছুদিন পরেই তিনি গতায়ু হইয়াছিলেন। শোনা যায়, তিনি ও তদীয় পিতা উভয়েই দীর্ঘজীবী ছিলেন। বর্ত্তমানকালে বক্সা আলীর পৌত্র বিদ্যমান আছে।

১১। সাহ বদিয়ুদ্দিন। চট্টগ্রাম—পটিয়া থানার অন্তর্গত 'বাহুলী' নামক গ্রামে সাহ বদিয়ুদ্দিন প্রাদুর্ভূত হন। তিনি তত্রত্য 'খোন্দকার ও কাজী' বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 'ফাতেমারছুরৎ নামা'ও 'চিপ্তইমান' নামক তাঁহার রচিত দুইখানি বাঙ্গালা গ্রন্থও পাওয়া গিয়াছে। তৎপুত্র আমান সাহকাজী

একজন বিখ্যাত ও ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তদীয় বর্ত্তমান বংশীয়েরা কবির প্রপৌত্র বলিয়া কথিত হয়েন।

১২। কমর আলী।* কমর আলী বহু পদাবলী এবং 'রাধার সম্বাদ—ঋতুর বার মাস' নামক একটী নিবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আলীরাজা ভিন্ন আর কোনও মুসলমান বৈষ্ণব কবিই তাঁহার সমান পদ প্রণয়ন করেন নাই। দুঃখের বিষয়, তাঁহার পদাবলীতে সংখ্যার আধিক্য থাকিলেও গুণের আধিক্য বাহুল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। তাহা হইলেও তাঁহাকে কবি বলিয়া আমাদের সমাদর না করিবার হেতু নাই। তাঁহাকে একজন প্রকৃত 'পল্লী-কবি' বলা যাইতে পারে।

কমর আলী চট্টগ্রাম-পটীয়া থানার অন্তঃপাতী করুলডেঙ্গা গ্রামে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। সাধারণ্যে তিনি 'কমর আলী পণ্ডিত' নামে পরিচিত ছিলেন। অদ্যাপি লোকে ঐ নামেই তদ্বংশীয়দের বাটীর নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। চাম্পা গাজীর ন্যায় তিনিও এতদ্দেশীয় হাড়িদিগকে সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার যে জ্ঞান ছিল, একথা বলাই বাহুল্য। অদ্যাপি তাঁহার বংশ বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমান বংশধরেরা তাঁহার প্রপৌত্র বলিয়া কথিত হন।

১৩। মির্জা ফয়জুল্লা। প্রাচীন সাহিত্যে সেখ ফয়জুল্লা, মির্জা ফয়জুল্লা এবং মির্জা কাঙ্গালী নামে তিনজন কবির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথমোক্তের 'গোরক্ষ-বিজয়' নামক এক প্রাচীন ঐতিহাসিক কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি যে আমাদের আবিষ্কৃত পদকর্ত্তা নহেন, তাহা সেখ ও মির্জা উপাধির বিভিন্নতা হইতেই স্পষ্ট প্রতায়মান হইতেছে। সুতরাং মির্জা ফয়জুল্লাই আমাদের আলোচ্য। কিন্তু কোনও কোন পদে মির্জা কাঙ্গালী ভণিতিও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বংশবাচী উপাধির সাদৃশ্য থাকিলেও তাঁহারা অভিন্ন ব্যক্তি কিনা, তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। এইমাত্র বলা যায় যে, মির্জা কাঙ্গালীর যে একটী পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা মির্জা ফয়জুল্লারই ছাঁচে ঢালা। 'কাঙ্গালী' শব্দ উঠাইয়া দিয়া তৎস্থলে 'ফয়জুল্লা' শব্দ সন্নিবেশিত করিলে, রচনা প্রণালী দেখিয়া তাঁহাদের কোন বিভিন্নতা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে না। কেহ কেহ মনে করেন যে, কাঙ্গালী শব্দ দৈন্যবাচক; প্রকৃত পক্ষে উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি। এ কথায় বিশেষ সন্দেহের উদ্রেক না

* এই নামের অপর এক মুসলমান কবির এক নামহীন বাঙ্গালা পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হইবারই সম্ভাবনা। ফলতঃ আমরা তাঁহাদিগকে অভিন্ন বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।

১৪। সৈয়দ সুলতান। কবি সুলতানের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও তাঁহাকে চট্টগ্রাম জেলাবাসী বলিয়া ধরিয়া লইতে কোনই আপত্তি নাই। তাঁহার রচিত বহুল মুসলমানী গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে হজরত মোহাম্মদ চরিত, সবে মেহেরাজ, জ্ঞানপ্রদীপ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভূতপূর্ব্ব 'আলো' সম্পাদক ৺নলিনীকান্ত সেন বি-এ মহোদয় চট্টগ্রাম হাইস্কুলের মিরেশ্বরী-নিবাসী জনৈক ছাত্র হইতে প্রথমোক্ত গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নলিনী বাবু একখণ্ড কাগজে স্বহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন ;—"ইহা তাহার (ঐ ছাত্রের) পিতামহের রচনা।" কথাগুলিতে কিছুমাত্র সত্য নিহিত থাকিলেও, সৈয়দ সুলতানকে উক্ত ছাত্রের পিতামহ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কারণ তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায় আধুনিক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয় ; কিন্তু তদীয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি গুলি বহুদিনেরই পুরাতন। যাহা হোক্, ঐ কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে গেলে সৈয়দ সুলতানকে উক্ত ছাত্রের পিতামহ না বলিয়া আরও ঊর্দ্ধতন পুরুষ বলিয়াই ধরা সঙ্গত।

১৫। শাহ আকবর। * শাহ আকবর ভণিতিযুক্ত একটী মাত্র পদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা অনেকে ভুবনবিখ্যাত সম্রাট্ আকবরের রচিত বলিয়া অনুমান করেন। সম্রাট্ নাকি সভক্ত শ্রীচৈতন্যদেবের হরি সঙ্কীর্ত্তন চিত্র দৃষ্টে বিহ্বল হইয়া এই পদটী রচনা করিয়াছিলেন। সম্রাট্ আকবরের পরিচয় এস্থলে লিপিবদ্ধ করা অনাবশ্যক, আমরা উক্ত পদটী উদ্ধৃত করিলাম।

সুরট।

জীউ জীউ মেরে (১) মন-চোরা গোরা।
আপহিঁ নাচত আপন রসে ভোরা॥ ধু।
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া। (২)
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া॥ (২)

---

* মহম্মদ আকবর নামক কবি লিখিত 'জেরমুল্লুক স্যামারোখে'র এক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

(১) মেরে—মোর।

(২) 'ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়া,' 'লিকি লিকি লিকিয়া,'—পাঠান্তর।

পদ দুই চারি চলু (৩) নট নটিয়া। (৪)
থির নাহি হোয়ত (৫) আনন্দে মাতোয়ালিয়া॥ (৪)
ঐ পুন পহুঁকে যাহু (৬) বলিহারী।
শাহ আকবর তেরে (৭) প্রেম-ভিখারী॥

১৬। আলি রাজা। হিন্দু বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিতে যেমন সম্বন্ধ, মুসলমান বৈষ্ণব কবি সৈয়দ মর্ত্তুজা ও আলি রাজাতেও তেমনি সম্বন্ধ বলিয়া আমার মনে হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মুসলমান বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে সৈয়দ মর্ত্তুজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আলি রাজার আসন তাঁহার কত নিম্নে, তাহার বিচার-ভার পাঠকবর্গের উপরেই ন্যস্ত থাকিল। সৈয়দ মর্ত্তুজা প্রেমিক কবি;—তাঁহার ভাষা সরল ও প্রাসাদ-গুণ-বিশিষ্ট। তাঁহার রচনা অনেকটা চণ্ডীদাসের অদার্শে গঠিত;—সর্ব্বত্রই যেন স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে টলটলায়মান। আলি রাজা কেবল প্রেমিক নহেন, তিনি ভক্তও বটেন। তাঁহার ভাষা সর্ব্বত্র আড়ম্বর-বিহীন ও সহজভাবে মনোজ্ঞ নহে। তত্রাচ আমরা তাঁহাকে সুকবি বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে বাধ্য। সৈয়দ মর্ত্তুজার 'পরাণের ধন'—শ্রীকৃষ্ণ; আলিরাজা 'রাধাকানুচরণ' ভক্ত।

আলিরাজার অপর নাম—ওয়াহেদ কানু। সাধারণতঃ তিনি 'কানু ফকির' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার অধীন 'তশথাইন' নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দুই বিবাহ; প্রথমা পত্নীর গর্ভে এর্সদোল্লা মিঞা ও একাজোল্লা মিঞা এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে সর্কাতোল্লা মিঞা ভূমিষ্ঠ হন। প্রথমোক্ত পুত্রদ্বয় যথাক্রমে 'বড় মিঞা' ও 'ছোট মিঞা' নামে অভিহিত হইতেন। পিতার ন্যায় পুত্রগণও সুকবি ছিলেন। বড় মিঞার ও সর্কাতোল্লা মিঞার কতিপয় ফকিরী বা পারমার্থিক সংগীত পাওয়া যায়। সর্কাতোল্লা নিজেও ফকিরী অবলম্বন করিয়াছিলেন। তদীয় সংগীত সমূহ গভীর তত্ত্ব কথা পূর্ণ। পুত্রদ্বয় স্বীয় জনকের চরণ ধ্যানেই সংগীতগুলি রচনা করেন। ৮।১০ বৎসর হইল ৮০ বৎসর বয়সে সর্কাতোল্লা পরলোকগত হইয়াছেন। অবশিষ্ট পুত্রদ্বয় তাহারও বহু পূর্ব্বে নশ্বর জগতের লীলাখেলা

(৩) চলু—চলে।
(৪) 'নট নট নটিয়া,' 'মাতুলিয়া.'—পাঠান্তর।
(৫) হোয়ত—হইতেছে।
(৬) পহুঁকে—প্রভুকে। যাহু—যাই।
(৭) তেরে—তোমার।

সম্বরণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের পুত্র পৌত্রেরা জীবিত আছেন।

আলিরাজা ফকির হইলেও মোহাম্মদ মস্তফাকে মানিতেন এবং অপরাপর ফকিরদিগের ন্যায় বনচর না হইয়া অনাসক্ত ভাবে গৃহস্থাশ্রমই পালন করিতেন। তিনি সাহা কেরামদ্দিন নামক এক মহা জ্ঞানী পুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেও তাঁহারও অনেক শিষ্যভক্ত জুটিয়াছিল। আলিরাজা কেবল যে কতক গুলি অসংলগ্ন পদাবলী রচনা করিয়াই কবি-জীবন শেষ করিয়াছেন, তাহা নহে; অনেকগুলি দরবেশী গ্রন্থও তাঁহার লেখনী-মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে। কবির রচিত 'জ্ঞান সাগর' একখানি উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক ভাবময় গ্রন্থ; ইহাতে হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম্মভাবই সংমিশ্রিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'ধ্যান মালা' নামক সংগীত গ্রন্থ, 'সিরাজ কুলুপ' নামক দর্ব্বেশী গ্রন্থ, যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয় 'যোগ কালন্দর' এবং 'ষট্‌চক্রভেদ' নামক গ্রন্থ আলিরাজা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ ও বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়াও আলিরাজার দু'একটী শ্যামা সংগীত প্রচলিত আছে। কবির গুরুভক্তি অতি প্রশংসনীয়; তিনি প্রত্যেক গ্রন্থে ও অধিকাংশ পদেই পীর কেয়ামদ্দিনের বন্দনা করিয়াছেন। গ্রন্থ কয়খানি গুরুর চরণেই উৎসর্গীকৃত।

কবির একটী গান উদ্ধৃত করিলাম।—

তুড়ী।

হা হারে যৌবন, কি ফল জীবন
স্বামী যাকে নাহি চায়।
যত সুখ ভোগ, সব বিষ রোগ
বিফলে, কাল গোঁয়ায়॥ ধু।
কমলা (কোমল?) যে তনু, রূপে নব ভানু
বদন পূর্ণক শশী।
যে রূপে মোহিত, হৈল মোর চিত
সেকেলে না চাহে দাসী॥
ভুরু শরাসন, নয়ান খঞ্জন
বিম্বাধর জিনি রঙ্গ।
ত্রিলোক মোহিতা, ভুজ হেম লতা—
মুনি মন দেখি ভঙ্গ॥

আলি রাজা ভণে, নাহি ত্রিভুবনে
সে রূপ তুলনা আর।
পীন রূপ মূলে, বাঞ্ছি তিন কূলে
সিদ্ধি মূলে পূর্ণ সার ॥

অধিকাংশ প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় আলি রাজার জীবনেরও অতি সামান্য বিবরণ জানিয়াই আমাদিগকে তুষ্ট থাকিতে হইতেছে।

একটী মাত্র কবিতা পাঠে কোনও কবির কবি-প্রতিভা নির্ণয় করা যায় না। আলিরাজা সম্বন্ধেও আমরা এই কথা বলিতেছি। আমরা তদ্রচিত যে পদটী উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে পাঠকগণের হৃদয়ে কি ভাবের উদয় হইবে, জানি না। কিন্তু আমাদের স্থানাভাব প্রযুক্ত এক কবির একাধিক সংগীত উদ্ধৃত করিতে অক্ষম। এমন কি, বহু কবির একটী করিয়াও পদ উদ্ধৃত করিতে পারি না। ইহাতে পাঠকবর্গের রসভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিলেও আমরা নিরুপায়—সুতরাং ক্ষমার্হ।

১৭। সৈয়দ আলাওল। বন্ধুবার আবদুল করিম ছাহেব লিখিয়াছিলেন,—কবিশ্রেষ্ঠ সৈয়দ আলাওল সাহেব বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। তাঁহার সদৃশ লোক এই সমাজে অদ্যাপি আর জন্মপরিগ্রহ করেন নাই। মুসলমান জাতির মধ্যে ত তিনি মহাকবির স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন আছেনই; গুণ তুলনায় তাঁহার সমসাময়িক হিন্দু কবিকুলেও তাঁহার আসন অতি উচ্চে। আমরা নিম্নে সংক্ষেপে তাঁহার জীবন-কাহিনী বিবৃত করিলাম।

প্রাচীন গৌড় রাজ্যান্তর্গত ফতেয়াবাদ নামক নগরে মজলিস কুতুব নামক এক নরপতি শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। কবিবর আলাওলের পিতৃদেব এই রাজ্যের উজীর ছিলেন। আলাওল ফতেয়াবাদেই * জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রাপ্ত বয়সে রাজসরকারে এক উচ্চপদে অভিষিক্ত হন। একদা রাজনৈতিক কোন কার্য্য ব্যপদেশে এই পিতাপুত্রকে রোসাঙ্গ (আরাকান) যাইতে হয়। পথিমধ্যে কর্ণফুলী নদীবক্ষে হার্ম্মাদগণের (পর্ত্তুগীজ জল-দস্যু) দ্বারা আক্রান্ত হইলে, পিতা পুত্র উভয়ে আত্মরক্ষার্থ বহুক্ষণ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করেন। কিন্তু অবশেষে পিতা শেষ শয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, পুত্র আলা-

* এই ফতেয়াবাদকে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ভ্রমবশতঃ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত জালালাবাদ পরগণায় স্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ওল কোন প্রকারে পলায়নপর হইয়া আরাকানাধিপতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরাকান তৎকালে পরম ধার্ম্মিক, গুণগ্রাহী এবং কাব্যকলা-বিদগ্ধ বৌদ্ধ নরপতি শ্রীশচন্দ্র সুধর্ম্মা কর্ত্তৃক শাসিত হইত। গুণগ্রাহী রাজা আলাওলের কবি-প্রতিভা দর্শনে অতিশয় বিমোহিত হইয়া, পরম সমাদরে তাঁহাকে স্বরাজ্যে অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন। এইরূপে আলাওল রাজ্যের প্রধান সচিব মাগন ঠাকুর, সৈন্যাধ্যক্ষ সৈয়দ মহম্মদ খাঁ এবং শ্রীমন্ত সোলেমান, সৈয়দ মুছা, নবরাজ মজলিস প্রভৃতি সম্রান্ত রাজকর্ম্মচারীবৃন্দের বিশ্বাস ও প্রণয়ভাজন হন। অমাত্য-প্রধান মাগন ঠাকুরই আলাওলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; তাঁহারই অনুরোধে কবি 'পদ্মাবতী' 'সয়ফল মুল্লুক' ও 'বদিয়ুজ্জামাল' গ্রন্থ রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থ দু'খানি সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মাগন ঠাকুর পরলোক গমন করেন। এই শোচনীয় ঘটনায় কবি একেবারে ভগ্নমনোরথ হইয়া পড়েন এবং কাব্যালোচনা পরিত্যাগ করতঃ নয় বৎসর কাল নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন। এই সময় সম্রাট ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া তদীয় সহোদর সুলতান শাহসুজা ১৬৬০ অব্দে রোসাঙ্গাধিপতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু অচিরেই উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। তাহার ফলে আরাকানাধিপতি কর্ত্তৃক শাহসুজা সপরিবারে সানুচর নিহত হন এবং মার্জ্জা নামক এক দুর্বৃত্তের প্ররোচনায় বহু নিরপরাধ ব্যক্তি রোসাঙ্গের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। কবি আলাওলও কঠোর কারাক্লেশ সহ্য করিতে বাধ্য হন, কিন্তু পঞ্চাশ দিবস পরেই সৈয়দমুছা প্রভৃতি তদীয় হিতৈষীগণের চেষ্টায় বিমুক্ত হন।

কারামুক্ত হওয়ার পর আলাওল সেনাপতি সৈয়দ মুছার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আরব্ধ 'সয়ফলমুল্লুকে' এবং 'বদিয়ুজ্জামাল' পরিসমাপ্ত এবং শ্রীমন্ত ছোলেমানের আদেশে 'তউফা', নবরাজ মজলিসের আদেশে 'সেকান্দর নামা' এবং সৈয়দ মহম্মদ খাঁর আদেশে 'হস্তনয়কর' রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমন্তের আদেশে দৌলত কাজীর আরব্ধ অসমাপ্ত 'সতী ময়না ও গোরচন্দ্রানী' গ্রন্থ খানিও কবি এই সময় সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থসমূহ রচনার অবসর কালে আলাওল বহুতর বৈষ্ণব ও পরমার্থিক সুললিত পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। এ সমুদয় রচনা সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যেই আরব্ধ ও সমাপ্ত হইয়াছিল। আলাওল শাহসুজার অল্পদিন পূর্ব্বে রোসাঙ্গে গমন করেন এবং তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৩০।৩৫ বৎসর অনুমান করা যাইতে পারে। সে হিসাবে

অনুমান ১৬২৪।১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্মকাল স্থির করা অসঙ্গত বিবেচিত হইবে না।

আলাওলের সমগ্র পদাবলী এখনও উদ্ধার হয় নাই। যে কয়টী আমরা উদ্ধার করিয়াছি, তাহা হইতেই তাঁহার প্রতিভার পরিমাপ করা যাইতে পারে। আমরা এস্থলে একটীমাত্র পদ উদ্ধৃত করিলাম।—

গুর্জ্জরী ভাটীয়াল।

কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে লো নাগর কানাই রে,
শ্যাম,কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে ? ধু।
দক্ষিণে নাচএ ভুরু, সঘনে কম্পএ উরু,
পাপিনী সাপিনী হৈল বাম।
আভাবে(১) পড়িল বাধা, মুই কলঙ্কিনী রাধা,
না জানি কি হয় পরিণাম॥
মুই যদি জানিতুম্ বাটে, কানাইয়া যমুনার ঘাটে,
ত' (২) কেনে ভরিতে আইলুম্ জল।
কৈয়াছিল গুরুজনে, সে কথা না ছিল মনে,
পাইলাম তার প্রতিফল॥
জঙ্গম মেঘের আড়ে, যুগল খঞ্জন নাচে,
তা দেখিয়া পড়ি গেলুম ভোলে।
হেন কভু না দেখিছি, লোক মুখে না শুনিছি,
হেন পক্ষী আছএ গোকুলে॥
বংশী বটের তলে, ছায়া নাহি সুশোভিত,
তাতে বসিতে না লয় মন।
অরুণ কিরণ তাপে, মু'খানি শুকাই যাবে,
ক্ষুধাএ আঁখি অরুণ বরণ॥
কহে হীন আলাওলে, কেনে আইলুম্ তরুতলে,
নয়ানে নয়ানে হইল দেখা।
এক ধারা পন্থখানি, দুইধারা হইতে নারি,
শ্যাম গায়ে লাগিয়াছে ধাকা (৩)॥

(১) 'আভাবে না হইয়া 'প্রভাতে' হইত কিনা, বলিতে পারি না।
(২) ত—তবে
(৩) ধাকা—ধাক্কা।

চট্টগ্রাম জেলায় সুলতানপুর নামক গ্রামে 'আলাওলের বংশ' নামে পরিচিত এক বংশের খবর পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা কোন্ আলাওলের, তাহা নিঃসন্দেহে বলা দুরূহ। "পদ্মাবতী"র প্রকাশক ৺ সেখ হামিদুল্লা সাহেব, সৈয়দ নুরদ্দিন নামধেয় আলাওলের এক পুত্রের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার এই উক্তির সত্যতা বিশেষ প্রমাণ সাপেক্ষ। চট্টগ্রাম সদর হইতে ৮ মাইল উত্তরে 'পশ্চিম জোবরা' নামক গ্রামে 'আলাওলের দীঘি' নামে এক প্রকাণ্ড জলাশয় আছে; এবং দীঘির উত্তর পারের বহির্ভাগে ইষ্টক-নির্ম্মিত এক মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়। পরে তদ্দেশবাসীরা সেই স্থানেই আবার মৃত্তিকা নির্ম্মিত এক মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ উক্ত মসজিদ ও দীঘিকে কবি আলাওলের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। দুঃখের বিষয়, ইচ্ছা সত্বেও আমরা এসব বিষয়ের আজও প্রকৃত তথ্যাবিষ্কারে সক্ষম হই নাই। বলা বাহুল্য যে, আলাওল আদৌ গৌড় দেশীয় হইলেও তাঁহার জীবন চট্টগ্রামেই ব্যয়িত হইয়াছিল।" *

১৮। সৈয়দ আইনদ্দিন।

১৯। এবাদোল্লা।

২০। মোহন আলী।

২১। মহম্মদ হানিফ।

২২। আলিমদ্দিন।

২৩। আবদুল আলী।

২৪। সের চান্দ। †

২৫। আবাল ফকির ‡

২৬। সাহাবদি উদ্দীন। §

২৭। মির্জা কাঙ্গালী।

২৮। মহম্মদ আলী।

---

* মৎসম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' ৩য় খণ্ড।

† সেরতনু নামে এক প্রাচীন মুসলমান বাঙ্গালা লেখকের সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁহার গ্রন্থের নাম—ফতেমার ছুরৎনামা।

‡ বালক ফকির নামে অপর এক মুসলমনে কবি ছিলেন।

§ চিন্ত ইমান প্রণেতা কাজি বদিউদ্দীন নামে আর এক প্রাচীন মুসলমান কবির বিষয় জানা গিয়াছে।

২৯। সালবেগ।

৩০। আমান।

৩১। আফজল আলী।

৩২। ছলামিঞা।

৩৩। গয়াজ।

৩৪। সমসের।

৩৫। লালবেগ।

৩৬। সেখ ফতন (পোতন)।

৩৭। সেখ ভিখন।

৩৮। ফকির হবিব।

৩৯। কবীর।*

৪০। সেখ লাল।

৪১। পীর মহাম্মদ।

৪২। মনোহর।

৪৩। হাসমত আলী।

৪৪। সৈয়দ আবছল্লা।

৪৫। বোকো।

৪৬। আকবর আলী।

১৮—৪৬ সংখ্যা কবিগণের সম্বন্ধে আমরা কিছুমাত্র জানিতে সক্ষম হই নাই; কেবল মাত্র তাঁহাদের রচিত পদাবলী তাঁহাদের পূর্ব্বতন অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রাচীন কবিগণ সাহিত্য-সংসারে একান্ত কুহেলিকাচ্ছন্ন। প্রসিদ্ধ কবিগণের জীবনী বিষয়েই যখন আমাদের গবেষণার হল অল্প পরিমাণও প্রবেশের সুবিধা পায় না, তখন এই গ্রাম্য কবিগণের বিষয়ে আর কি বলিব? তাঁহাদের জীবনী জানিবার অভিলাষ করা, আর অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ প্রায় একই কথা। কেবল একটী বিষয় তাঁহাদের পদাবলী পাঠে অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহাদের অধিকাংশই যে পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তিরোধানের পর আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহই নাই। সালবেগ, ফতন, ভিখন, আকবর, হবিব, কবীর, এবং সেখলাল প্রভৃতি কবিগণের পদাবলী চট্টগ্রাম প্রভৃতি পূর্ব্ব বাঙ্গালায়

* রঙ্গমালা-গ্রন্থ প্রণেতা 'কবীর মহম্মদ' এবং বৈষ্ণব পদকর্ত্তা 'কবীর' এক ব্যক্তি নহেন।

অপ্রচলিত বিধায় তাঁহাদিগকে তদঞ্চলবাসী বলিতে সাহস হয় না। আমাদের উল্লিখিত বৈষ্ণব কবিগণের অধিকাংশেরই নাম সাহিত্য-জগতে এই প্রথম বিশ্রুত হইয়াছে। তাঁহাদের পদাবলী প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি হইতে সঙ্কলন করিতে হইয়াছে।

বৈষ্ণব কবিতা-রচয়িতার ন্যায় শাক্ত-সংগীত-রচয়িতার অস্তিত্বও প্রাচীন সাহিত্য-ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর কবিগণ, যথা—

সৈয়দ জাফর।

আলি রাজা।

শেষোক্ত কবির শাক্ত সংগীত হইতে বৈষ্ণব সংগীতের সংখ্যাই সমধিক, তদ্ধেতু আমরা তাঁহাকে বৈষ্ণব কবির তালিকায় গ্রহণ করিয়াছি।

বৈষ্ণব সাহিত্যের যে অংশের পরিচয় প্রদান করিলাম, তাহা পাঠ করতঃ অনেকে বলিবেন যে—ইহা এক নিশ্বাসে 'রামায়ণ বা মহাভারত কীর্ত্তন" বই আর কি? কিন্তু যিনি আমাদের নিষ্ঠুর সম্পাদক মহাশয়ের আদেশের বিষয় অবগত আছেন, তিনি আর এ দীন লেখককে অনুযোগ করিবেন না। প্রবন্ধের বাহুল্য ভয়ে আমাকে অতি সংক্ষেপে লেখনী সঞ্চালন করিতে হইয়াছে। 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' চারি খণ্ড দেখিলে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

শালবেগ, ফতন, সেখ ভিখন, ফকির হবিব, কবীর, সেখলাল ও আকবর আলীর পদগুলি 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কবিগণের পদাবলী চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত থাকা দেখা যায় না। সুতরাং তাঁহারা যে পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছিলেন না, তাহা একরূপ নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।

বৈষ্ণব সমাজেও মনোহর নামা এক পদকর্ত্তার পরিচয় পাওয়া যায়; তিনি 'পদসমুদ্র' ও 'নির্য্যয়তত্ত্বের' সংগ্রহকার। 'দিনমণি-চন্দ্রোদয়' নামক একখানি গ্রন্থও তাঁহার রচিত বলিয়া শোনা যায়। কিন্তু তিনিও আমাদের আলোচ্য মুসলমান কবি মনোহর এক ব্যক্তি বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না; কারণ উভয়ের রচনা-রীতি বিভিন্ন এবং মুসলমান কবির পদাবলী সাধারণতঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলেই সুপ্রচলিত।

শাহ আকবর ও আকবর আলীও অভিন্ন ব্যক্তি নহে। ইঁহাদের রচনা-রীতির একটী সম্পূর্ণ পৃথক ধারারই পরিচায়ক। ইঁহাদের উভয়েরই একটি

করিয়া পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত কবি যদি ভুবন-বিখ্যাত সম্রাট না হয়, তবে উভয়কেই উত্তর-পশ্চিম বঙ্গবাসী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রতি বৎসরেই আমরা দুই একটী করিয়া নূতন মুসলমান বৈষ্ণব কবির অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতেছি। তাহাতে আশা হয়, আগামী বারে সভ্যগণের সম্মুখে আরও কতিপয় নূতন কবির পরিচয় ও কীর্ত্তি প্রকাশ করিতে সক্ষম হইব।

মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণের প্রেমসংগীত,হিন্দু মুসলমান এতদুভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অপূর্ব্ব সেতুবন্ধন। হিন্দুগণ দরগায় ভক্তি করিতেন, রোজা করিতেন, সিন্নি দিতেন। মুসলমানগণ হিন্দুর পর্ব্বোপলক্ষে প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতেন। সুদীর্ঘ কালে এতদুভয় সম্প্রদায় এক বৃক্ষের দুই শাখার ন্যায় মিশিয়া গিয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে তাহার অক্ষয় প্রমাণ। ভগবান করুন, এই মিলন চিরস্থায়ী হউক, খ্রীষ্টধর্ম্ম যাজকদিগের ন্যায় আমিও বলি "ঈশ্বর যাহাদিগকে একত্রিত করিয়াছেন, মানুষ তাহাদিগকে বিভক্ত করিতে পারে না।"

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

বিজ্ঞান শিক্ষার আবশ্যকতা।

এই সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিত হয়, ইহাতে এক অতীব দুঃখের কথা। সে দেশ কেমন, যে দেশে এই বিষয় বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা আবশ্যক হয়? যিনি বিজ্ঞানের পদে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই সর্ব্বত্যাগী জ্ঞানযোগী আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এই সভার সভাপতি। তাঁহার মূর্ত্তি, তাঁহার উপস্থিতি, এ বিষয়ে জাতীয় জীবনে যে মহাশক্তি সঞ্চার করিবে, তাহার পর আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। কিন্তু আপনারা ইহাকে পঠিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এ নিমিত্ত আপনাদিগকে সহস্র সাধুবাদ দিতেছি।

মানব জীবনে ইহকাল ও পরকাল, এই দুইটী লক্ষ্য রাখিতে হয়। মূল উদ্দেশ্য বন্ধ-মুক্তি, তাই পরকালই অগ্রগণ্য। ইহকাল তাহার সাধন-সময় মাত্র। মুক্তি এক জন্মের সাধ্য নহে; জন্মজন্মান্তরের সাধনার ফল। ভূ-লোকে মৃত্যু হইবার পর, এই লোকেই অথবা অন্য লোকেও জন্ম হইতে পারে। এই রূপে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর পর মুক্তি। জন্ম-মৃত্যুর কারণ, কর্ম্মফল-ভোগ। ইহলোকে এরূপ কর্ম্ম করিতে হয়, যাহাতে পরলোকে ক্রমে মুক্তির অধিকারী হওয়া যায়। এইরূপ কর্ম্মের নামই ধর্ম্মসাধন। তাহা হইতেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা, তাহা হইতেই মুক্তি।

যে রুগ্ন, যে দুশ্চিন্তায় মগ্ন, যাহার দেহে ও মনে শান্তি নাই, তাহার কি ধর্ম্ম-সাধন সম্ভব? কখনই না। দেহকে সুস্থ ও সবল রাখা চাই; তাহা না হইলে ধর্ম্ম-সাধন হইতেই পারে না। ইহাইতো কর্ম্ম। কিন্তু এ সকল বিজ্ঞান অনুশীলন ভিন্ন সম্পূর্ণ অসম্ভব। দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা, দেহের স্বাস্থ্যবিধান, উপযুক্ত আহার সংগ্রহ, ধনোপার্জ্জন, সু-সন্তান লাভ ও বংশ-বৃদ্ধি —এক কথায় জগতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, এমন কি জগতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলেও, বিজ্ঞানালোচনা নিতান্ত অপরিহার্য্য। শারীর-তত্ত্ব— জীব-তত্ত্ব, বস্তু-তত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব, শক্তি-তত্ত্ব সকলই বিশেষ ভাবে আলোচ্য। * এ সকলের আলোচনা ব্যতীত বর্ত্তমান যুগে জীবন-সগ্রামে জয়ী হইবার

---

* Ray Lankester, Kingdom of Man, P, 52·

উপায়ান্তর নাই। জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমেরই জয় হয়; অপরে নির্ম্মূল হইয়া যায়। যে জাতি একথা বিস্মৃত হইবে, জগতে তাহার স্থান হইবে না।

শিল্প, বাণিজ্য, কৃষী, ধনাগমের প্রধান উপায়। এ সকল উচ্চ বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত অনুষ্ঠিত হইতে পারে না; হইলেও বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। সম্প্রতি আমেরিকা দেশে ৩/ তিন বিঘা জমি হইতে বার্ষিক ১২০০৲ টাকা উৎপন্ন হইয়াছে! পক্ষী-ব্যবসায়ীগণ এক জোড়া পক্ষী হইতে সপরিবারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে! বস্তু-তত্ত্ব ও জীব-তত্ত্ব আলোচনা ব্যতীত এ যুগে আর বাঁচিবারই আশা করা যায় না। উন্নতি করিবার আশা তো বাতুলতার নামান্তর মাত্র। তাই, বিজ্ঞান আমাদিগের প্রধান আলোচ্য বিষয়। বিজ্ঞানের সাহায্যে ধনে বংশে বাড়িয়া উঠিতে হয়। শুদ্ধ ধনে নহে, বিজ্ঞানবলে মানব ভবিষ্যৎ বংশেও বিস্তৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। প্রথমে সমৃদ্ধি, পরে শান্তি। প্রকৃত বিজ্ঞানানুশীলনের ঐহিক ফল।

আর পারত্রিক? বলিয়াছি, মানব-জীবনের উদ্দেশ্যই মুক্তি। ইহা ভগবদ্-জ্ঞান সাপেক্ষ; কিন্তু ভগবদ্‌জ্ঞান লাভের উপায় কি? ভগবানকে চিনিব কেমন করিয়া? অনেকেই বলিবেন, এ বড় কঠিন কথা। কিন্তু তাঁহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি যে,তাঁহারা আমাকে চিনেন কেমন করিয়া? আমার কথা শুনিয়া, আমার কার্য্য দেখিয়া, আমার কথায় কার্য্যে মিলাইয়া। ইহাই তো আমাকে চিনিবার উপায়। ভগবান্‌কে চিনিবার উপায়ও ইহাই। একই পথ। অন্যবিধ পথ কল্পনা করিয়া ভীত হইবার কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই। বেদ, বাইবেল, কোরান, জেন্দাবেস্তা প্রভৃতি তাঁহার বাক্য, ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার কার্য্য। তাই ঐ সকল ভগবদ্‌বাক্য শুনিতে হইবে, বুঝিতে হইবে, উহার মর্ম্ম আত্মসাৎ করিতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ধূলিকণা হইতে মানব পর্য্যন্ত সকলই বুঝিতে হইবে; কারণ, তাঁহার কার্য্য না বুঝিলে তাঁহাকে বুঝা যাইবে না। ব্রহ্মাণ্ড বুঝিবার প্রথম চেষ্টা বিজ্ঞানালোচনা। জড়তত্ত্ব, জীব-তত্ত্ব, শক্তি-তত্ত্ব, শান্তি-তত্ত্ব, এ সকলের আলোচনাই ব্রহ্মাণ্ড বুঝিবার প্রধান সহায়। জগৎরূপ কার্য্য বুঝিলে ভগবদ্‌বাক্য আরও বিশদ-রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। এ নিমিত্ত বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা, শিক্ষার্থীকে ক্রমে ভগবদ্‌জ্ঞানের অধিকারী করে। তাই বিজ্ঞান আলোচনা পরকালের সহায়। বেদাদি শাস্ত্রের সহিত বিজ্ঞানের সমন্বয় করিতে হয়; নচেৎ ভক্তিহীন বৈজ্ঞানিক বিপথগামী হইয়া যায়।

... থাকুক, ... ইহকাল, পরকাল ... জানা জাবার নাই বলিলেই হয়। তাই আপনাদিগকে ... গঠিত করিতে হইবে। আর হাসি-তামাসা আমোদ-প্রমোদ লইয়া, উপভোগ করিয়া, কাল কাটাইবার সময় নাই। ও সকল দিকে প্রবৃত্তি ... সংযত করিতে হইবে। ও সকলও বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচিত হইতে ...; ও-সকলও জাতীয় উন্নতির সহায় হইতে পাবে। সেই ভাবে অনুষ্ঠিত হউক। যিনি যে বিষয়ের আলোচনা করিবেন, মানবের দেহ-মনের কল্যাণ সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য হউক; মানুষের ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ সাধনই তাঁহার লক্ষ্য হউক। ক্ষণিক উত্তেজনার পর অনন্ত অবসাদ যেন আমাদিগকে গ্রাস না করে। লক্ষ্য হৃদয়ে চির প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া একাগ্র যত্নে দেহপাত করিতে হইবে, নচেৎ সিদ্ধির আশা সফল হইবে না। জ্ঞান ও কর্ম্ম লইয়া সিদ্ধিকে আকর্ষণ করিতে হইবে। ঈশোপনিষৎ বলেন,—

"জ্ঞান কর্ম্ম উভয় সাধনে, কর্ম্মে মৃত্যু পার হয়ে

জ্ঞানে অমৃতত্ব লাভ হয় অসংশয়ে *

কেবল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করিলেই হইবে, তাহা নহে। তদনুসারে কর্ম্ম করিতে হইবে। এ কথা ধর্ম্ম-জগতেও যেমন, সত্য কর্ম্ম জগতেও তেমনই সত্য। এ কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে, তদ্ভিন্ন গত্যন্তর নাই; অলমতি বিস্তারেন।

শ্রীশশধর রায়।

* উপনিষদ গ্রন্থাবলী পৃঃ ১১৩।

বাঙ্গালীতত্ত্ব

বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে বাঙ্গালীতত্ত্ব আলোচনা শুরু করিবার আগে মানবতত্ত্ব (Anthropology) বা মানবজাতিতত্ত্বের (Ethnology) উদ্দেশ্য ও প্রণালী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া লইব। মানবতত্ত্বের দুইটী প্রধান শাখা,—একশাখা আকৃতিতত্ত্ব (Physical anthropology) এবং অপরশাখা সমাজতত্ত্ব (Social anthropology)। আকৃতিতত্ত্বের উদ্দেশ্য মানবদেহের বংশানুসারী স্থায়ী লক্ষণগুলির প্রভেদানুসারে মানবমণ্ডলীকে বিভিন্ন আকৃতিতে (variety বা race) বিভাগ এবং বিভিন্ন আকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয়।

আকৃতি বিভাগের প্রধান অবলম্বন দেহের লক্ষণ। মানবতত্ত্ববিদেরা দেহের ও কেশের বর্ণ, দেহের দৈর্ঘ্য, নাসিকার আকার এবং মাথার খুলির আকার অনুসারে আকৃতি করিয়া থাকেন। দেহের বর্ণানুসারে মানবমণ্ডলী নিগ্রো বা কৃষ্ণাঙ্গ, মোঙ্গলীয় বা হরিৎ অঙ্গ এবং তদতিরিক্ত ককেশীয়, এই তিন প্রধান আকৃতিতে বিভক্ত হয়। ককেশীয় আকৃতি আবার দুইটী শাখায় বিভক্ত। প্রথম শাখা শ্বেতবর্ণ, হরিৎ কেশ এবং পিঙ্গল চক্ষু বিশিষ্ট (Xanthochroi), দ্বিতীয় শাখা নানাবর্ণ, কৃষ্ণকেশ, এবং কৃষ্ণচক্ষুবিশিষ্ট (Melanochroi)।

মোটামোটী মহাদেশভেদে এইরূপ আকৃতিক বিভাগ সঙ্গত হইলেও দেশ-বিশেষের অধিবাসিগণকে সূক্ষ্মতর ভাবে বিভাগ করিতে গেলে পূর্ব্বোক্ত দৈহিক লক্ষণগুলি আকৃতিক জাতিভেদের প্রমাণরূপে গ্রহণীয় কিনা, সন্দেহ স্থল। কারণ এই সকল লক্ষণের অধিকাংশই এবং কাহারও কাহারও মতে সকল-গুলিই পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু একটী লক্ষণ, করোটির আকারকে অধিকাংশ মানবতত্ত্ববিদ্‌ই বংশানুক্রমে স্থিতিশীল বলিয়া স্বীকার করেন। আকৃতিক জাতি বিভাগের জন্য করোটির আকার করোটির অনুপাতের দ্বারা (Cephalic index) প্রকাশিত হয়।* করোটির [illegible]

---

* কেলিপার নামক বাটালির আকার যন্ত্রের দ্বারা মস্তক মাপিতে হয়। [illegible] এই যন্ত্রের দ্বারা বড়চোঙের ব্যাস মাপিয়া থাকেন। [illegible] হইতে মস্তকের [illegible] সর্ব্বোচ্চ অংশ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য লইতে হয়। কর্ণদ্বয়ের উপরিভাগে মস্তকের সর্ব্বোচ্চ [illegible] [illegible] মাপিতে হয়।

[illegible]

[illegible] হিন্দুদের [illegible] মিশিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাহারা [illegible] করেন, তাহারা প্রায়ই; এখনও চৌদ্দশত বৎসর পূর্ব্বে [illegible]-বর্ণিত [illegible] শবর যুবার ন্যায় "অবনাট ন্যাসিকং" নিম্ন স্থূলনাসা, "চিপিটবিবরং", [illegible], "চিকিনচিবুকম্" [illegible]। দ্রাবিড় এবং মুণ্ডাগণ [illegible] করোটি বিশিষ্ট।

[illegible] অনুসারে ভারতীয় ককেশীয়ের তৃতীয় বিভাগ সংস্কৃতমূলক বা [illegible]মূলক ভাষাভাষী আর্য্যগণ। এখানে বলা আবশ্যক, এক সময়ে মানব-[illegible]বিদেরা মনে করিতেন, আর্য্য নামে একটা স্বতন্ত্র আকৃতি আছে। কিন্তু এখন [illegible] এরূপ অনুমান ভ্রমজনক বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর্য্য শব্দে এখন এক শ্রেণীর ভাষা এবং বেদ, অবেস্তা ও হোমর-বর্ণিত [illegible]রূপ সভ্যতার নামমাত্রে ব্যবহৃত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আর্য্য শব্দ ভাষা এবং [illegible] অর্থে ব্যবহৃত হইবে। এখন জিজ্ঞাস্য, ভারতীয় আর্য্যগণ একই আকৃতির অন্তর্ভুক্ত কি না।

আমরা স্কুলপাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছি [illegible] আর্য্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরা আর্য্যবংশীয় এবং শূদ্রগণ অনার্য্য আদিম অধিবাসিগণের সন্তান। নেসফিল্ড সাহেব প্রথমতঃ এই মতের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হয়েন। তিনি বলেন, ব্রাহ্মণে শূদ্রে দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণে মেথরেও এখন এমন কোন আকারগত প্রভেদ নাই, যাহাতে [illegible] দুই পৃথক্ আকৃতির সামিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। নেসফিল্ডের এই অভিনব মতের পরীক্ষার জন্য সার হার্বার্ট রিসলী বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন জাতির মস্তক, নাসিকা, এবং দীর্ঘ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাপিতে আরম্ভ করেন। এই [illegible] ফলে তিনি ভারতীয় আর্য্যগণকে পাঁচটী বিভিন্ন আকৃতিতে বিভাগ করিয়াছেন।

সার হার্বার্ট রিসলির প্রথম বিভাগ কাশ্মীর, পঞ্জাব, এবং রাজপুতানার অধিবাসিগণকে লইয়া। এই বিভাগের নাম দিয়াছেন তিনি "হিন্দু আর্য্য আকৃতি।" যুক্ত আগ্রা এবং অযোধ্যা প্রদেশের এবং বিহারের অধিবাসিগণকে লইয়া দ্বিতীয় বিভাগ গঠিত। এই বিভাগের নাম "আর্য্য-দ্রাবিড়" সঙ্কর। এই দুই বিভাগের যে কিছু প্রভেদ, শরীরের দৈর্ঘ্য এবং নাসিকার আকারগত। [illegible] করোটির আকার উভয়তই একরূপ। উক্ত বিভাগেই দীর্ঘকরোটি বিশিষ্ট।

[illegible]

[illegible] গুজরাটের [illegible]

[illegible] এই উভয় প্রদেশের [illegible] করোটি [illegible] সংখ্যা গ্রহণ করিলে, গুজরাটী নাগর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শতকরা [illegible] দীর্ঘ করোটি, ৩৯ জন মধ্যম করোটি এবং ৫৮ জন প্রশস্ত করোটি। গুজরাটী এবং মারাঠিগণের মধ্যে যে অংশ দীর্ঘ করোটি, তাহা যে আর্য্য[illegible] [illegible], এ বিষয়ে আর সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, প্রশস্ত করোটি অংশ আসিল কোথা হইতে? রিসলি সাহেবের উত্তর, খ্রীষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দ অবধি খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দ পর্য্যন্ত প্রশস্ত করোটি জাতি-নিচয়ের কেন্দ্রস্থল মধ্য এসিয়া হইতে যে সকল আক্রমণকারিরা আসিয়া ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং যাহাদিগকে সচরাচর সিথিয় নামে অভিহিত করা হয়, গুজরাতী এবং মারাঠিগণের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রশস্তকরোটি অংশ তাহাদেরই বংশধর।

কিন্তু এরূপ অনুমান সমসাময়িক শিলালিপি প্রভৃতি হইতে লব্ধ ঐতিহাসিক প্রমাণের সম্পূর্ণ বিরোধী। ভারত ইতিহাসের যে যুগকে সিথিয় আক্রমণের যুগ বলা যাইতে পারে, সেই যুগে ক্রমান্বয়ে শক, কুষাণ এবং হূণ, এই তিন জাতীয় আক্রমণকারী ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শকেরা মহারাষ্ট্র প্রদেশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্ধ্র বংশীয় রাজাগণ তাহাদের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুষাণ এবং হূণগণ কখন মহারাষ্ট্রের সীমান্তে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং মারাঠাগণের মধ্যে অধিকাংশ ভাগ সিথিয় এরূপ অনুমান কষ্টকল্পনা মাত্র। গুজরাতের কথা কিছু স্বতন্ত্র। গুজরাত অনেক দিন পর্য্যন্ত শকজাতীয় ক্ষত্রপ বা মহাক্ষত্রপ রাজগণের শাসনাধীনে ছিল এবং হূণদিগের জ্ঞাতি গুর্জ্জরদিগের নাম হইতেই প্রাচীন লাটদেশের নাম গুজরাত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কাশ্মীর, পঞ্জাব এবং মথুরায় যে পরিমাণ শক, কুষাণ এবং হূণ আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তার চেয়ে বেশী পরিমাণ শক এবং গুর্জ্জর গুজরাতে প্রবেশ করিয়াছিল, এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। কুষাণ-আধিপত্য মথুরার পূর্ব্বদিকে অনেক দূরে, হয়ত পাটনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এত শক, কুষাণ এবং হূণ আসিয়া মিলিত হওয়া সত্বেও কাশ্মীর, পঞ্জাব এবং মথুরার অধিবাসীরা যেমন দীর্ঘকরোটি তেমন দীর্ঘকরোটিই রহিয়া গিয়াছেন, অথচ শক এবং গুর্জ্জরেরা গুজরাতিগণকে প্রায় প্রশস্ত করোটি করিয়া তুলিয়াছেন, এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত নহে। [illegible]

[illegible] হইয়া [illegible]

[illegible] হইয়া পড়িয়াছেন, [illegible] আলপাইনের সহ [illegible]

সকল দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

গুজরাত এবং মহারাষ্ট্রের পরই মাদ্রাজ এবং [illegible]। এই দুই প্রদেশের

অধিবাসীদিগের মধ্যে কতকাংশ দ্রাবিড়, কতকাংশ মধ্যশ্রেণীর এবং কতকাংশ

মারাঠা। তাহার পরেই বিহার, উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা। এই তিন প্রদেশে প্রশস্ত

করোটিই বেশী, তবে গুজরাত বা মহারাষ্ট্রের মত তত বেশী নহে এবং [illegible]

বাঙ্গালীরা গড়ে মধ্যমকরোটি। রিস্‌লি সাহেব কর্তৃক নমুনাস্বরূপ [illegible]

পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণের মধ্যে শতকরা ১৩ জন দীর্ঘকরোটি, ৫২ জন মধ্যম [illegible]

এবং ৩৫ জন প্রশস্ত করোটি। বাঙ্গালী, উড়িয়া এবং বিহারিগণের মধ্যে [illegible]

দীর্ঘ করোটি, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ দ্রাবিড় এবং কিয়দংশ মধ্যশ্রেণীর।

কিন্তু প্রশস্তকরোটি ভাগ কোথা হইতে আসিল, ইহাই অনুসন্ধানের বিষয়।

রিস্‌লি সাহেব বলেন, বাঙ্গালী এবং উড়িয়াগণ মোঙ্গল-দ্রাবিড় সঙ্কর [illegible]

ইহাদের মধ্যে যাহারা প্রশস্তকরোটি, তাহারা মোঙ্গলীয় বংশোদ্ভব। কিন্তু শুধু

প্রশস্ত করোটি দেখিয়াই কোন জাতিকে মোঙ্গলীয়দিগের জ্ঞাতি বলা যায় না।

মোঙ্গলীয়েরা অবশ্যই প্রশস্ত করোটি। কিন্তু প্রশস্তকরোটি মোঙ্গলীয়দিগের

বিশেষ লক্ষণ নহে, অথবা মোঙ্গলীয়দিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। পামির প্রদেশের

আর্য্য গালচাগণ, আর্মেনীয়াবাসিগণ, ইউরোপের রুশদেশবাসী স্লেভজাতি, আল্পস

পর্ব্বত ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের অধিবাসিগণ এবং কেণ্টগণ সকলেই প্রশস্ত

করোটি। মোঙ্গলীয়দিগের বিশেষ লক্ষণ অতিনিম্ন নাসিকার মূল, গণ্ডদেশের

অস্থি উচ্চ, শ্মশ্রুর অভাব বা অল্পতা এবং বঙ্কিম ছাঁদের নেত্র। বাঙ্গালী এবং

উড়িয়াগণের মধ্যে এ সকল লক্ষণ মোটেই দেখা যায় না। এই সকল লক্ষণের

অভাবসত্ত্বেও যদি বাঙ্গালিদিগকে মোঙ্গলীয়গণের জ্ঞাতি বলা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত

হয়, তবে বাঙ্গালীদিগকে আণ্ডামানবাসী নিগ্রিটো বা খর্ব্বকায় নিগ্রোগণের

জ্ঞাতি বলাও যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইতে পারে। কারণ আণ্ডামানবাসীরা [illegible]

সকলেই প্রশস্ত করোটি।

বাঙ্গালার ঠিক উত্তর এবং পূর্ব্ব সীমায় পার্ব্বত্য প্রদেশে মোঙ্গলীয় [illegible]

বাস এবং সীমান্তের প্রদেশ সমূহে বাঙ্গালী মোঙ্গল [illegible] [illegible]

[illegible] এরূপ [illegible] যে, সকল জাতি [illegible]

[illegible] তাহাদিগকে [illegible]

ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণে বাহ্যদেশের আর কোন প্রদেশের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু যে সময়ে ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচিত হয়, তখন বাহ্যদেশীয়েরা দক্ষিণ বিদর্ভ এবং পূর্ব্বদিকে পুণ্ড্র বা উত্তর বঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ এই দুই জনপদের নামই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় (৭।৩৪; ৭।৩১)। ঐতরেয় আরণ্যকের "বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ" (২।১।১) বাক্যের "বঙ্গা" পদ অনেকে বঙ্গদেশ অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং বাহ্যদেশীয় আগন্তুকেরা বৈদিক যুগের শেষ ভাগে যে বাঙ্গালাদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। বৈদিক যুগের পর সংস্কৃত সাহিত্যে সূত্রযুগ। পাণিনি ব্যাকরণ সূত্রযুগের অতি পুরাতন গ্রন্থ। পাণিনি সিন্ধু, সৌবীর, কচ্ছ এবং কলিঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং পাণিনি ব্যাকরণ রচনার পূর্ব্বেই আগন্তুকেরা পশ্চিমে গুজরাত এবং পূর্ব্বে উড়িষ্যা অধিকার করিয়াছিলেন। পাণিনি ইহার দক্ষিণে স্থিত কোন জনপদের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু বার্ত্তিককার কাত্যায়ন মাহিষ্মৎ, পাণ্ড্য এবং চোল দেশের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বেই বাহ্যদেশীয়েরা সমগ্র বাহ্যদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সূত্রযুগের আরম্ভে বা তাহার কিছু পরেই হয়ত বৈদিক সভ্যতা বাহ্যদেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তথাপি মধ্য দেশীয়েরা জাতীয় বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের ন্যায় পরবর্ত্তী স্মৃতি শাস্ত্রেও বাহ্যদেশী বিদ্বেষের বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। বীরমিত্রোদয় নামক নিবন্ধে বৌধায়নের নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

"আনর্ত্তকারস্করাঃ সুরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথঃ।
উপাবৃৎ সিন্ধুসৌবীরা এতে সঙ্কীর্ণযোনয়ঃ॥

অর্থাৎ ... কলিঙ্গ ... চ গত্বা পুনঃ- ... সর্বপৃষ্ঠয়া বা। ...।

... [illegible]
... [illegible]

[illegible] বাঙ্গদেশের [illegible]

[illegible] আগন্তুকগণের পূর্ব্বপুরুষেরা পামির নিবাসী হইতে আকাঙ্ক্ষা [illegible]র নাই, নিজেরাই আর্য্য ছিলেন। আর একপদ অগ্রসর হইলেই [illegible] মানবতত্ত্বের কঠোরতম সমস্যার সম্মুখীন হই। সে সমস্যা এই, আর্য্যের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রশস্ত করোটি ছিলেন, কি দীর্ঘকরোটি ছিলেন। এ সমস্যার অদ্যাবধি কোন মীমাংসা হয় নাই এবং কখনও যে হইবে, তাহারও আশা নাই। সুতরাং এস্থলে উহার আলোচনা অনাবশ্যক।

বাঙ্গালী ও বাঙ্গালীর সভ্যতা।

এ যাবৎ আমরা সাধারণভাবে বাঙ্গালী এবং বাহ্যদেশীয় আকৃতিক জাতির অপরাপর বিভাগের উৎপত্তির বিষয় আলোচনা করিয়াছি, এখন বিশেষভাবে বাঙ্গালীর এবং বাঙ্গালীর সভ্যতার উৎপত্তি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। পূর্ব্বেই এইরূপ সূচিত হইয়াছে, পূর্ব্বদিকে বাহ্যদেশীয়গণের প্রাচীনতম উপনিবেশ মগধ ও অঙ্গ হইতেই বাহ্যদেশীয়েরা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপ সিদ্ধান্তের অনুকূলে ভাষাগত এবং জনশ্রুতিমূলক বিশেষ প্রমাণেরও অভাব নাই। ভাষাতত্ত্ববিদেরা স্থিরতররূপে নিরূপণ করিয়াছেন, বর্ত্তমান বাঙ্গালা, উড়িয়া এবং বিহারী ভাষা প্রাচীন মাগধী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন। সুতরাং বিহারী, উড়িয়া এবং বাঙ্গালীদিগের ভাষাগত সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট।

প্রাচীন জনশ্রুতি হইতে জানিতে পারি, বিহারী, উড়িয়া এবং বাঙ্গালী একই বংশোদ্ভব। দীর্ঘতমা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের কয়েকটি সূক্তের ঋষি। ইঁহার একটি সূক্তের একটি ঋকে (১৫৮।৫) তিনি বলিতেছেন, দাসেরা তাঁহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছে। শৌনক বৃহদ্দেবতায় (৪।২১—২৫) এই ঋকের বিবরণ বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, দীর্ঘতমা নদীস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অঙ্গরাজ্যের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অঙ্গদেশের রাজা পুত্রকামনায় ঋষির নিকট উশিজ নামী দাসীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উশিজের গর্ভে কক্ষীবান্ ঋষির জন্ম হইয়াছিল। দীর্ঘতমার উপাখ্যান মহাভারতের আদিপর্ব্বে আরও বিস্তৃত এবং পরিবর্ত্তিত আকারে বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাভারতীয় উপাখ্যান অনুসারে দীর্ঘতমা যখন গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলেন, তখন বলি নামক একজন রাজা তাঁহাকে তুলিয়া আনিয়াছিলেন। [illegible]

[illegible]

দ্বিতীয়তঃ—উল্লেখ [illegible] আলোচনা [illegible] তন্ত্রধর্ম্ম অতি প্রাচীন এবং বৈদিকের [illegible] সমবয়সী। সভ্যাসভ্য [illegible] জাতির ধর্ম্ম তুলনায় আলোচনা করিলে ধর্ম্মানুষ্ঠানের তিনটী পৃথক স্তর [illegible] হয়। প্রথম স্তরের অনুষ্ঠান ভয় অথবা বিদ্বেষ প্রসূত, এবং শত্রুনাশ, [illegible] দেবতার ক্রোধশান্তি এবং রোগাদি উপশমের জন্য অনুষ্ঠিত। এই স্তরকে আমি তামস স্তর বলিব। দ্বিতীয় স্তরের অনুষ্ঠান ভোগ লালসা প্রসূত এবং পুত্র, ধন, এবং স্বর্গাদি কামনায় অনুষ্ঠিত। এই দ্বিতীয় স্তরকে আমরা রাজস স্তর বলিতে পারি। এবং তৃতীয় স্তর মোক্ষ লাভের জন্য জ্ঞান ভক্তির [illegible] এই তৃতীয় স্তরকে সাত্ত্বিক স্তর বলা যাইতে পারে। বৈদিক ধর্ম্মে এই তিনটী স্তরই বিদ্যমান। অথর্ব্ব বেদবিহিত অনেক অনুষ্ঠানই তামস স্তরের। পাকসংস্থা, হবিঃ সংস্থা, এবং সোমসংস্থা, এই তিন প্রকার যাগযজ্ঞ বৈদিক ধর্ম্মের রাজস স্তর। এবং উপনিষদ বিহিত জ্ঞানকাণ্ড বৈদিক ধর্ম্মের সাত্ত্বিক স্তর। বর্ত্তমানে বিদ্যমান অতি অসভ্য জাতির মধ্যে তামস স্তরের অনুষ্ঠানই শুধু দৃষ্ট হয়। সুতরাং তামস অনুষ্ঠান জ্ঞানকাণ্ডের প্রাচীনতম স্তর বলিয়া বিবেচিত হয়। তন্ত্র শাস্ত্রে পাশাপাশি তামসিক, রাজসিক, এবং সাত্ত্বিক, এই তিন স্তরের অনুষ্ঠানই বিহিত আছে। সুতরাং তান্ত্রিক ধর্ম্ম যে একটী অতি প্রাচীন মৌলিক ধর্ম্ম, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ—বৈদিক এবং তান্ত্রিক, এই উভয় ধর্ম্মবিহিত উপাস্য [illegible] তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই দুই ধর্ম্ম দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতির এবং কাজে কাজেই বিভিন্ন আকৃতির জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে ইন্দ্র, অগ্নি, মরুৎগণ, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি পুরুষরূপী নৈসর্গিক শক্তি বা দেবতার প্রাধান্য। তন্ত্রে কালী, তারা প্রভৃতি স্ত্রীরূপিণী নৈসর্গিক শক্তি বা দেবতার প্রাধান্য। বেদে স্রষ্টার নাম প্রজাপতি; তন্ত্রে স্রষ্টার নাম [illegible] মায়া বা আদ্যাশক্তি। এরূপ প্রভেদ যে, উপাসকের প্রকৃতি এবং জাতি [illegible] মূলক, এ তথ্যটী ১৯০৭ সালের ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের মানবতত্ত্ব শাখার [illegible] ডি, জি, হোগার্থ সাহেব তাঁর বক্তৃতায় অতি সুন্দর রূপে প্রতিপাদন [illegible] গিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে সংক্ষেপে তাঁহার উক্তি উদ্ধার [illegible] উল্লেখ সিদ্ধ হইবে। [illegible]

[illegible] হোগার্থ বলেন, ভূমধ্যসাগরের চতুর্দ্দিকস্থ ভূভাগে [illegible] [illegible] নিকট [illegible]

[illegible]
[illegible] ধর্মে দেবী-প্রাধান্ত লক্ষিত হয়। মেরী উপাসকেরা শুদ্ধ খ্রীষ্ট
ধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকিলেও দেবী ভক্তি ছাড়িতে পারেন নাই, প্রাচীন দেবীর
স্থানে খ্রীষ্ট জননী মেরীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। হোগার্থ লিখিয়াছেন, তিনি
মেরীর এমন উপাসকও দেখিয়াছেন, যাহারা মেরী যে খ্রীষ্টের জননী, তাহা
আদবে জানে না। জাতি বিশেষের ধর্মে দেবী-প্রাধান্তের কারণরূপে, হোগার্থ
বলেন, যে সকল জাতি স্বভাবত শান্তিপ্রিয় এবং মৃগয়া ও যুদ্ধাদি ব্যাপারে
অনুরাগবিহীন, তাহাদের সমাজে সাংসারিক বিষয়ে স্ত্রীলোকেরই প্রাধান্ত দৃষ্ট
হয়। এবং গৃহে ও সমাজে স্ত্রী প্রাধান্তে অভ্যস্ত লোকের পক্ষে জগৎ স্রষ্টা
এবং জগৎপাতাকে জগৎমাতারূপে কল্পনা করাই স্বভাবসিদ্ধ। এইরূপ কারণেই
হয়ত বাহ্যদেশীয়গণের মধ্যে তন্ত্রবিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। মধ্যদেশীয় এবং
বাহ্যদেশীয়েরা যে দুটী বিভিন্ন আকৃতিক জাতির অন্তর্ভূত, তান্ত্রিক এবং বৈদিক
ধর্মের এরূপ মৌলিক প্রভেদ তাহার একটী আনুষঙ্গিক প্রমাণ।

ধর্ম যেমন হিন্দু সভ্যতার প্রাণ, বর্ণভেদ সেই প্রাণের আশ্রয়ভূত দেহ।
বর্ণভেদ বাঙ্গালীর নিজস্ব নহে। উহা মধ্যদেশে উৎপন্ন হইয়া বাহ্যদেশে এবং
দ্রাবিড় মণ্ডলে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং বর্ণভেদের মূলানুসন্ধান
করিতে হইলে মধ্যদেশের সামাজিক ইতিহাস আলোচ্য। সেরূপ আলোচনা
এই প্রবন্ধে অসম্ভব। বর্ণভেদ বা চাতুর্বর্ণ্য সমাজ গঠনের ভাব অবশ্যই মধ্যদেশ
হইতেই আসিয়াছিল। কিন্তু জাতীয় বিদ্বেষ এবং স্মৃতি শাস্ত্রের বাধা অতিক্রম
করিয়া সদলবলে মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা আসিয়া যে বাঙ্গালাদেশে
বা বাহ্যদেশে বা বাহ্যদেশের অপর কোন প্রদেশে চাতুর্বর্ণ্য সমাজের প্রতিষ্ঠা
করিয়াছিল, এরূপ সম্ভবপর নহে। বাহ্যদেশে স্থানীয় উপাদান লইয়াই চতুর্বর্ণ
গঠিত হইয়াছিল।

এরূপ সিদ্ধান্ত যে শুধু স্মৃতির শাস্ত্রের নিষেধ বাক্যের উপর গঠিত, এরূপ
নহে। জনপ্রকৃতি এবং আকৃতি তত্ত্ব ইহার অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।
আমি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি আলোচনা করিয়া একথা সপ্রমাণ করিব।
বর্তমান বাঙ্গালী ব্রাহ্মণে এবং যুক্তপ্রদেশীয় ব্রাহ্মণে করোটির [illegible]
প্রভেদ অনেক। সার হার্বার্ট রিসলির পরিমিত ১০০ যুক্তপ্রদেশীয় ব্রাহ্মণের
মধ্যে করোটীর [illegible] (দীর্ঘ); এবং ইহাদের মধ্যে [illegible] জন
[illegible]

[illegible] ব্রাহ্মণের গড় করোটির অনুপাত ৭৯ (মধ্যম), এবং [illegible] মধ্যে [illegible] জন দীর্ঘ, ৫২ জন মধ্যম, এবং ৩৫ জন প্রশস্ত করোটি। পশ্চিম [illegible] [illegible] জন ব্রাহ্মণের গড় অনুপাত ৭৮.২ (মধ্যম)। পক্ষান্তরে করোটির [illegible] [illegible] হিসাবে যুক্তপ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বাঙ্গালার কায়স্থ এবং [illegible] (চণ্ডালের) সহিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ঘনিষ্টতা অনেক বেশী। রিস্‌লি সাহেবের পরিমিত ৬৭ জন চণ্ডালের গড় করোটির অনুপাত ৭৮.১ এবং ১০০ কায়স্থের গড় অনুপাত ৭৮.২। *

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণোৎপত্তি সম্বন্ধে হরিবংশে এবং পুরাণে পরিলক্ষিত জনশ্রুতি, স্মৃতি এবং আকৃতি তত্ত্বের প্রমাণের অনুকূল। হরিবংশে পূর্ব্বোক্ত বলিরাজার

---

* সাহিত্য-সম্মিলনের রাজসাহী অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পঠিত হইবার পরে আমি কতিপয় বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া বাঙ্গালার এবং যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর কতক ব্রাহ্মণের মাথা মাপিয়াছি। আমাদের পরিমাপের ফল সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল। এতন্মধ্যে রাজসাহী বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত মাতাদীন শুক্ল মহাশয় কাণপুর জিলার অন্তর্গত নিজের গ্রাম হইতে ৬৩ জন কাণ্যকুব্জ ব্রাহ্মণের মাথা মাপিয়া আনিয়া দিয়াছেন এবং অপরাপর ব্রাহ্মণের মস্তক প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু শশধর রায় এবং রাজসাহী কলেজের বিজ্ঞান-শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র গাঙ্গুলীর সহিত মিলিত হইয়া আমি রাজসাহী সহরে মাপিয়াছি।

সংখ্যা।	ব্রাহ্মণের শ্রেণী ও নিবাস।	গড়করোটির অনুপাত।	শতকরা দীর্ঘকরোটি।	শতকরা মধ্যমকরোটি।	শতকরা প্রশস্ত করোটি।
৬৬।	বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ	৭৮.৭	১৬	৪৭	৩৭
৩৫।	রাঢ়িব্রাহ্মণ	৭৮.৩	২০	৪৩	৩৭
১০।	পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ	৭৯.১	১০	৫০	৪০
৬৩।	কাণ্যকুব্জ ব্রাহ্মণ	৭২.৮	৬৪	৩০	৬
২১।	নানাশ্রেণীর যুক্ত প্রদেশীয় ব্রাহ্মণ	৭৩.১	৬৬	৩৩	০
	রিস্‌লি সাহেবের পরিমিত।				
[illegible]	পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ	৭৯.০	১৩	৫২	৩৫
[illegible]	যুক্ত প্রদেশীয় ব্রাহ্মণ	৭৩.১	৭৪	২৪	২

[illegible] দেখা গিয়াছে, তাহাতে রিসলির এবং আমাদের গড় এবং অনুপাত প্রায় [illegible] [illegible] আবশ্যক বোধ করি নাই।

বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। এবং তাঁহার পাঁচ পুত্র সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে (১।৩১)—

"পুত্রানুৎপাদয়ামাস পঞ্চ বংশকরাণ্ ভুবি।
অঙ্গঃ প্রথমতো জজ্ঞে বঙ্গঃ সুহ্মস্তথৈবচ॥
পুণ্ড্রঃ কলিঙ্গশ্চ তথা বালেয়ং ক্ষত্রমুচ্যতে।
বালেয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব তস্য বংশকরা ভুবি॥"

ব্রহ্মা বলিকে বর প্রদান করিলেন—

"চতুরো নিয়তান্ বর্ণাংস্তঞ্চ স্থাপয়িতেতিহ॥"

বলির পুত্রগণ সম্বন্ধে বায়ু পুরাণে (৩৭।২৭) কথিত হইয়াছে—

"পুত্রানুৎপাদয়ামাস চাতুর্ব্বর্ণ্য করান্ ভুবি॥"

এই প্রসঙ্গে মৎস্য পুরাণেও অনুরূপ বচন দৃষ্ট হয়। এই সকল পৌরাণিক বচনের ভিতরে ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। এই সকল বচন হইতে প্রমাণিত হইতেছে, হরিবংশ এবং পুরাণের রচনার সময় লোকের বিশ্বাস ছিল, বিহার, বাঙ্গালা এবং উড়িষ্যার ব্রাহ্মণ স্থানীয় উপাদানে গঠিত এবং ঐ সকল দেশের ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ একই বংশোদ্ভব। পুরাণকারেরা বাহ্যদেশীয় ব্রাহ্মণগণকে বাহ্যদেশজ বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। ইঁহাদিগকে বর্জ্জনের বিধানও করিয়া গিয়াছেন। যথা—হেমাদ্রি কর্তৃক শ্রাদ্ধকল্পে ধৃত সৌরপুরাণের বচন—

"অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গাংশ্চ সৌরাষ্ট্রান্ গুর্জরাং স্তথা।
আভীরান্ কৌঙ্কণাং শ্চৈব দ্রাবিড়ান্ দক্ষিণা পথান্।
আবন্ত্যান্ মাগধাং শ্চৈব ব্রাহ্মণাংস্তু বিবর্জয়েৎ॥"

দিল্লীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশস্থ গৌড় ব্রাহ্মণ নামক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ হইতেও বঙ্গের আদিম ব্রাহ্মণগণের বিষয় অবগত হওয়া যায়। ১৮৯১ সালের সেন্সাস্ অনুসারে যুক্তপ্রদেশে তখন ৪,১৪,০৪২ জন গৌড় ব্রাহ্মণ ছিল। বিহারেও গৌড় ব্রাহ্মণ আছে। ইঁহারা বলেন, বাঙ্গালার রাজধানী গৌড়নগর ইহাদের আদিবাসস্থান ছিল। পরে কাহারও কাহারও মতে পাণ্ডবগণের সময়ে,কাহারও কাহারও মতে আগরবাল বণিকগণের আদি পুরুষ রাজা আগরসেনের আমন্ত্রণে গৌড় ব্রাহ্মণেরা যাইয়া দিল্লীর নিকটে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। গৌড়ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবগণের বা আগরসেনের সময়ে বাঙ্গালা হইতে মধ্যদেশে গমন করিয়াছিলেন,একথা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য

নহে। কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গলা হইতে মধ্যদেশে ব্রাহ্মণ গমনের কিম্বদন্তী একেবারে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। তাহা হইলে এইরূপ কোন কিম্বদন্তীর উপরই আস্থা স্থাপন করা যায় না। আদিশূরাদি বাঙ্গালা দেশের রাজারা যেরূপ বৈদিকযজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য সময় সময় মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণ আনাইতেন, মধ্যদেশীয় রাজারাও সেইরূপ তান্ত্রিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানের জন্য বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ নেওয়াইয়াছেন।

এক্ষণে বাঙ্গালা দেশে বালেয় ব্রাহ্মণ অথবা গৌড়ব্রাহ্মণের চিহ্নমাত্রও নাই। অথচ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দে যে বাঙ্গলায় বিস্তর ব্রাহ্মণ ছিল, সে বিষয়ে অতি সন্তোষজনক প্রমাণ আছে। হর্ষচরিত-রচয়িতা বাণ সম্রাট হর্ষের সভাসদ ছিলেন। সম্রাট হর্ষ খ্রীষ্টাব্দের ৬০৭ হইতে ৬৪৮ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশকেই যে গৌড় বলিত, তাহার প্রমাণ হর্ষচরিতেই আছে। বাণ হর্ষের ভ্রাতৃহন্তা কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ককে "গৌড়েশ্বর গৌড়াধম" ইত্যাদিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। বাণ হর্ষচরিতের আরম্ভে লিখিয়াছেন—

"শ্লেষপ্রায়মুদীচ্যেষু প্রতীচ্যেম্বর্থমাত্রকম্।
উৎপ্রেক্ষা দাক্ষিণাত্যেষু গৌড়েম্বক্ষরডম্বর॥"

এস্থলে বাণ নামোল্লেখ দ্বারা গৌড়দেশকেই কেবল সম্মানিত করিয়াছেন। কাব্যাদর্শ-প্রণেতা দণ্ডী বাণেরও পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন রীতির রচনা সম্বন্ধে কাব্যাদর্শে লিখিয়াছেন—

"অস্ত্যেকনেকগিরাং মার্গঃ সূক্ষ্মভেদঃ পরস্পরম্।
তত্রবৈদর্ভ গৌড়ীয়ো বর্ণ্যেতে প্রস্ফুটান্তরৌ॥"

অন্যান্য অলঙ্কার গ্রন্থে পাঞ্চালী, লাটী, অবন্তিকা, এবং মাগধী নামক আরও চারিটী রীতির উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ সকল রীতির সহিত বৈদর্ভী রীতির বিশেষ প্রভেদ না থাকায় দণ্ডী স্বতন্ত্রভাবে উহাদের উল্লেখ করেন নাই। কেবলমাত্র গৌড়ী রীতিকেই স্বতন্ত্র উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন। দণ্ডী গৌড়ীয় লেখকদিগের রচনার যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায়—গৌড়ীয় লেখকেরা যথার্থই "অক্ষর ডম্বর" বা শব্দারম্বর প্রিয় ছিলেন। দুই একজন গৌড়ীয় কবি দুই একখানি কাব্য লিখিয়া অবশ্য ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যসেবকদিগের নিকটে রচনা বিষয়ে গৌড়ের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন না। খ্রীষ্টীয় সপ্তম এবং ষষ্ঠ শতাব্দে এবং তাহারও পূর্ব্বে

বাঙ্গালায় নিশ্চয়ই শব্দারম্বর-প্রিয় অনেক সংস্কৃত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে ব্রাহ্মণেরাই প্রধানত সংস্কৃত চর্চ্চা করিতেন। সুতরাং তখন বাঙ্গালায় বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙ্গালীরা যে শুধু সেকালের বাঙ্গালী কবিদিগের শব্দারম্বর পূর্ণ কাব্যগুলিই হারাইয়াছে, এমন নহে ; সে কালের ব্রাহ্মণদের স্মৃতিটুকুও প্রায় হারাইয়াছে। বাঙ্গালার পনের আনা ব্রাহ্মণই রাঢ়ি, বারেন্দ্র বা বৈদিক শ্রেণীভুক্ত। রাঢ়ি এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা বলেন, তাঁহারা আদিশূর আনীত পাঁচজন কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের বংশধর। আদিশূরের সময় নাকি বাঙ্গালায় মোটে ৭০০ অজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিল। সুতরাং আদিশূরের সময় কান্যকুব্জ এবং দেশীব্রাহ্মণের অনুপাত ছিল একদিকে ৫ এবং অপরদিকে ৭০০। আর বর্ত্তমানে ৫ জনের বংশে দেশব্যাপ্ত, ৭০০ এর বংশ প্রায় লুপ্ত। এ কথা বিশ্বাস করিতে গেলে ধরিয়া লইতে হয়, বাঙ্গালার বালেয় ব্রাহ্মণ বা গৌড় ব্রাহ্মণেরা নির্ব্বংশ হইয়াছে এবং সাতশতীদিগেরও অবস্থা প্রায় তদ্রূপ। থাকার মধ্যে আছে কেবল পাচ জন ব্রাহ্মণের এবং বৈদিকের বংশ। কিন্তু আকৃতিতত্ত্ব এবং সাহিত্য ও পুরাণে লব্ধ প্রমাণ এবং গৌড় ব্রাহ্মণগণের জনশ্রুতির একেবারে বিরোধী, এরূপ প্রবাদ কখনই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ মাত্রই বিদেশ, বিশেষত মধ্যদেশ হইতে আনীত আগন্তুক ব্রাহ্মণের সন্তান, এই মতের প্রমাণস্থল কুলগ্রন্থনিচয়। কিন্তু প্রামাণ্যতা বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক কালে রচিত কুলগ্রন্থ প্রাচীন শাস্ত্র, প্রাচীন সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের সমক্ষে দাঁড়াইতে পারে কি? অবশ্যই তাই বলিয়া আমি বলিতে চাই না, আদিশূর বা শ্যামলবর্ম্মার মত রাজারা মধ্যদেশ হইতে কখনও বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন নাই। আদিশূরের মত দুই একজন রাজা কেন, অনেক বাঙ্গালী রাজাই পাঁচ দশ পনের কেন, মধ্যদেশ হইতে সময় সময় শত শত ব্রাহ্মণ আনাইয়াছেন। পাঞ্জাবে যেরূপ শক, কুষাণ, হুণ প্রভৃতি আক্রমণকারীগণ পঞ্জাবীদিগের সহিত একেবারে মিশিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালায়ও তেমনি মধ্যদেশাগত ব্রাহ্মণগণ দেশজ ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া বাঙ্গালী আকৃতিতে পরিণত হইয়াছেন। শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

পরমাণুবাদ।

প্রাচীন আর্য্যগণের বিশ্বাস ছিল, সমস্ত জাগতিক পদার্থ পাঁচটী মূল পদার্থ বা পঞ্চভূতের সমবায়ে সৃষ্ট। ~অনুমান ১২০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বে কণাদ এই পঞ্চভূতের সংগঠন-প্রণালী উদ্ভেদ করিবার প্রয়াস পান। তাঁহার মতে প্রত্যেক ভূতকে বিভাগ করিতে করিতে এমন অনেকগুলি অতি সূক্ষ্ম ও অবিভাজ্য কণা পাওয়া যায়, যাহাদের সমষ্টিতেই সেই ভূতটী সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি সেই কণাগুলির নাম দিয়াছিলেন—'অণু'।

প্রাচীন গ্রীসে দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ চলিয়া আসিতেছিল। ডিমোক্রিটাস্ (খ্রীঃ পূঃ ৪৬০-৩৬০) পরমাণুবাদের প্রবর্ত্তন-কর্ত্তা; কিন্তু এরিষ্টটল (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২) এ কথা স্বীকার করেন না। ইঁহার মতে পদার্থকে যতদূর ইচ্ছা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ভাগ করা যাইতে পারে—অবিভাজ্য অণুর অস্তিত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যক নাই এবং এক মূল পদার্থ হইতে প্রক্রিয়া-বিশেষের সাহায্যে অন্য মূল পদার্থ পাওয়া যাইতে পারে। গ্রীক পদার্থ-বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে এরিষ্টটলের সম্মান সকলের অপেক্ষা উচ্চ ছিল, এইজন্য ইউরোপের মধ্যযুগে তাঁহার মতই সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল; আর সেইজন্যই বহুকাল ধরিয়া কত লোক লৌহ হইতে স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার জন্য সারা জীবন পরিশ্রম করিত।

এই সকল মতের মূল্য কতটুকু, সে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা। কেহ কেহ বলেন, যদি প্রাচীন আর্য্য ও গ্রীকগণ এ সকল আবিষ্কার করিয়াই গিয়াছেন, তাহা হইলে ড্যাল্টনের আর বাহাদুরী কি? আবার কেহ কেহ বলেন, প্রাচীনেরা অণু সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কল্পনা মাত্র। তাঁহারা আরও কত কি বলিয়া গিয়াছেন, তাহার বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা অনুমোদিত ও সংশোধিত না হইলে এই সকল কল্পনার মূল্য কি?

গ্রীকগণের পতনের সঙ্গে আরবগণ পশ্চিম ইউরোপে জ্ঞানচর্চ্চা আরম্ভ করেন। তাঁহাদের নিকট হইতে ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি জাতিগণ শিক্ষা করেন।

যদিও এরিষ্টটলের মতই সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তথাপি বেকন

(খ্রীঃ অঃ ১৫৬১-১৬২৬) নিউটন (খ্রীঃ অঃ ১৬৪২-১৭২৭) প্রভৃতি জনকয়েক চিন্তাশীল মনস্বী ব্যক্তি পরমাণুবাদের সপক্ষে ছিলেন।

সাধারণ লোকে ড্যাল্টনকে পরমাণুবাদের প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া জানে; কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পরমাণুবাদ তাঁহার পূর্ব্ব হইতেও পরিজ্ঞাত ছিল। বাস্তবিক ড্যাল্টনের লেখা দেখিলে অনুমান হয় যে, তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, সকলেই পরমাণুর কথা জানে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, তাহা হইলে ড্যাল্টন কিসের জন্য জগদ্বিখ্যাত হইলেন?

ড্যাল্টনের আবিষ্কারের কিছুকাল পূর্ব্বে, লাভোয়াসিয়ে (১৭৪৩-১৭৯৪) নামক একজন অসাধারণ ফরাসী রাসায়নিক সর্ব্বপ্রথম রসায়নী-বিদ্যায় পদার্থের ওজন সম্বন্ধে আলোচনার প্রবর্ত্তন করিয়া নব্য রসায়নী-বিদ্যার প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে কোন কোন মূল পদার্থ একত্র হইয়া একটী মিলিত পদার্থ প্রস্তুত হয়, ইহাই নির্দ্ধারিত হইত; কিন্তু এক পদার্থের কত ওজন অন্য পদার্থের আর কত ওজনের সহিত মিলিত হইয়া মিলিত পদার্থের কত ওজন উৎপন্ন করে, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে যত্ন করিতেন না। লাভো-য়াসিয়েই রসায়নী-বিদ্যায় তুলাদণ্ডের প্রচলন করেন। ক্রমশঃ অনেক বৈজ্ঞানিক ভিন্ন ভিন্ন মিলিত পদার্থের পরিমাণ-জ্ঞাপক বিশ্লেষণ (Quantitative Analysis) করিতে লাগিলেন। ড্যাল্টন এই সকল বৈজ্ঞ-নিকের এবং নিজের পরিশ্রমের ফল হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, যদি ১ভাগ 'ক' মূল পদার্থ আর ১ ভাগ 'খ' মূল পদার্থ একত্র হইয়া ২ভাগ 'গ' মূল পদার্থ উৎপন্ন করে, তাহা হইলে প্রত্যেক বারই এই নিয়মে মিলন-কার্য্য সম্পন্ন হইবে, কদাচ ইহার ব্যতিক্রম হইবে না। (নির্দ্দিষ্ট অনুপাতের নিয়ম)। তিনি আরও দেখাইলেন যে, যদি একটী মূল পদার্থ 'চ' ও 'ছ' এই দুই বিভিন্ন ভাগে আর একটী মূল পদার্থের সহিত মিলিয়া দুইটী মিলিত পদার্থের সৃষ্টি করে, তাহা হইলে 'ছ' 'চ'এর দ্বিগুণ ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ হইবে, কদাচ দেড়গুণ আড়াইগুণ বা ২¼ গুণ, এরূপ হইবে না (গুণিত অনু-পাতের নিয়ম)।

এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া ড্যাল্টনের মনে পরমাণুবাদই যথার্থ বলিয়া ধারণা জন্মিল। তিনি স্বকীয় অসাধারণ ধী-শক্তি প্রভাবে বুঝিতে পারিলেন, প্রত্যেক পরমাণুর একটী নির্দ্দিষ্ট ওজন আছে; সুতরাং যখন দুইটী

পরমাণু মিলিত একটী মিলিত পরমাণু সৃষ্টি করে (ড্যাল্টন অণু ও পরমাণুর পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই) তখন সেই মূল পদার্থদ্বয়ের ওজনের অনুপাত যে একই থাকিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? আবার, একটী মূল পদার্থের একটী, দুইটী বা ততোধিক পরমাণু, অন্য একটী মূল পদার্থের একটী পরমাণুর সহিত মিলিত হইতে পারে, এইজন্য প্রথমোক্ত মূল পদার্থের ওজনগুলির অনুপাত ১, ২, ৩ এইরূপ হইবে। যখন পরমাণুকে বিভাগ করা যায় না, তখন কোথা হইতে ১½ ২¼ প্রভৃতি অনুপাত আসিবে?

ড্যাল্টন বলিয়াছেন, প্রত্যেক পরমাণুর একটী নির্দ্দিষ্ট ওজন আছে; ইঁহার এই উক্তি হইতেই পরমাণুবাদ কল্পনারাজ্যের মধ্য হইতে একেবারে যন্ত্রাগারের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িল। ইহার পর হইতে বিভিন্ন মিলিত পদার্থের পরিমাণ-জ্ঞাপক বিশ্লেষণদ্বারা এই মতবাদটীকে মিলাইয়া লওয়া সম্ভবপর হইল। যাহা অনুমান (hypothesis) ছিল, তাহা জাগতিক নিয়ম (natural law) বলিয়া গণ্য হইল। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে বাস্তবিকই ড্যাল্টনকে পরমাণুবাদের প্রবর্ত্তয়িতা বলিতে ইচ্ছা করে। যে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই মতবাদ প্রথম প্রচারিত করেন, তাহা মানবের জ্ঞানরাজ্যে একটী স্মরণীয় বৎসর।

ড্যাল্টনের মস্তিষ্ক যেরূপ তীক্ষ্ণ ছিল, অঙ্গুলিগুলি সেরূপ সুনিপুণ ছিল না। তিনি পরিপাটীরূপে বিশ্লেষণ করিতে পারিতেন না—কাজেই তিনি পরমাণুবাদ প্রবর্ত্তন করিলেন মাত্র, উহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না। সে গৌরব-মুকুট আর একজন অদ্ভুতকর্ম্মা রাসায়নিকের শিরশোভা বর্দ্ধন করিল। তিনি সুইডেনবাসী বারজিলিয়স্ (১৭৭৯-১৮৪৮)।

সুইডেন একটী ধনহীন ক্ষুদ্র দেশ,—কিন্তু সুইডেন পুত্ররত্নে গরীয়সী। সুইডেনে অনেক খ্যাতনামা রাসায়নিকের জন্ম। জগদ্বিখ্যাত বারজিলিয়স্ তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট। বাগ্দেবতার সাধকের সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর বড় একটা বনিবনা থাকে না। বারজিলিয়সের ভাগ্যে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। যে সকল আশ্চর্য্য বিশ্লেষণ দ্বারা তিনি পরমাণুবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন, সে সমুদায় যে যন্ত্রাগারের মধ্যে সম্পাদিত হইত, তাহা অতি সামান্য রকমের দুইটী ক্ষুদ্র ঘরমাত্র। আজকাল লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে যে সমস্ত নানা যন্ত্র পরিস্থশোভিত, বিবিধ বোতলরাজি-বিমণ্ডিত, গ্যাস-তারিৎ-সম্বলিত যন্ত্রাগার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সঙ্গে সেই ঘর দুইটীর কোন মিল ছিল না।

ঘরের মধ্যে দুই তিনটি সাধারণ টেবিল, তাদের উপর অ্যাসিড্ প্রভৃতি গুটিকয়েক রাসায়নিকের নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য, কতকগুলি কাচের আসন, সামান্য যন্ত্র, দুই তিনটী উনান ও গুটিকয়েক তুলাদণ্ড এই লইয়া—সেই যন্ত্রাগার। এনা নামে একটী ঝি ছিল। সে সংসারের সকল কার্য্যের সঙ্গে এই যন্ত্রাগারের যন্ত্রগুলিও পরিষ্কার রাখিত। এইস্থানে বসিয়া অধ্যাপক বারজিলিয়স্ যে সমস্ত সুনিপুণ বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সমতুল্য কার্য্য বড় বড় যন্ত্রাগারেও অতি দুর্ল্ভ। বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে, আবিষ্কর্ত্তার মস্তিষ্কই হইতেছে আসল জিনিস—যন্ত্রাদি তাহার সহায়ক ভিন্ন ত আর কিছুই নহে। আবিষ্কর্ত্তা অনেক সময় নিজের ব্যবহারোপযোগী যন্ত্র নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়া লন, এইরূপে অনেক নূতন যন্ত্রের সৃষ্টি হয়।

ড্যাল্টন ভিন্ন ভিন্ন মূল পদার্থের পরমাণু বুঝাইবার জন্য এক এক প্রকার চিহ্নের উদ্ভাবন করেন। যেমন—
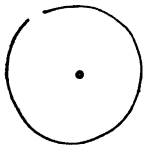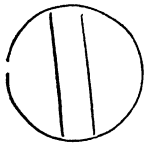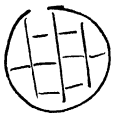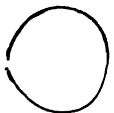
ড্যাল্টনের ধারণা অনুসারে এক পরমাণু উদ্জান এবং এক পরমাণু অম্ল-

জানের সম্মিলনে এক পরমাণু জলের উৎপত্তি হয়, তাই তিনি এক পরমাণু জল বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত সঙ্কেতটী ব্যবহার করিতেন ;—
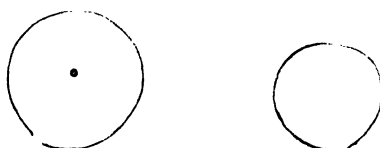
বারজিলিয়স্ এই প্রণালীর সংশোধন করিয়া মূল পদার্থগুলির নামের প্রথম অক্ষরগুলি ব্যবহার করেন। তাঁহার প্রণালী বাঙ্গালায় নিম্নোক্ত তালিকায় ব্যক্ত করিতেছি ;—

পদার্থের নাম	সঙ্কেত	আণবিক ভার বা ওজন
এক পরমাণু উদ্‌জান	উ	১
" " যবক্ষারজান	য	১৪
" " অঙ্গার বা (কয়লা)	ক	১২
" " অম্লজান	অ	১৬ ইত্যাদি

দুই পরমাণু উদ্‌জানে ও এক পরমাণু অম্লজানের মিলনে এক অণু জল জন্মে ; সুতরাং এক অণু জল $উ_২$ অ।

কিন্তু ড্যাল্টনের এই পরমাণুবাদে অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রকৃত অর্থ বুঝিবার উপায় ছিল না, তাই ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ইতালী দেশীয় বৈজ্ঞানিক অ্যাভোগাড্রো অণু ও পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়া সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট বুঝায়া দিলেন। তিনি বলিলেন, যখন সাধারণ অবস্থায় থাকে তখন মূলই হউক আর মিলিতই হউক, প্রত্যেক পদার্থ কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র কণার

সমষ্টি; সেই কণাগুলিরই নাম অণু (molecules) এক একটী অণু আবার দুই বা ততোধিক পরমাণুর সমবায়ে উৎপন্ন।

মূল পদার্থের অণুর পরমাণুগুলি একই প্রকারে মিলিত পদার্থের একটী অণু, দুই বা ততোধিক প্রকারের পরমাণু দ্বারা গঠিত। এক অণু উদ্‌জান বা অম্লজানের মধ্যে দুইটী করিয়া পরমাণু আছে। কাজেই সাঙ্কেতিক ভাষায় এক অণু উদ্‌জান ও অম্লজন $উ_২$ এবং $অ_২$ হইবে। যখন উদ্‌জান ও অম্লজান মিলিয়া জল হয়, তখন এ দুই গ্যাসের অণুগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়া প্রথমে পরমাণুর রাশি হইয়া যায়, তারপর দুই পরমাণু উদ্‌জান ও এক পরমাণু অম্লজান মিলিয়া এক এক অণু জল উৎপন্ন করে। কাজেই দুই অণু উদ্‌জানের ও এক অণু অম্লজানের সম্মিলনে দুই অণু জলের উৎপত্তি হয়। সাঙ্কেতিক ভাষায় একটী সমপাত (equation) দিয়া এই কথাটী লেখা হয়—

$$২\,উ_২ + অ_২ = ২উ_২\,অ।$$
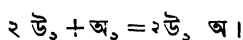
এই সমপাতের বামদিকেও যে কয়টী পরমাণু আছে, দক্ষিণ দিকেও সেই কয়টী বর্ত্তমান; কেন না পরমাণুর ধ্বংস নাই—পরমাণুর বিকার বা পরিবর্ত্তন নাই (ড্যাল্টনের মত)।

পরমাণুগুলি একক থাকিতে পারে না—দুইটী বা ততোধিক একত্র মিলিত হইয়া অণুর আকারে বর্ত্তমান থাকে। কেবল যখন এক অণু ভাঙ্গিয়া অন্য অণু গঠিত হয়, সেই সময় ক্ষণকালের জন্য পরমাণুগুলি স্বাধীনভাবে অবস্থান করে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ পরস্পর মিলিত হইয়া অণুর মূর্ত্তি ধারণ করে।

কিন্তু রাসায়নিক জগতে অ্যাভোগাড্রোর এই আবিষ্কারের সম্যক্ আদর হয় নাই। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া লোকে অণু ও পরমাণুগুলির ঠিক অর্থ বুঝিতে পারে নাই—বৈজ্ঞানিকগণ মতের মধ্যে অত্যন্ত অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইত। ক্রমে এতদূর দাঁড়াইয়াছিল যে, কোনও কোনও রাসায়নিক অণু ও পরমাণুর নাম শুনিলে চটিয়া উঠিতেন। অবশেষে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কানাইজারো নামক ইতালীয় রাসায়নিক তাঁহার স্বদেশীয় বৈজ্ঞানিক অ্যাভোগাড্রোর আবিষ্কার পুনরুজ্জীবিত করিয়া স্বীয় মনস্বিতা-প্রভাবে সকল মতের সামঞ্জস্য-বিধান পূর্ব্বক অণু ও পরমাণুবাদকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিলেন।

এক্ষণে এই সকল অণুর আকার ও পরিমাণ কিরূপ জানিবার জন্য স্বতঃই ইচ্ছা জন্মে। এসম্বন্ধে একটী গল্প আছে। একদিন বিলাতের এক স্কুল-

মাষ্টার একটী ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পরমাণু কাহাকে বলে?" সেই স্কুলে পরমাণুর মিলনে অণুর উৎপত্তি বুঝাইবার সুবিধার জন্য কতকগুলি চৌকা কাঠের টুকরা পরমাণুর প্রতিমূর্ত্তিরূপে ব্যবহৃত হইত। বুদ্ধিমান ছাত্রের ধারণা ছিল, সেই কাঠের টুকরাগুলিই পরমাণু। কাজেই সে একেবারে বলিয়া ফেলিল—"ডাক্তার ডাল্টন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত চৌকা কাঠের টুকরাকে পরমাণু কহে।" তাই পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া রাখা ভাল যে, এ পর্য্যন্ত কোনও ভাগ্যবান ব্যক্তি চর্ম্মচক্ষে একটীও অণু দেখিতে পান নাই। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের যতই উন্নতি হইতে থাকুক না কেন, কোনও কালে যে তাহার সাহায্যে অণু দেখা যাইবে, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন্ সাধারণ লোকের মনে অণুর পরিমাণ সম্বন্ধে একটী মোটামুটী ধারণা (idea) জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যদি একবিন্দু জল ক্রমশঃ বড় হইয়া এই পৃথিবীর মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহা হইলে জলমধ্যস্থিত অণুগুলি এক একটী ক্রিকেট বলের অপেক্ষা ছোট এবং ছররা গুলির অপেক্ষা বড় দেখাইবে।

মাঝে মাঝে এমন দুইটী বা ততোধিক মিলিত পদার্থ পাওয়া যায়, যাহা বিশ্লেষণ করিলে একইরূপ গঠন (formula) দেখা যায়, অর্থাৎ সেগুলির প্রত্যেকটীর মধ্যে সমান সংখ্যক একই প্রকারের অণু আছে ; কিন্তু তাহাদের গুণাবলী বিভিন্ন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, দুইটী পদার্থের গঠন $ক_8 উ_{10}$ ।* ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে বারজিলিয়স্ সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহার কারণ এই যে, দুই প্রকার অণুর মধ্যে পরমাণুগুলি বিভিন্ন প্রকারে সজ্জিত বা বিন্যস্ত (arranged) আছে ; এইরূপ দুইটী পদার্থের নাম দিলেন—ভূতবিকার (Isomer)। †

মোটামুটী ব্যাপারটা ঠিক ধরিয়াও, বারজিলিয়স্ পরমাণুগুলি অণুর মধ্যে কিরূপভাবে বিন্যস্ত থাকে, তাহার সন্তোষজনক সমাধান করিতে পারিলেন না। ১৮৫৮ হইতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই গুরুতর কার্য্যটী সুসম্পন্ন করিয়া

---

* অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থের এক একটী অণুর মধ্যে চারিটী অঙ্গার পরমাণু এবং দশটী উদ্‌যান পরমাণু আছে।

† শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় দেখাইয়াছেন, এই শব্দটী প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। See History of Hindu Chemistry' Vol. II. by Dr. P. C. Ray).

জর্ম্মাণদেশীয় পণ্ডিত কেকুলে ক্ষণভঙ্গুর জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন।

কেকুলে (১৮২৯-১৮৯৬ খ্রীঃ) বাল্যকালে স্থাপত্যবিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি পরে অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন; কিন্তু কেকুলের ঝোঁক পড়িল—রসায়ন-বিদ্যার উপর। শেষে তিনি রসায়ন-বিদ্যালোচনায় জীবনযাপন করিতেই মনস্থ করিলেন। তিনি একজন রাসায়নিকের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াই তৃপ্ত হইলেন না; তৎকাল প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ, ফরাসী ও ইংরাজ রাসায়নিকগণের অনেকেরই নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। এক একজন রাসায়নিকের এক একরূপ মত। একজনের নিকট থাকিলে কোন মত-বিশেষের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা জন্মে, তাহার ভ্রমসমূহ চক্ষে পড়ে না। কেকুলে নানা মতবাদের সহিত পরিচিত থাকায় কোনও মতেরই গোঁড়া ছিলেন না। সকলের দোষগুণ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া আপনার সংশোধিত ও সমুন্নত মত প্রচার করিলেন। তিনি বাল্যকালে সেই যে কতকগুলি ইষ্টক ও কাষ্ঠের বিভিন্ন বিন্যাসে বিভিন্ন প্রকারের অট্টালিকা হইতে দেখিয়াছিলেন, সেই বিদ্যা এখন তাহার বড় কাজে লাগিয়া গেল। তিনি সময় পাইলেই ভাবিতেন, পরমাণুগুলি কি কি ভাবে সজ্জিত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন অণুর উৎপত্তি হইবে। এইরূপে একদিন গাড়ী করিয়া যাইতে যাইতে তাঁহার মাথায় আসিল যে, কোনও প্রকার পরমাণু এক পরমাণু উদ্‌জানের সঙ্গে মিলিত হয়, কোনওটী দুইটী পরমাণু উদ্‌জানের সঙ্গে মিলিত হয়, আবার কোনওটী বা ততোধিক সংখ্যক উদ্‌জান পরমাণুর সহিত মিলিত হয়। ঠিক করিলেন, এক পরমাণু অম্লজান দুই পরমাণু উদ্‌জানের সহিত মিলে, অর্থাৎ অম্লজান হইতেছে দ্বিশক্তিধর (divalent) এক পরমাণু যবক্ষারজান তিন পরমাণু উদ্‌জানের সহিত মিলে, কাজেই যবক্ষারজান ত্রিশক্তিধর (trivalent); এক পরমাণু অঙ্গার চারি পরমাণু উদ্‌জানের সহিত মিলে, সুতরাং অঙ্গার চতুঃশক্তিধর (tetravalent)। উদ্‌জানকেই একশক্তিধর বলিয়া গণ্য করা যায়।

অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, পচা পুকুরের পাঁক হইতে একরূপ গ্যাস বাহির হয়। উহা শিশিতে ধরিয়া জ্বালাইলে পুড়িয়া যায়। লোকে যে আলেয়া দেখিয়া ভয় পায়, তাহা এই পেঁকো জলা গ্যাস জ্বলিয়াই হয়। এই গ্যাসটীর আণবিক গঠন হইতেছে উ$_4$। ইহাকে কেকুলের মতানুসরণ

পূর্ব্বক একটী চিত্র-গঠন (graphical formula) দেওয়া যাইতে পারে, যথা—
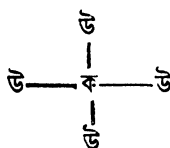
এক পরমাণু অঙ্গার যেন চারিটী হস্ত বাহির করিয়া চারিটী উদ্‌জান পরমাণু ধারণ করিয়া আছে। পূর্ব্বে যে পদার্থ দুইটীর আণবিক গঠন $ক_৪ উ_{১০}$ বলা হইয়াছিল, তাহাদের এই দুইটী বিভিন্ন চিত্র-গঠন—
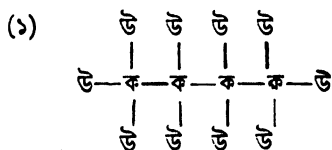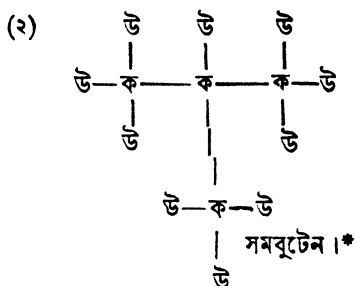
কেকুলে এইরূপে অনেকগুলি জৈব পদার্থের চিত্র-গঠন নির্ম্মাণ করেন। দাহ্য গ্যাস বাহির করিবার জন্য যখন পাথুরে কয়লাকে গরম করা হয় (পাত্রের মধ্যে নির্বাত প্রদেশে রাখিয়া অতিশয় তপ্ত করা হয়), তখন গ্যাসের সঙ্গে খানিকটা আলকাতরা বাহির হইয়া আসে। সেই আলকাতরায় নানা জৈব পদার্থ মিশ্রিত থাকে। তন্মধ্যে একটী হইতেছে বেঞ্জিন্। এই বেঞ্জিন হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে নানারূপ রং প্রস্তুত হয়। বেঞ্জিনের আণবিক গঠন হইতেছে $ক_৬ উ_৬$। এখন অঙ্গারকে চতুঃশক্তিধর বজায় রাখিয়া

---

* অর্থাৎ বুটেন ও সমবুটেন (Butane and Isobutane) উভয় মিলিত পদার্থেরই একটী অণুর মধ্যে চারিটী করিয়া অঙ্গার পরমাণু এবং দশটী করিয়া উদ্‌জান পরমাণু আছে বটে, কিন্তু সেই পরমাণুগুলি দুইটী বিভিন্ন প্রকারে সজ্জিত থাকায় দুইটী বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে—লেখক।

ইহার একটী চিত্র-গঠন দেওয়া বড় সোজা নয়। কেকুলে-প্রদত্ত বেঞ্জিনের চিত্র-গঠন * এইরূপ—
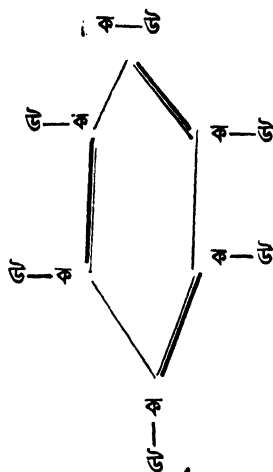
কিরূপে বেঞ্জিনের এই প্রসিদ্ধ অঙ্গুরীয়কার চিত্র-গঠনটী তাঁহার মাথায় আসে, তাহা তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। একদা বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"বসিয়া বসিয়া আমার পুস্তকখানি রচনা করিতেছি, কিন্তু কাজটা আর অগ্রসর হইতেছে না—মন অন্যদিকে রহিয়াছে। লেখা ফেলিয়া কেদারাখানি আগুনের দিকে আনিয়া ঢুলিতে লাগিলাম। আবার সেই পরমাণুগুলি আমার চোখের সম্মুখে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রায় এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া আমার মনশ্চক্ষু অতি সূক্ষ্মদর্শী হইয়া আসিয়াছিল; এবার আমি বহুসংখ্যক পরমাণুর নানা প্রকার গঠন দেখিতে লাগিলাম। কখন লম্বা লম্বা, সারি সাজান কখন আরও একটু ঘন-সন্নিবিষ্ট, সাপের মত পরমাণুর শ্রেণীগুলি নানারূপ বাঁকিয়া চুরিয়া ঘুরিতে লাগিল; কিন্তু দেখ দেখ ওটা কিরূপ দেখাইতেছে? একটা সাপ উহার লেজ কামড়াইয়া ধরিয়াছে, আর সেই মূর্ত্তিটা আমার চোখের সম্মুখে মজা করিয়া ঘুরিতেছে। যেন বজ্রপাতের দ্বারা আমি হঠাৎ জাগ্রত হইয়া উঠিলাম। রজনীর অবশিষ্ট অংশটুকু এই অনুমানটীর ফলাফল-চিন্তায় পর্য্যবসিত করিলাম।" কেকুলে আরও বলিতে লাগিলেন, "ভদ্র মহোদয়গণ, আসুন আমরা স্বপ্ন দেখিতে শিক্ষা করি; তাহা হইলে বোধ হয় সত্যের অনুসন্ধান পাইতে পারিব; কিন্তু সাবধানে শিখিতে হইবে হঠাৎ কোন স্বপ্নকে জনসমাজে প্রচার

* পাঠক দেখিবেন এই চিত্রগঠনগুলির প্রত্যেকটীতেই অঙ্গারের চতুঃশক্তিধরত্ব বজায় আছে। প্রত্যেক 'ক' হইতে চারিটী করিয়া রেখা বা বন্ধন (Bond) গিয়াছে।—লেখক।

করিবেন না—তাহার পূর্ব্বে জাগ্রত-অবস্থায় নিজ বিবেচনা-শক্তি দ্বারা সেটীকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিবেন।”

কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন—ভারতবর্ষীয়গণ বড়ই কল্পনা-প্রবণ, যেমন স্বপ্ন-দেখা লোক(dreamy people); কাজেই ইহাদের দ্বারা বিজ্ঞানচর্চ্চা বড় বেশী দূর অগ্রসর হইবে না; কিন্তু তাঁহারা কি বিস্মৃত হইয়াছেন যে, বিজ্ঞান কেবল বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবদ্ধকরণ নহে—জীবন্ত কল্পনাশক্তির সাহায্যে যন্ত্রাগারমধ্যে লব্ধ ফলাফলগুলির যথার্থ তাৎপর্য্য-নির্ণয়ই বিজ্ঞানের কঠিনতর অংশ? স্বল্প কল্পনাবান জাতির অপেক্ষা কল্পনাশালী ভারতবর্ষীয়গণ যে বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে অধিকতর কৃতকার্য্য হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য প্রণালীর সহিত প্রাচ্য প্রতিভার সংমিশ্রণে যে অপরূপ পদার্থের সৃষ্টি হইবে, তাহা সন্দর্শন করিবার জন্য আজ সমস্ত জগৎ উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী লেবেল ও ওলন্দাজ ভাণ্টহাফ্, কেকুলের মতের একটু সংশোধন করেন। কেকুলে পরমাণুগুলিকে এক সমতলের উপরই সাজাইয়া যাইতেন, কিন্তু লেবেল ও ভাণ্টহাফ্ দেখাইলেন—সেটা ঠিক নয়। পরমাণুগুলি শূন্য দেশে তিনটী পরস্পর সমকোণকারী সমতলেই বিন্যস্ত থাকে। জলাগ্যাসের প্রকৃত চিত্র নিম্নলিখিতরূপে গঠিত হইবে—
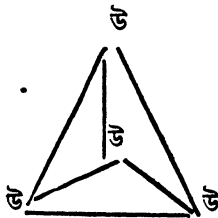
একটিtetrahedron এর মধ্যস্থলে এক পরমাণু অঙ্গার বিরাজমান আর চারিটী কোণে চারিটী উদ্‌জান পরমাণু রহিয়াছে।

ড্যাল্টন বলিয়া গিয়াছিলেন, পরমাণুগুলি অবিভাজ্য এবং একপ্রকার পরমাণু হইতে অন্য প্রকার পরমাণু পাওয়া যায় না (যেমন এক পরমাণু লৌহ হইতে এক পরমাণু স্বর্ণ পাওয়া যায় না)। তাহার পর প্রায় একশতাব্দী ব্যাপিয়া তাঁহার মতই অক্ষুণ্ণই ছিল। আর কেহ অন্য ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিবার আশা পোষণ করিতে পারিল না। পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্মতর কোনও কণার বিষয় চিন্তা করিতেও লোকে সাহস করিত না; কিন্তু বিগত বিশ বৎসরের

মধ্যে পদার্থবিদ্যার আলোচনা করিতে করিতে এমন কতকগুলি বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, যাহাতে পরমাণুকে কতকগুলি সূক্ষ্মতর কণার সমষ্টি বলিয়া ধারণা জন্মিয়াছে। সেই কণাগুলির নাম সূক্ষ্মাণু (Corpuscle)।

বর্ত্তমান কালে অধ্যাপক জে,জে,টমসন্ শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া কেম্ব্রিজে ক্যাভেণ্ডিশ যন্ত্রাগারে বসিয়া এই বিষয়ে নানা তথ্য উদ্ঘাটন করিতেছেন। তাঁহার মতানুসরণ পূর্ব্বক পরমাণু-গঠন-সম্বন্ধে মোটামুটী গুটি কয়েক কথা এইস্থানে লিপিবদ্ধ হইল।

সূক্ষাণুগুলি সমস্তই এক প্রকারের; পরাণুগুলি যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের, সেরূপ নহে। একটী সূক্ষ্মাণুর পরিমাণ (mass) এক পরমাণু উদ্জানের ১৭০০ ভাগের এক ভাগ। একটী পরমাণুর মধ্যে ঠিক কয়টী সূক্ষ্মাণু বিদ্যমান, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই [J. J. Thomson's The Corpuscular Theory of matter (pp. 142 et-sec)] যদি এক পরমাণু উদজানে 'ক' সংখ্যক সূক্ষ্মাণু থাকে, এক পরমাণু অম্লজানে ১৬ × ক থাকিবে, এক পরমাণু যবক্ষারজানে ১৪ + ক থাকিবে, ইত্যাদি অর্থাৎ পরমাণুগুলির ওজনের অনুপাতে সূক্ষ্মাণুগুলি থাকে। যেমন একটী অণুর মধ্যে পরমাণুগুলি নানাভাবে সজ্জিত থাকে, সেইরূপ আবার একটী একটী পরমাণুর মধ্যে সূক্ষ্মাণুগুলি নানাভাবে সজ্জিত থাকে। তড়িৎশক্তি প্রভাবেই সূক্ষ্মাণুগুলি পরস্পর আকৃষ্ট ও বিকৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব স্থানে অবস্থিতি করে।

একটী পদার্থের মধ্যে অণুগুলি শান্তভাবে থাকে না—অনবরত স্পন্দন করিতে থাকে; কিন্তু স্পন্দনগুলি এত সূক্ষ্মস্থানের মধ্যে সম্পাদিত হয় যে, তাহা কিছুতে চক্ষুগোচর হয় না—পদার্থটী দেখিতে যেন স্থির হইয়াই থাকে। এই আণবিক স্পন্দনের ফলেই পদার্থনিচয়ের তাপ উৎপন্ন হয়। যদি অণুগুলি একবার ধর্ম্মঘট করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে, তাহা হইলে পদার্থের তাপ একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।

পরমাণুগুলিও অণুর মধ্যে বিভিন্ন ভাবে সজ্জিত থাকিয়াই ক্রমাগত ঘুরিতেছে। আবার এক একটী পরমাণুর মধ্যে সূক্ষ্মাণুগুলি বেগে ঘূর্ণিত হইতেছে। অন্তদিকে আমরা দেখিতে পাই, এক একটী গ্রহের চারিদিকে কতকগুলি উপগ্রহ ঘুরিতেছে, আবার উপগ্রহসহ সেই গ্রহটী সূর্য্যের চতুঃপার্শ্বে ঘুরিতেছে। আবার গ্রহউপগ্রহ-সম্বলিত একটী সম্পূর্ণ সৌরজগৎ রেখাবিশেষ অবলম্বন করিয়া শূন্য প্রদেশে অবিরাম ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এস্থানে

উপগ্রহের সহিত সূক্ষ্মাণু, গ্রহের সহিত পরমাণু এবং সৌরজগতের সহিত অণুর সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইতেছে। যখন তাপ বা তাড়িত-সংযোগে পরমাণুগুলির ঘূর্ণন অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়,তখন অণুটী ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন পরমাণু বাহির হইয়া পড়ে। আবার যখন সূক্ষ্মাণুগুলির ঘূর্ণনবেগ অত্যধিক হইয়া পড়ে, তখন অধিক ভারবিশিষ্ট একটী পরমাণু ভাঙ্গিয়া কতকগুলি অল্প ভারবিশিষ্ট পরমাণুর সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ সূক্ষ্মাণুর একটী বৃহৎ সমষ্টি ভাঙ্গিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র সমষ্টির সৃষ্টি হয়। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটী সুস্পষ্ট করা যাক্। একটী পরমাণু মনে করুন, একটী অট্টালিকা, এক একটী সূক্ষ্মাণু সেই অট্টালিকার ইষ্টক। যদি ভূমিকম্পে বা ঝড়ে অট্টালিকাটী ভূমিশায়ী হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ইষ্টকটী যে পৃথক হইয়া পড়িবে, এরূপ নহে—কোথাও বা একটা স্তম্ভ পড়িল, কোথাও বা একটা প্রাচীর পড়িবে। অট্টালিকাটী ইষ্টকের বৃহৎ সমষ্টি, স্তম্ভ ও প্রাচীর উহার ক্ষুদ্র সমষ্টি। নবাবিষ্কৃত রেডিয়ম-ধাতুবিষয়ক গবেষণা হইতে শেষোল্লিখিত অনুমানটীর প্রধান প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সার উইলিয়ম্ রাম্‌জে ও সডি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রচার করিয়াছেন—রেডিয়ম্ হইতে হিলিয়ম্ নামক গ্যাস পাওয়া গিয়াছে, অর্থাৎ একটী ভারী রেডিয়ম-পরমাণু ভাঙ্গিয়া কতকগুলি হাল্কা হিলিয়ম্ পরমাণু পাওয়া গিয়াছে।

ইহার পর অনেকে বলিতে পারেন, তাহা হইলে যে সকল লোক অন্য ধাতু হইতে স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে যাইত,তাহাদের আর ভ্রম কোথায় ? ইহার উত্তর এই যে রেডিয়ম-পরমাণুটি আপনাআপনি কোনও অজ্ঞাত কারণবশতঃ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, মানুষের কোনও শক্তি নাই যে, এই ভাঙ্গন বৃদ্ধি বা হ্রাস করে, অর্থাৎ সূক্ষ্মাণুর ঘূর্ণনের উপর আমাদের কোনও হাত নাই। কাজেই একটু সংশোধন করিয়া আমরা এখনও ড্যাল্টনের মতটী বজায় রাখিতে পারি। আমরা বলিতে পারি, আমাদের শক্তি যতটা, তাহাতে পরমাণুগুলিকে ভাগ করিতে বা এক পরমাণু হইতে অন্য পরমাণু সৃষ্টি করিতে পারা অসম্ভব।

যে সমস্ত সদয়-হৃদয় শ্রোতৃবৃন্দ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক এতক্ষণ এই নীরস প্রবন্ধ শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহাদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে—এই সমস্ত অণু পরমাণুর অনুমান গুলিতে জগতের কি ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে ? আজ যে অনুমান সর্ব্বসম্মত,কাল তাহা ভ্রমসঙ্কুল বিবেচনায় পরিত্যক্ত—পরশ্ব হয়ত আবার কেহ তাহারই মধ্যে সত্য উদ্ঘাটন করিতেছেন। এ সকল ছাড়িয়া ফলিত-রসায়নের চর্চ্চায় মনোনিবেশ করা উচিত—সেটা কার্য্যকরী বিদ্যা। এ কথার

উত্তর বার্জিলিয়সের স্বদেশীয় পণ্ডিত এর্হিনিয়স্ দিয়াছেন। তিনি বলেন—"রসায়ন-শাস্ত্রে ব্যবহৃত অনুমান ও মতবাদগুলি কতকগুলি যন্ত্রের ন্যায়। যন্ত্র ব্যতিরেকে যেরূপ সূত্রধরের কার্য্য চলে না, সেইরূপ মতবাদ ভিন্ন রসায়ন-বিদ্যা অগ্রসর হইতে পারে না। আজকাল নিত্যই নূতন যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়া পুরাতন যন্ত্রের ব্যবহার উঠিয়া যাইতেছে। তাই বলিয়া কি আর তৎকাল-প্রচলিত যন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা করিলে চলে?" [Theories in Chemistry by Arrhenius.]

বাস্তবিক পক্ষে একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে,ইহা স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, অণু ও পরমাণুবাদের এতটা উন্নতি সংসাধিত না হইলে, ফলিত রসায়ন অতি সামান্য ফলই প্রসব করিতে পারিত। যে জর্ম্মানদেশে ফলিত রসায়ন সর্ব্বোচ্চ উন্নতি লাভ করিয়াছে, যে দেশের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত নানাবিধ ম্যাজেণ্টা প্রভৃতি রং, কৃত্রিম গন্ধদ্রব্য, কৃত্রিম নীল ইত্যাদি দ্রব্যসম্ভার পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে, সেই জর্ম্মানদেশেই আণবিক গঠনের সর্ব্বাধিক পুষ্টিবিধান হইয়াছে।

কেকুলে কর্তৃক জৈবপদার্থসমূহের চিত্রগঠন নির্ম্মিত না হইলে তাহার শিষ্য বেয়ার, কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করিতে পারিতেন না।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমানকালে কি জীবতত্ত্ব, কি পদার্থতত্ত্ব, কি রসায়ন,—বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাতেই বহুর মধ্যে একের সন্ধান করিতে মনস্বীগণের সর্ব্বাধিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে। এক অভিন্ন নিত্য পদার্থ সূক্ষ্মাণুই অবস্থাভেদে, কালক্রমে নানা রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া,এই বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির সৃষ্টিসাধন করিতেছে। ইহাই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের প্রধান সুর। আমাদের দেশের মুখ-উজ্জ্বলকারী প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ইংলণ্ডস্থিত পণ্ডিত-সমাজের সমক্ষে যাহা বলিয়াছেন,তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের সমাপ্তি করি;—"চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভাগীরথীর তট-প্রান্তে আর্য্যঋষিগণ যে বলিয়াছিলেন, নানারূপে প্রতীয়মান এই জগৎ এক ও অভিন্ন—পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বহু গবেষণার পরে সেই সনাতন সত্যেই ফিরিয়া আসিতেছেন।"

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ফলিত রসায়ন।

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং দাসবৃত্তেন ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।"

এইরূপ একটি প্রবাদ আমাদের দেশে বহুপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে। দেশের অবস্থা উন্নত করিতে হইলে,প্রধানতঃ বাণিজ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা এবং মনোযোগী হওয়া বিশেষ আবশ্যক। তৎপরে কৃষিকার্য্যের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। রসায়ন-বিজ্ঞানের সাহায্যে এই দুই বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে, সেই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পৃথিবীর যাবতীয় ব্যবসা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ রসায়ন-বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত সুচারুরূপে চালিত হইতে পারে না। বাণিজ্য-জগতে প্রত্যেক পদে রসায়ণের সাহায্য অনুভূত হয়। বিজ্ঞানের সাহায্যে বাণিজ্য-জগৎ যেরূপ উন্নত হইয়াছে, তাহা কল্পনারও অতীত। সত্যসত্যই আমেরিকা নব-অভ্যুদয়ে ভূমণ্ডলকে নূতন করিয়া গড়িতে অগ্রসর হইয়াছে। এদিকে জর্ম্মাণি এক এক করিয়া জগতের অধিকাংশ ব্যবসা নিজের করায়ত্ত্ব করিতেছে। নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক উপায়ের দ্বারা অতি অল্প ব্যয়ে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া প্রতিযোগিতায় সমগ্র পৃথিবীকে পরাজিত করিয়া আপন প্রতিপত্তি স্থাপন করিতেছে। বিজ্ঞানচর্চ্চা যে কেবল ইউরোপ এবং আমেরিকা একচেটিয়া করিয়াছে, তাহা নহে; এসিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে ভাগ্যলক্ষ্মী নিজ প্রভা বিকীর্ণ করিয়াছেন। যে জাপান ত্রিংশ বৎসর পূর্ব্বে সভ্য জগতে 'অসভ্য' বলিয়া পরিচিত ছিল, সেই জাপান আজ সভ্যজগতে প্রথমশ্রেণী অধিকার করিয়াছে। আর আমরা ভারতবাসী—জাতীয় উন্নতির প্রধান অবলম্বন বিজ্ঞান-উপাসনা ত্যাগ করিয়া বিদেশীয় প্রলোভনে ভুলিয়া ঘোর তিমিরে নিমগ্ন আছি; কিন্তু আর অধিক দিন আমাদিগকে পদানত থাকিতে হইবে না বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। স্বদেশী-আন্দোলনের সূচনার পর হইতে দেশের লোকের বিজ্ঞানশিক্ষার স্পৃহা

জন্মিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্জিকা দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, বৈজ্ঞানিক ছাত্রের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। তাঁহারা পূর্ব্বে সরকারের চাকরী পাইলেই নিজেকে সার্থক জ্ঞান করিতেন এবং জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সফল বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এখন অনেকে বিজ্ঞান শিক্ষার সাহায্যে স্বাধীন ব্যবসা স্থাপন করিয়া নিজের এবং দেশের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছেন। চিরকালই যে ভারতের অবস্থা এরূপ শোচনীয় ছিল, তাহা নহে। পুরাকালে ভারতবর্ষে যে বিজ্ঞানচর্চ্চা ছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ দুই একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি।

(১) "দিল্লীর কুতবমিনার"সম্বন্ধে বিখ্যাত রাসায়নিক রস্কো যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তিনি বলিতেছেন—"হিন্দুরা যে লৌহ-প্রস্তুত সম্বন্ধে বিচক্ষণ ছিলেন, তাহা দিল্লীর কুতবমিনারের লৌহস্তম্ভ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহা চল্লিশ হাত লম্বা। ইহার উপরিভাগে চতুর্থ শতাব্দীর খোদিত সংস্কৃত ভাষা এখনও বর্ত্তমান। এরূপ স্তম্ভ বর্ত্তমানকালের উন্নত কলকারখানার সাহায্যেও ঢালাই করা সুকঠিন। কি করিয়া হিন্দুরা তৎকালীন প্রথা অবলম্বন করিয়া এরূপ বৃহৎ স্তম্ভ প্রস্তুত করিল, তাহার কারণ-নির্দ্ধারণে আমরা অসমর্থ।" উপরোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, লৌহ-প্রস্তুত-প্রণালী আমাদের দেশে অতি উত্তমরূপে জানা ছিল। অবশ্য কেহ ইহাকে বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত বলিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষের উপরোক্ত জ্ঞান-সম্বন্ধে সন্দিহান হইবে না।

(২) বিষ্ণুপুরের "দল" ও "মাদল" নামক তোপদ্বয়ের কথা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। ইহার মধ্যে "মাদল" নামক তোপ এখনও বর্ত্তমান। শুনিতে পাওয়া যায়, এরূপ তোপ পৃথিবীতেও অতি অল্প। ইহার লৌহ এত উৎকৃষ্ট যে, এ পর্য্যন্ত ইহা নূতনের ন্যায় রহিয়াছে।

(৩) আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় হিন্দু-রসায়নের ইতিহাসে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"আরব-লেখকগণের, প্রধানতঃ হাজিখলিফার গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হিন্দু-জ্যোতিষ, বীজগণিত এবং চিকিৎসাবিদ্যা আরবেরা হিন্দু বৈজ্ঞানিকের নিকট আগ্রহের সহিত শিক্ষা করিতেন এবং হিন্দু বৈজ্ঞানিক-গণ কালিফদিগকে (Caliphs) শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাদের সভায় থাকিতে বাধ্য হইতেন। মুসলমান ছাত্রগণ জ্ঞানলাভের জন্য ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান

শিক্ষার স্থানে আসিয়া জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্তি করিতেন। ফলতঃ ভারতবর্ষে আসিয়া বিদ্যাশিক্ষা না করিলে তাঁহাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ হইবে বলিয়া বিবেচনা করিতেন।" এই আরবদের নিকট পাশ্চাত্য জাতিসমূহ বিজ্ঞানশিক্ষা করেন এবং ক্রমশঃ উন্নত হইয়া আমাদিগকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়াছেন। আমার বোধ হয়, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যদি স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে বিজ্ঞানশিক্ষার ক্রমোন্নতির চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে এখন আমাদিগকে প্রত্যেক কার্য্যে এবং জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য্য দ্রব্যের জন্য বিদেশীয়ের দ্বারস্থ হইতে হইত না। আমরা প্রত্যেক বিষয়ে বিদেশীয়ের সমকক্ষ হইতে পারিতাম। যাহা হউক, এখন অতীত বিষয় লইয়া অনুতাপ করিবার সময় আর নাই ;— এখন কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাণিজ্য-জগতে রসায়নের অধিকার অতি বিস্তৃত। এখন দেখা যাউক, কিরূপে রসায়ন-শাস্ত্র বাণিজ্যজগতে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিল। যিনি "ফলিত রসায়ন" এবং "বৈজ্ঞানিক রসায়ন" পাঠ করিয়াছেন, তিনি দেখিতে পাইবেন—রাসায়নিক গবেষণার সাহায্যে রসায়ন-বিজ্ঞান বাণিজ্য-জগতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণের সাহায্যে ফলিত রসায়নের কার্য্য সহজ হইয়াছে। অবশ্য যে ব্যক্তি গবেষণার সাহায্যে নূতন ব্যবসায় প্রণয়ন করেন বা পুরাতন ব্যবসা উন্নত উপায়ে এবং অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে চালনা করিবার পন্থা উদ্ভাবন করেন, তিনি প্রায় স্বকার্য্যের ফলভোগে বঞ্চিত হন। বৈজ্ঞানিকগণ বহুবর্ষব্যাপী গবেষণার দ্বারা এক নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিলেন, হয়ত ইহার জন্য অনেকস্থলে তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইল ; কিন্তু তাঁহার উদ্ভাবিত পন্থা-অবলম্বনে বাণিজ্যজগৎ যে উপকৃত হইল, তাহার ফললাভে তিনি বঞ্চিত হইলেন ; কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে সরস্বতীর উপাসনায় ব্যস্ত, তাহারা লক্ষ্মীর উপাসনা করিতে সময় পান না এবং তজ্জন্য নিজ উদ্ভাবিত পন্থা যাহাতে সমগ্র মানবসমাজের উপকারে আইসে, তাহার চেষ্টা করেন। এইরূপে নূতন নূতন পন্থা প্রণয়ন করিয়া সমগ্র জনসাধারণকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রাখেন। তাঁহাদের এই নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার জন্য স্বর্ণাক্ষরে তাঁহাদের নাম লিখিত থাকিবে। গবেষণার সাহায্যে বাণিজ্যজগৎ যে উপকৃত হইয়াছে, তাহার উদাহরণস্বরূপ দুই একটী বিষয় বর্ণনা করিব।

বিখ্যাত জর্ম্মান রাসায়নিক হোয়েলার (Wohcler) যখন জৈব রসায়নের একটী পদার্থ (Urea) কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিলেন, তখন তিনি স্বপ্নেও

ভাবেন নাই যে,বৈজ্ঞানিক জগতে তাঁহার প্রণয়নবার্ত্তা এরূপভাবে আদৃত হইবে এবং ইহার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক জগতে এবং ফলিত রসায়নের কার্য্যাবলীতে এরূপ বিপ্লব সাধিত হইবে। মানব চিরপূজিত প্রকৃতি দেবীকে উপেক্ষা করিয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ফরাসী রসায়নবিৎ বার্থোলে (Bertholet) রাসায়নিক যন্ত্রাগারে মানবের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিয়া কৃত্রিম বস্তুর তালিকা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন—বিজ্ঞানের সাহায্যে মানব এতদূর উন্নত হইবে যে, মানবের ব্যবহার্য্য যাবতীয় দ্রব্যের জন্য আর অনিশ্চিত প্রকৃতি দেবীর দ্বারস্থ হইতে হইবে না। মানব নিজ বিজ্ঞানশিক্ষার বলে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লইবেন। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত দ্রব্যাদির মধ্যে রঞ্জনশিল্পের দ্রব্যাদি, গন্ধ দ্রব্যাদি উদাহরণস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। পাথুরে কয়লা হইতে কোক প্রস্তুত কালে যে বায়বীয় পদার্থ নির্গত হয়, তাহার কিয়দংশ উৎপাতিত হইয়া আল্‌কাতরায় পরিণত হয়। পূর্ব্বে এই আল্‌কাতরা কোন বিশেষ কার্য্যে ব্যবহৃত হইত না; কিন্তু রাসায়নিক গবেষণার সাহায্যে এই উপেক্ষিত নষ্ট দ্রব্য হইতে জৈব রসায়নের (Organic Chemistry) অধিকাংশ দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। এই আলকাতরা হইতে রঞ্জনদ্রব্যাদি প্রস্তুত জন্য জর্ম্মানিতে এক বিশাল কারখানা চলিতেছে। এই কারখানার বিস্তার শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রায় দুই শত রাসায়নিক এইস্থানে কার্য্য করিতেছেন; কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষে দুই শত রাসায়নিক আছেন কিনা সন্দেহ। এইকারখানার প্রস্তুত কৃত্রিম রঞ্জন দ্রব্য ভারতবর্ষের নীলচাষের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই সমস্ত দ্রব্য প্রণয়নের জন্য রাসায়নিক গবেষণা কি পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে,তাহার প্রমাণস্বরূপ একটী কথা বলা প্রয়োজন বিবেচনা করি। মহাত্মা কেকুল (Kekule) যখন বেঞ্জিনের আকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাঁহার রাসায়নিক অবয়ব (Chemical Formula) নির্দ্ধারণে সমর্থ হইলেন, তাহার পূর্ব্বে কেহ ভাবেন নাই যে,আল্‌কাতরা হইতে আমাদের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারিবে। উপরোক্ত বর্ণনা হইতে রসায়ন-শাস্ত্রে জ্ঞান এবং রাসায়নিক গবেষণার একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। এখন আমাদের দেশে রাসায়নিক ব্যবসা কি প্রকারে চালিত হইতেছে, তাহা দেখা যাউক।

পাশ্চাত্য জগতে যেরূপভাবে রসায়নের সাহায্যে ব্যবসা চলিতেছে,আমাদের দেশে সেরূপ ব্যবসা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা আছে, তাহাতে

দেশের অভাব কণামাত্রও পূরণ হয় না। যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি আমাদের ব্যবহারে আসে, তাহার মধ্যে গন্ধকদ্রাবক (Sulphuric acid) প্রধান। এমন অতি অল্পই রাসায়নিক দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার প্রস্তুতপ্রণালীতে এই দ্রাবক কোন না কোন আকারে ব্যবহৃত হয় নাই। এই গন্ধকদ্রাবক প্রস্তুত জন্য মিশ্রিত গন্ধক (Sulphides) বা অমিশ্রিত গন্ধক (Native Sulphur) প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে গন্ধকদ্রাবক প্রস্তুতের জন্য দুইটি মাত্র কারখানা আছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিক্রয়াভাবে ইহাদিগকে প্রায়ই কারখানা বন্ধ রাখিতে হয়। যেদেশে গন্ধকদ্রাবকের বিক্রয় নাই, সে দেশে রাসায়নিক ব্যবসা নাই বলিলেও ক্ষতি হয় না। পাশ্চাত্য জগতে ইহার বিক্রয়াধিক্যই জতীয় সভ্যতার পরিমাপক বলিয়া গণ্য হয়। আমাদের দেশীয় কারখানায় ইতালী হইতে অমিশ্রিত গন্ধক আমদানী হইয়া থাকে। যদিও আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত গন্ধক পাওয়া যায়,তথাপি আমাদিগকে বিদেশী অমিশ্রিত গন্ধকের দ্বারস্থ হইতে হয়। তাহার দুইটি কারণ ;—(১) ইহার ব্যবহার অতি সহজ। (২) মিশ্রিত গন্ধক ব্যবহার করিতে হইলে, প্রথমতঃ খনিজ পদার্থকে উত্তাপ দ্বারা দুই অংশে বিভক্ত করিতে হয়। এক অংশ গন্ধক ধাতুতে পরিণত হয়। অন্যাংশ দগ্ধ গন্ধকে পরিণত হয়। এই দগ্ধগন্ধক অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিলিত হইয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা গন্ধকদ্রাবকে পরিণত হয়। অপর অংশদগ্ধ ধাতু হইতে ধাতু প্রস্তুত হইতে পারে। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ মিশ্রিত গন্ধক ব্যবহার করিয়া উভয় দ্রব্যই প্রস্তুত করেন এবং প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে সমর্থ হন। আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ীগণ প্রচুর মূলধনের অভাবে বা রীতিমত শিক্ষার অভাবে মিশ্রিত গন্ধক ব্যবহার করেন না। কাজেই তাঁহাদিগকে বিদেশীয় গন্ধকের আশ্রয় লইতে হয়।

সাবানের ব্যবসা আমাদের দেশে কিরূপ চলিতেছে, দেখা যাউক। সাবান প্রস্তুত জন্য বঙ্গদেশে ৫।৬টি কারখানা আছে ; কিন্তু ইহারা কেহই স্বদেশী উপকরণ ব্যবহার করেন না বা করিবার চেষ্টা করেন না। যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োজন হয়, সমস্তই আমদানী হইয়া আসে। কাজেই এই সমস্ত দ্রব্যের আমদানী বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী বিবরণীতে সাবানের উপকরণের আমদানীর বিশেষ তালিকা নাই, তবে যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি সাবান প্রস্তুতে এবং অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, তাহার আমদানীর তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	১৯০৬-০৭	১৯০৭-০৮
	টাকা	টাকা
সমগ্র রাসায়নিক দ্রব্যাদি	৬৮.৭ লক্ষ	৭৯.৩ লক্ষ
সাবানের প্রধান উপকরণ		
সর্জ্জিক ক্ষার	৭.০৩ লক্ষ	৮.৯৪ লক্ষ
সাজিমাটীর পরিবর্ত্তে সোডা	১.১ লক্ষ	৬.৫৩ লক্ষ

এই শেষোক্ত দ্রব্যের আমদানীর মধ্যে ৫.৪৯ লক্ষ টাকার সোডা কেবল মাত্র বঙ্গদেশে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত এই সমস্ত দ্রব্য স্বদেশে প্রস্তুত না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত সাবানের ব্যবসা প্রকৃতপক্ষে দেশী বলিয়া ধরা যাইতে পারে না।

এখন কিরূপে অনেক দ্রব্যের রপ্তানির দ্বারা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই, তাহা দেখা যাউক। সরকারী বিবরণীতে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানির পরিমাণ বেশী দেখাইয়া আমাদিগকে সমৃদ্ধিশালী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু অনেক দ্রব্য এখানে ব্যবহার না করিয়া রপ্তানি করিয়া দিয়া আমাদিগকে দুই দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। একটী বিশেষ উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত পরিমাণে হরিতকী রপ্তানি হইয়া থাকে;—

১৯০৫-৬	১৯০৬-৭	১৯০৭-৮
টাকা	টাকা	টাকা
৪৪৬১০০০	৪৩৯৭০০০	৫৮৯৫০০০

এই হরিতকী হইতে Tannic acid বলিয়া একটী পদার্থ প্রস্তুত হয়। ইহাকে হরিতকী-অম্ল বলা যাইতে পারে। এই অম্ল কালী-প্রস্তুত কারণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং কাঁচা চামড়ার শোধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কাঁচা চামড়াও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া যায়। তাহার পরিমাণ নিম্নে দিলাম।

১৯০৫-৬	১৯০৬-৭	১৯০৭-৮
১৩৭৫৭১১৪০ টাকা	১৫৩৪৫২৫০৮ টাকা	১০৯৫১৫৩৪১ টাকা

আমাদের দেশে কালী প্রস্তুতকারী ব্যবসায়ীগণ বিদেশীয় হরিতকী-অম্ল ব্যবহার করেন। সরকারী বিবরণীতে দেখিলাম, একস্থানে লেখা আছে, "হরিতকী হইতে Tannic acid অর্থাৎ হরিতকী-অম্ল প্রস্তুত ভারতবর্ষে লাভজনক হয় নাই।" অথচ এই হরিতকী লইয়া গিয়া বিদেশীয়েরা অম্ল প্রস্তুত

করিয়া পুনরায় আমাদিগের নিকট বিক্রয় করিতেছেন, ইহার কারণ কি? আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন এবং বিদেশীয়ের বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন ব্যতীত আর অন্য কোন কারণ দেখা যায় না। নাটোর হইতে রাজসাহী যাইবার পথে অনেক বাব্‌লা বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। ইহার ছালে প্রচুর Tannic acid পাওয়া যায়। ইহাতে লাভজনক ব্যবসা চলে কি না, রাজসাহীবাসীর দেখা কর্ত্তব্য।

এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, যাহা হইতে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনে, অনেক লাভজনক ব্যবসার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

এ প্রবন্ধে ফলিত রসায়ন সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই থাকিল। কেবলমাত্র ফলিত রসায়ন কিরূপে এতদূর উন্নত হইল, তাহার আভাস মাত্র দিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে ফলিত রসায়ন চর্চ্চার আবশ্যকীয়তা প্রতীয়মান করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য এবং তাহা যদি আংশিকভাবেও পূরণ হয়, তবে লেখকের শ্রম সার্থক বলিয়া পরিগণিত হইবে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

জ্যোতিষের রহস্য।

প্রবন্ধের আরম্ভেই সভাস্থ ভদ্রমহোদয়দিগের নিকট আমি একটী কথা নিবেদন করিয়া রাখি,—আমি আপনাদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করিতে যাইতেছি; তাহার প্রতিদানে আমিও আপনাদের কাছে কিঞ্চিৎ দয়া প্রত্যাশা করিব। আজ দুই দিন যাবৎ নানাবিষয়ক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যাপৃত থাকাতে আপনাদের মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাই আমি ভাবিতেছি যে, তাহার উপর আরও কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক ভার চাপাইতে চেষ্টা করিলে আপনাদের মস্তিষ্কের প্রতি অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইবে; একারণ বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি যথাসাধ্য বৈজ্ঞানিকত্ব বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিব,—ইহাই আপনাদের প্রতি আমার দয়া প্রকাশ। এস্থলে যদি কেহ বলিতে চাহেন যে, তাঁহার মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয় নাই, তবে তাঁহার ভ্রম দূর করিবার জন্য আরও দুই চারিটি কথা কহা প্রয়োজন মনে করি।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা অসীম শক্তিসম্পন্ন, এবং তাঁহার শক্তি সর্ব্বভূতে বিদ্যমান রহিয়াছে; ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না যে জগতের 'সর্ব্বভূত' অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই অসীম শক্তিসম্পন্ন। অপরদিকে বিজ্ঞানের একটি গূঢ় এবং ধ্রুব সত্য এই যে জগতের প্রত্যের বস্তুরই শক্তির একটা সীমা আছে, এবং তাহা যে পরিমাণ পদার্থ দ্বারা গঠিত, তাহার অনুযায়ী। এই সত্য মানিয়া লইতে গেলে আমরা একটী সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যে বস্তুতে যত পদার্থ বেশী, তাহার শক্তিও তত বেশী। একটী চলিত কথায় এই ভাবটা সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়া থাকে, যেমন কোন লোকের ক্ষমতার অল্পতা দেখিলে আমরা বলিয়া থাকি যে, ঐ লোকটার ভিতরে কিছু 'পদার্থ' নাই। এই কথাটি বলিবার সময় আমরা যে ক্ষমতার সহিত পদার্থের পরিমাণের তুলনাদ্বারা একটি গূঢ় বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিপাদন করিতেছি, তাহা অবশ্য অনুভব করি না। এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আপনারা এই একটী সহজ ও স্বাভাবিক প্রশ্ন করিতে পারেন যে, বস্তুর পদার্থ পরিমাপ দ্বারাই যদি তাহার শক্তির ঠিকানা করিতে হয়, তবে কি ইহা মানিয়া লইতে হইবে যে, যে মানুষ যত স্থূলকায় হইবে, তাহার শরীরে শক্তিও তত বেশী হইবে?

ইহার অতি সরল উত্তর এই যে, বিজ্ঞান অসত্য হইতে পারে না, এবং স্থূলকায় মানুষে 'পদার্থ' বেশীমাত্রায় থাকে, একারণ বিজ্ঞানের মতে স্থূলদেহে শক্তির আধিক্য অবশ্যম্ভাবী; তবে যদি কোন ব্যক্তি বিশেষে পদার্থ বেশী থাকা সত্বেও শক্তি কম দেখা যায়, তাহা হইলে আপনাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, সে দোষ বিজ্ঞানের নহে,—তাহা ব্যক্তি বিশেষেরই দোষ!

জ্যোতির্ব্বিগ্যার বলে আমরা এই সসাগরা পৃথিবীর শক্তি পরিমাপ করিতে সক্ষম হই;—কেবল তাহা নহে, যে সূর্য্য এই পৃথিবী এবং তৎসহকারে সমস্ত গ্রহ জগৎকে, স্পর্শমাত্র না করিয়া,শূন্যপথে ঘুরাইতেছে,তাহারও শক্তি পরিমাপ কার্য্য জ্যোতির্ব্বিগ্যা দ্বারা সাধিত হয়। ইহা আধুনিক জ্যোতিষের অগ্র লক্ষণ। যে জ্যোতিষ এই প্রকার মহৎ কার্য্যসাধন করিবার ক্ষমতা রাখে, তাহা দ্বারা মানুষের শক্তির পরিমাপ হইতে পারে না, ইহা আপনারা কিছুতেই বিশ্বাস করিবেন না। সূর্য্যের তুলনায় পৃথিবী ক্ষুদ্র, এবং পৃথিবীর তুলনায় আমরা প্রত্যেক মানুষ কত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র! এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র যে মানুষ, তাহার দেহের এক শীর্ষে ততোধিক মহা ক্ষুদ্র এত প্রকোষ্ঠে কয়েক ছটাক মস্তিষ্ক রহিয়াছে,—ইহার শক্তি পরিমিত ও অল্প নহে, এ কথা কি কেহ মনে স্থান দিতে পারেন? যদি তাহা না হইল, তবে এই দুই দিনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার চাপে আপনাদের মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা জ্যোতিষের পক্ষে ত অন্যায় আবদার নয়ই, আমার পক্ষেও তাহা ধৃষ্টতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। মস্তিষ্কের উপর বিজ্ঞানের চাপ অপর সকল বিষয়ের চাপ অপেক্ষা গুরুতর, ইহা আমি নিজে অনুভব করিতে পারিতেছি; একারণ বর্ত্তমান প্রবন্ধ হইতে বিজ্ঞানকে যথাসাধ্য দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেছি। ইহাতে যদি কাহারও বিরক্তি সঞ্চার ঘটে,তবে তিনি অন্ততঃ ইহা মনে করিয়া আশ্বস্তি লাভ করিবেন যে, আমি (জ্যোতিষের শক্তি পরিমাপের পরাক্রম জ্ঞাত থাকাতে) তাঁহার মস্তিষ্কের ভার বৃদ্ধিরূপ জ্ঞানকৃত পাপের ভাগী হইব না!

বর্ত্তমান সম্মিলনের সম্পাদক মহাশয় যখন আমাকে জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ে একটী প্রবন্ধ রচনা করিতে আদেশ করেন, তখন তাঁহার এই নির্দ্দেশ ছিল যে, জ্যোতির্ব্বিদ্যাকে যাহাতে লোকহিতকর কার্য্যে নিয়োজিত করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন হইবে। তাঁহার এই নির্দ্দেশ যে আমার মস্তিষ্কের উপর কত বড় একটা চাপ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা অবশ্য তিনি ভাবিবার অবসর পান নাই; অথবা আমি আপনাদের উপর যতখানি দয়া প্রকাশ

করিতে উদ্যত হইয়াছি, তিনি সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমার প্রতি ততটুকু দয়া প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞানের ব্যবহারিকত্ব অনুভব করা যাইতেছে, এবং বর্ত্তমান সম্মিলনে পঠিত প্রবন্ধাবলিতে আপনারা তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু জ্যোতিষের ব্যবহারিকত্ব সপ্রমাণ করা আমার কাছে এক বিষম শক্ত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বস্তুসমন্বয়ে শক্তিসঞ্চয় করিয়া তাহাকে লোকহিতকর কার্য্যে নিয়োজিত করা যাইতে পারে,—ইহা পদার্থ-বিজ্ঞানের অধিকার; এবং নানাপদার্থের সমবায়ে এক একটি নূতন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাহাও লোকহিতার্থে কাজে লাগান যাইতে পারে,—ইহা রসায়ন বিজ্ঞানের অধিকার। দ্রব্য আহরণ করিয়া শক্তি সঞ্চয়ন কিম্বা পদার্থ আহরণ করিয়া দ্রব্য উৎপাদন, এই উভয় কার্য্যই ধরাতলে মানুষের ক্ষমতা ও আয়াস দ্বারা সাধন করা যাইতে পারে, এই সংবাদ আজ আর আমাদের কাছে নূতন প্রতিপন্ন হইবে না। কিন্তু জ্যোতিষ এক অদ্ভুত জিনিস,—শূন্যদৃষ্টি ইহার সাধনা এবং অপার্থিব (কিন্তু দৃশ্য) বস্তুর অদৃশ্য পথে গতিবিধি ইহার সাধন-সামগ্রী! ইহাতে দেখিয়া শিখিতে হয়, আবার শিখিয়া দেখিতে হয়। আকাশে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকা যেমন ভাবে চলিতেছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গণনা দ্বারা তাহাদের পন্থা আবিষ্কার করিতে হয়। সেই পন্থা শূন্যমার্গে অদৃশ্য রহিয়াছে, তাহার কোন নিশানা নাই; যেমন নদী বক্ষে নৌকা চালাইয়া যাইবার সময় তাহার পথের কোন ঠিকানা রাখিয়া চলে না, আকাশের জ্যোতিষ্ক সকলও এমন পথে চলে, যাহার কোন ঠিকানা আকাশের গায়ে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই গণনা দ্বারা পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল না, জ্যোতিষ্ক সেই পন্থা অতিবাহন করিয়া চলিতেছে কি না, তাহারও একটা ঠিকানা রাখা দরকার। যদি দেখা যায় যে, জ্যোতিষ্ক যে পথে চলিতেছে, তাহার সহিত গণনালব্ধ পথের মিল হইতেছে না, তাহা হইলে গ্রহের নূতন গতি দেখিয়া তাহার সঙ্গে মিলাইয়া পূর্ব্ব গণনার সংস্কার করিতে হয়। এই প্রণালী নূতন নহে, বহু পূর্ব্বকাল হইতে ভারতবর্ষে এবং আর যে সকল স্থানে জ্যোতিষ চর্চ্চা হইয়াছে, সর্ব্বত্র এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই জ্যোতিষের কার্য্য চলিতেছিল। নিউটন এক সময়ে ঐ সকল গতির কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহাদের মূলে এক অবিচ্ছেদ্য শক্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। নিউটনের পূর্ব্বে গ্যালিলিও এবং তাহার বহু পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য পৃথিবীকে শক্তিময়ী সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বটে,

কিন্তু বিশ্বজগতে যে এক বিশাল শক্তির জাল বিস্তৃত থাকিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে চালিত করিতেছে, ইহা নিউটনের শিক্ষা। এই শক্তিবলে এক বস্তু অপর বস্তুকে স্পর্শমাত্র না করিয়া আকাশপথে ভ্রাম্যমাণ রাখিতেছে। প্রাচীনকালের হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণ এবং তাঁহাদের পর বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত আরবীয় ইয়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা পৃথিবীকে অচলা মনে করিতেন! ইহার ফলে, গ্রহমণ্ডলীকে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমাণ সপ্রমাণ করিবার জন্য তাঁহারা চক্রের উপর চক্র ব্যবস্থা করিয়া নানাবিধ কষ্টকল্পিত গ্রহপথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা যে গণনদুরূহ ছিল, তাহা বলা হইতেছে না—কার্য্য বা গতিদৃষ্টে প্রণালী উদ্ভাবন করা গণিতের কাছে দুরূহ প্রতিপন্ন হয় না। কিন্তু ঐ সকল প্রণালীর জটিলত্ব হেতু তাহা দ্বারা হেতুর সঠিক ক্রম নির্দ্দেশ ও তাহার কারণ নির্দ্ধারণ ঘটিয়া উঠে নাই। এত কাল, এবং আজি পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষে গ্রহগতি ভৌমকেন্দ্রিক প্রণালীতে চক্র ও উপচক্র সংস্থান দ্বারাই সাধিত হইয়া আসিতেছে। ভাস্করাচার্য্যের মতন মনিষীও—পৃথিবীতে আকর্ষণ স্বীকার করা সত্ত্বেও—সেই আকর্ষণ গ্রহজগতে প্রয়োগ করিতে সাহস পান নাই; তাই তিনি কেবল "খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি"—বলিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছিলেন। সূর্য্যকে গ্রহচক্রের কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীকে অপর সকল গ্রহের সহিত তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমাণ সিদ্ধান্ত করিবার কল্পনা মানুষের মস্তকে প্রবেশ করিতে বহুকাল লাগিয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন্ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবী ও গ্রহমণ্ডলীর ভ্রমণ জ্ঞানগোচর হইল, তাহার পর গ্রহদিগের প্রকৃত গতিপথ আবিষ্কৃত হইতে বহুদিন লাগে নাই; এবং তাহার পর আবার অর্দ্ধশতাব্দী না যাইতেই ঐ সকলবিধ গতির কারণ এক বিশ্বব্যাপী আকর্ষণের জাল প্রকাশিত হইয়া পড়িল!

মানুষ যতদিন গ্রহগতির প্রকৃত ক্রম অজ্ঞাত ছিল, ততদিন তাহাকে জটিল চক্রজালে জড়িত কল্পনা করিত; এবং ঐ গতির কারণ না জানাতে, গ্রহদিগকে স্বেচ্ছাগমনশীল কোন দৈবশক্তির আধার মনে করিয়া তাহাদের ভয়ে ভীত হইত। যেখানে স্বেচ্ছাচারগণের সম্ভাব্যতা,সেখানেই কৃতাঞ্জলিপুটের ব্যবস্থা,—তাই প্রাচীনকাল হইতেই গ্রহশান্তির জন্য পূজার্চ্চনার বিধান। আবার যেখানে অনিষ্ঠাশঙ্কায় শান্তিকামনার ব্যবস্থা রহিয়াছে, সেখানে ইষ্টকামনায় বরপ্রার্থনারও ব্যবস্থা থাকা চাই; তাই গ্রহগণ এতকাল আমাদের ভাগ্যবিধাতার আসন গ্রহণ করিয়া অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু গ্রহজগতের সে

দিন এখন কি আর আছে? এখন আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, তাহাদের স্বেচ্ছা গমনের কোন ক্ষমতাই নাই,—এমন কি, মাধ্যাকর্ষণের অকাট্য বিধান লঙ্ঘন করিয়া তাহাদের এক চুলও এদিক ওদিক চলিবার সামর্থ্য নাই। কেবল যে সূর্য্যের আকর্ষণের বাঁধনে তাহারা ঘুরিতেছে, তাহা নহে, তাহাদের নিজেদের ভিতরেও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ তাহাদিগকে কম ব্যতিব্যস্ত করে না। এইরূপ শঙ্কটাপন্ন অবস্থায়, আমাদের মতন ক্ষুদ্র পার্থিব জীবের হিতাহিতসাধনে প্রয়াস পাইবার জন্য তাহাদের যে একতিলও অবসর থাকিতে পারে, ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারিতেছি না। আপনারা একবার অবস্থাটা ভাবিয়া দেখুন,—সূর্য্য তাহাদিগকে অবিরাম নিজের চারিদিকে ঘুরাইতেছে, এ দিকে তাহারা পরস্পর টানাটানি করিয়া একে অন্যকে পথভ্রষ্ট করিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে; ইহাতে যে তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারিতেছে, ইহাই তাহাদের পরম সৌভাগ্য এবং আমাদেরও ভাগ্য-বিধাতার একটি মহৎ মঙ্গল কার্য্য। এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে কোনরূপ স্তব স্তুতি দ্বারা বশীভূত করিতে চেষ্টা করিলে আমরা যে বিশেষ ফল লাভ করিব, তাহা আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। আমাদেরও কোন সাধ্য নাই যে, তাহাদের গতিবিধি কোন উপায়ে আমাদের সাধ্যায়ত্ত করিতে পারি, তাহাদেরও যে সে সকল বিধি অতিক্রম কিম্বা লঙ্ঘন করিয়া, অথবা কোন উপায়ে স্থগিত রাখিয়া চলিবার সাধ্য আছে,তাহাও জ্ঞাত হইতে পারি নাই।

এখানে এমন কথা বলা হইতেছে না যে, তাহাদের কোন প্রকার গতি-বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে না। তাহাদের যে গতিবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, তাহা জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিলে অল্পায়াসেই জানা যাইতে পারে এবং ইহাও ধারণার আয়ত্ত হইতে পারে যে, ঐ সকল গতিবিপর্য্যয় তাহাদেরই পরস্পর আকর্ষণের ফল। লাপ্লাশ প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা গণনা দ্বারা ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, ঐ সকল গতিবিপর্য্যয় মানুষের ভীতি উৎপাদক হইলেও বিধাতার বিধানের পক্ষে সাঙ্ঘাতিক নহে,—ঘরে ঘরে পরস্পর নিয়ত বাদ বিসম্বাদ ঘটিলেও গ্রহজগতের সমূল বিচ্ছেদের কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে গ্রহজগতে বিমল শান্তি বিরাজ করিতেছে না। এই সকল ঘটনা ও তাহাদের কার্য্য কারণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা জ্যোতিষের এক ব্যবহার প্রতিপন্ন হইতে পারে। কিন্তু কেহ হয়ত মনে মনে বলিতেছেন, গ্রহদিগের এই সকল গৃহবিবাদের খবর রাখিয়া আমাদের

কি লাভ হইবে? আমার মতে এইরূপ কথা মানুষের মুখে সাজে না। এই কিছুকাল পূর্ব্বে আপনারা গ্রহদিগকে মানবসমাজের কল্যাণসাধনে নিয়োজিত করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছিলেন; এখন যেমনি দেখিলেন যে, তাহারা নিজেদের ঘর সামলাইতেই ব্যতিব্যস্ত, আমাদের কোন খোজ খবর যে তাহারা রাখিতে পারে, তাহার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না, অমনি বলিয়া বসিবেন যে, তাহাদের ঘরের খবর জানিয়া আমাদের কি লাভ? ইহা রাজনীতির হিসাবে Non-interference Policy হইতে পারে; কিন্তু যে সকল গ্রহ আদিকাল হইতে আমাদের বেদ পুরাণাদির অন্তর্ভূত, ও ঘরের লোকের ন্যায় আমাদের নিত্যকর্ম্মের বিষয়ীভূত হইয়াছিল, আজ তাহাদিগকে নিজের কাজে ব্যস্ত জানিতে পারিয়া তাহাদের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে যাওয়া কি আমাদের পক্ষে ভদ্রতা হইবে? তবে ইহা নিশ্চিত যে গ্রহদিগের গতি এবং তাহার বিপর্য্যয়াদি এমন প্রাকৃতিক কারণসম্ভূত, যাহার উপর মানুষের দূরে থাকুক, গ্রহদিগের নিজেরও কোন কর্তৃত্ব চলে না। এদিকে জ্যোতির্ব্বিদ্যাও আমাদেরই পৈত্রিক সম্পত্তি,—বিদেশে তাহাহ গৌরব ও সম্পদ পাইয়াছে বলিয়া আমরা তাহার বর্দ্ধিত সম্পদকে তুচ্ছ করিলে আমাদের কলঙ্কের সীমা থাকিবে না! কিন্তু কথাটার এখনও মীমাংসা হইল না যে জ্যোতিষের লোকহিতকর ব্যবহার কোথায়?

রামায়ণে আছে যে, ত্রেতাযুগে রাবণ একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। "দশমুণ্ড, কুড়ি হস্ত, বিংশতি লোচন" ত যথেষ্ট অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়া থাকে; তা ছাড়া তাঁহার জ্যোতিষের ক্ষমতাও অসাধারণ ছিল বলিয়া খ্যাতি আছে। তিনি আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদিগকে নিজের ইচ্ছামত ডাকিয়া আনিয়া কাজ করাইয়া লইতে পারিতেন। বর্ত্তমান যুগে রাবণের ন্যায় অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। ইহা জানিয়া শুনিয়া এই সম্মিলনের সম্পাদক মহাশয় আমার মতন একটী জ্যোতির্ব্বিদণুকে যদি এমন একটী উদ্ভট আদেশ করেন যে, আকাশের গ্রহতারকাদিগকে লোকহিতার্থে বশীভূত করিয়া কার্য্য করাইতে হইবে, তাহা হইলে আমার প্রতি কতটা অত্যাচার করা হয়, আপনারা তাহার বিচার করিবেন। আমাতে রাবণের কি গুণ থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা আমি আদবেই জ্ঞাত নহি; তবে একটী চলিত প্রবাদ আছে যে, "যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।" অনেক দিন হইল, একবার লঙ্কায় আমার পাদস্পর্শ ঘটিয়া-

ছিল, সম্পাদক মহাশয় কি এ সংবাদ কোন প্রকারে জানিতে পারিয়া আমাকে একটী 'রাবণ' মনে করিয়াছেন, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধি নির্ণয় করিয়া তাহা দ্বারা মানুষের কার্য্যবিশেষের কালাকাল নির্দ্ধারণ করার প্রথা ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিত রহিয়াছে; এবং কালাকাল বোধে কার্য্যের ফলাফল বিচার হইতে পারে, এমন সম্ভাবনাও কেহ কেহ স্বীকার করিতে পারেন, (আমার মতন একজন ক্ষুদ্র জ্যোতির্ব্বিদ্‌ তাহা স্বীকার না করিলেও জ্যোতিষের তাহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না) কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্যাকে লোকের ব্যবহারে আনিবার ক্ষমতা, একমাত্র রাবণ ভিন্ন অন্য কাহারও ছিল কিম্বা থাকিবার সম্ভাবনা রহিরাছে, এমন কথা আমার জানা নাই।

এস্থলে দুইটী কথা উঠিতে পারে,—যদি লোকহিত ব্যবহারে জ্যোতিষের কোন কার্য্য না থাকে, তবে জ্যোতিষ শিক্ষার সার্থকতা কোথায়? এবং আমরা যে, সাহিত্য আলোচনার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি, সেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে জ্যোতিষের স্থান কোথায়?—প্রথম কথার উত্তর অতি সহজে দেওয়া যাইতে পারে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—এই চতুর্ব্বর্গ ফলের মধ্যে জ্যোতিষ শিক্ষা অর্থাগমের পক্ষে সুকর না হইলেও ধর্ম্ম ও মোক্ষ লাভে অতি প্রশস্ত। ভাস্করাচার্য্য জ্যোতিষকে ষড়্‌বেদাঙ্গের মধ্যে চক্ষুরূপে নির্দ্দেশ করিয়া তাহার শ্রেষ্ঠত্ব এইরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন,—

> "বেদচক্ষুঃ কিলেদং স্মৃতঃ জ্যোতিষং
> মুখ্যতা চাঙ্গমধ্যেঽস্য তেনোচ্যতে।
> সংযুতোঽপীতবৈঃ কর্ণনাসাদিভি
> শ্চক্ষুষাঙ্গেন হীনো ন কিঞ্চিৎকরঃ॥"

মহাপুরুষ বচন ছাড়া সহজ বুদ্ধিতেও ইহা ধারণা করা যায় যে, অপার্থিব বিষয়ের চিন্তাতেও মানুষের মন পৃথিবীর সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিয়া বিশাল প্রশস্ততা লাভ করিতে সক্ষম হয়। ইহাই শিক্ষার সার্থকতা—এবং এই হিসাবে জ্যোতিষশিক্ষা সর্ব্বাগ্রে লোকহিতকর বলিয়া গণ্য হইবার দাবী রাখে। অর্থাগমই জাতীয় উন্নতির একমাত্র সোপান নহে; অনেক সময় অর্থব্যয় করিয়াও পুরুষার্থ লাভে প্রয়াস পাইতে হয় এবং ঐ পুরুষার্থই মানবধর্ম্মের উৎকর্ষতা প্রতিপাদন করে! কেবল আহরণ ও সঞ্চয়ন পিপীলিকার ন্যায় কীটেরও ধর্ম্ম; কিন্তু বিশ্বজ্ঞান কেবল মনুষ্য নামক জীবেরই আয়ত্তীভূত রহিয়াছে, অতএব সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষালাভ মনুষ্যত্বেরই পরিচায়ক!

দ্বিতীয় কথাটীর উত্তরে কিঞ্চিৎ রহস্য আছে। কাব্য এবং উপন্যাসই বাঙ্গালা সাহিত্যের অবলম্বন; এই দুই শ্রেণীর সাহিত্যে যে জ্যোতিষের সংশ্রব একেবারেই নাই, তাহা বলা যায় না, কারণ উভয়েতেই চাঁদের উপদ্রব অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়,—কোথাও বা চাঁদের মতন মুখ দেখা যাইতেছে এবং কেহবা চাঁদের হাসি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। এদিকে চাঁদ স্বয়ং জ্যোতিষের একটী জটিল সমস্যা। প্রাচীন ও আধুনিক জ্যোতিষে চন্দ্রসম্বন্ধে এক বিষয়ে সম্পূর্ণ মিল আছে,—উভয়েতেই ইহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতেছে। তাহার গতি এত সুস্পষ্ট এবং তাহার পর্য্যবেক্ষণ এত সহজ যে, বহুকাল উপর্য্যুপরি পর্য্যবেক্ষণের ফলে চন্দ্রতত্ত্ব সহজে আয়ত্ত করা যায়। প্রাচীন জ্যোতিষে এই প্রণালীই অবলম্বিত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষে যে চন্দ্রফল লাভ করা গিয়াছিল, তাহার সহিত বর্ত্তমান জটিল গণিতসাধ্য ইয়ুরোপীয় ফলের অত্যধিক বৈষম্য দেখা যায় না। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষ্কারগণ কেবল চন্দ্রের গতি ও তাহার প্রণালী নিরাকরণ করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলেন; ঐ গতির কারণ নির্দ্দেশ এবং কারণ হইতে কার্য্য ব্যুৎপাদন পূর্ব্বক তত্ত্ব বিশ্লেষণ তাঁহাদের আয়ত্ত হয় নাই। চন্দ্র সকল গ্রহাপেক্ষা ছোট, একারণ তাহার উপর সকলেরই ক্ষমতা চলে। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী বলিয়া চন্দ্রে পৃথিবীর আকর্ষণ প্রবল, একারণ চন্দ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া চলিতেছে। কিন্তু সূর্য্য এবং অপরাপর গ্রহেরা দুর্ব্বলের উপর বল প্রকাশ অধর্ম্ম মনে করে না; তাই তাহারা সকলে মিলিয়া চন্দ্রকে বিপর্য্যস্তের চূড়ান্ত করিতেছে। ইহার একমাত্র ফল এই ঘটিতেছে যে, চন্দ্র যদিও প্রতিমাসে একবার আকাশে এক আবর্ত্তন পূর্ণ করে, কিন্তু আজ আকাশে ঠিক যে স্থানে চন্দ্রকে দেখা যাইবে, পুনরায় তাহার সেস্থানে অবস্থিত হইতে বহুকাল লাগিবে; আজ যে পথে চন্দ্র চলিতেছে, বহু আকর্ষণের ফলে তাহার সে পথ খুজিয়া লইতে কত শত বৎসর লাগিবে!—কারণ প্রতি মাসেই তাহার পথ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের একটা বিহিত ক্রম আছে; প্রাচীন জ্যোতিষিগণ তাহা নিরাকরণ করিতে পারিয়াছিলেন, কেবল তাহার কারণ নিরূপণ করিতে সক্ষম হন নাই। আধুনিক জ্যোতিষে ঐ সকল কারণ সম্যক নিরূপিত হইয়া তাহাদের সমাবেশে চন্দ্রতত্ত্ব গণিতের এক উচ্চাঙ্গ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। চন্দ্রের গতি অপর সকল জ্যোতিষ্কের গতি অপেক্ষা দ্রুত; তাহার পথ পরি-

বর্ত্তনও দ্রুত এবং সূর্য্য ও গ্রহদিগেরে আকর্ষণের সমাবেশে তাহার গতিবিপর্য্যয়ও দ্রুত এবং সুস্পষ্ট। এই সকল কারণে তাহার গণনাও দুরূহ; কিন্তু দুরূহ হইলেও অসাধ্য প্রতিপন্ন হয় নাই। গণিতের বহু জটিল সিদ্ধান্ত কেবল চন্দ্রতত্ত্বসাধন জন্যই আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

চাঁদের আরও বিশেষত্ব আছে। তাহার এক দিক নিয়ত পৃথিবীর দিকে থাকে, তাই সে যখন পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া চলে, তখন পৃথিবীর দিকে মুখ করিয়াই ঘুরিতে থাকে। ইহার ফলে মাসে একবার তাহার সর্ব্বাঙ্গে সূর্য্যের আলোক লাগে বটে, কিন্তু পৃথিবী নিয়ত তাহার এক মুখ ভিন্ন অপর দিক্ দেখিতে পায় না। চাঁদের আকৃতি ডিম্বের ন্যায় এবং তাহার লম্বা দিক্ পৃথিবীর দিকে রহিয়াছে। তাহা ছাড়া আমরা চাঁদের যে মুখ দেখিতে পাই, তাহা অনেক পাহাড় পর্ব্বতে সমাচ্ছন্ন এবং সর্ব্বাঙ্গ বরফাবৃত।

কারণানুসন্ধিৎসা মানুষের একটা একটা মস্ত অধিকার,—আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের বীজমন্ত্রই কারণানুসন্ধান। চন্দ্রে যে এত কাণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে,তাহার সকলগুলিরই কারণ জ্ঞান জ্যোতিষের আয়ত্ত; এই হিসাবে চন্দ্রতত্ত্ব জ্যোতিষের এক বিশেষ অঙ্গ বলিয়া পরিচিত। যেখানে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণীত হয়, সেখানেই বিজ্ঞান তাহাকে সত্য বলিয়া প্রকটিত করে। এক্ষণে সমস্যা এই দাঁড়াইতেছে যে,চাঁদ সম্বন্ধে বিজ্ঞানে যাহা সত্যরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে,সাহিত্যক্ষেত্রে কি তাহা সেই ভাবে টিকিতেছে, কিম্বা তাহার কোনরূপ বিকৃতি ঘটিতেছে?

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল,তাহাতে আপনারা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছেন যে, জ্যোতিষের মতে আমাদের কাছে চাঁদ কেবলই মুখসর্ব্বস্ব,—তাহার মুখ ছাড়া আর কিছুই নাই। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যেও তাই,—তাহাতে চন্দ্রমুখ ছাড়া আর কোন জ্যোতিষ্কেরই পসার দেখা যায় না। কিন্তু যে সকল চন্দ্রমুখের বাহার বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব সেই সকল চন্দ্রমুখের অধিকারিণীদিগকে একবার দূরবীক্ষণ সাহায্যে চাঁদ দেখাইতে পারিলে বুঝা যায়, তাঁহাদের মুখকে চাঁদের সহিত তুলনা করায় তাঁহারা কতটা গৌরবান্বিতা হন! তবে জ্যোতিষের পক্ষ হইতে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, চাঁদের একটী বই মুখ আমরা দেখিতে পাই না এবং তাহা বরফাবৃত ও পাহাড়পর্ব্বতসঙ্কুল অতিবন্ধুর! তাহার সহিত একখানা সুগোল নিটোল মুখের কি সাদৃশ্য থাকিতে পারে, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করা জ্যোতিষের কর্ম্ম নহে।*

* জনৈক কৌতুকপ্রিয় রিপোর্টার কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রে আমার নামে

এদিকে চাঁদের অবস্থাটা আপনারা একবার ভাবিয়া দেখুন। একদিকে পৃথিবী, সূর্য্য এবং অপরাপর গ্রহেরা সকলে মিলিয়া তাহাকে টানাটানি করিতেছে; তাহার উপর সাহিত্যকারগণ তাহাকে অল্প বিপর্য্যস্ত করিতেছেন না —সকারণ কিম্বা অকারণ—তাহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতরণ করাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। এরূপ বিপদে পড়িয়াও চাঁদকে হাসিতে হইতেছে, কারণ সাহিত্যে চাঁদের হাসি একটী প্রয়োজনীয় সামগ্রী। চাঁদের লাতিন নাম Luna। ইহা হইতে একটী ইংরাজি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার বাঙ্গালা অনুবাদ চন্দ্রাবিষ্ট করা যাইতে পারে। আমার মনে হয় যে, আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ও ধরাতলের সাহিত্যখদ্যোতমালা, এই উভয় দলের উপদ্রবে চন্দ্র স্বয়ং 'চন্দ্রাবিষ্ট' হইয়া পড়িয়াছে, অথবা যে সকল উপদ্রবকারীরা নিরাশ্রয় চাঁদকে এই প্রকার বিপদগ্রস্ত করিয়াছেন, তাঁহারাই চন্দ্রাবিষ্ট হইয়াছেন; এ বিষয়ে বর্ত্তমান সম্মিলনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমি এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি যে, উপরোক্ত রহস্যের মীমাংসার জন্য একটী কমিটি নির্ব্বাচিত হউক। আরেকটী কথা—কেবল সাহিত্যিকদিগের উপরই 'চন্দ্রাবেশের' বোঝা চাপাইয়া নিরস্ত হইতে পারিতেছি না। অপর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহাদের উপর চন্দ্রের আবেশ একান্ত অল্প নহে—তাঁহারা জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত সমাজ। প্রাচীন পণ্ডিতেরা যতদিন চাঁদের উপর এত উপদ্রবের সংবাদ জানিতেন না, ততদিন তাঁহারা মাঝে মাঝে চাঁদকে ধরিয়া টানাটানি করিতেন,—তাহার গতি প্রত্যক্ষ করিয়া নিজেদের গণন ফল সংশোধন করিয়া লইতেন। এখন যতই চারিদিকে স্বর্গে মর্ত্ত্যে চাঁদের উপর উপদ্রবের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে, ইয়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ সমাজ তাহার সমস্ত তথ্য অবগত থাকা সত্ত্বেও গণিতও দৃষ্ট, এই উভয়বিধ চন্দ্রাবেশে ততই অধিকতর মত্ত হইয়া উঠিতেছেন। এহেন কালে কেবল এক শ্রেণীর জ্যোতিষী চন্দ্রের আবেশ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে

যে কলঙ্ক রটনা করিয়াছেন, এস্থলে তাহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন, আমি প্রবন্ধে ইহা কহিয়াছি যে "দূরবীক্ষণ" দ্বারা চন্দ্রাকৃতি দেখিলে কোন 'চন্দ্রাননী' তাঁহার সহিত চন্দ্রের সাদৃশ্য .." ইত্যাদি। পাঠকগণ দেখিবেন যে আমার প্রবন্ধে 'চন্দ্রাননের' সহিত সাদৃশ্যের কথা বলা হইয়াছে 'চন্দ্রাননীর' সহিত নহে। কাহারও সর্ব্বাবয়বের সহিত গোলাকার চন্দ্রের তুলনা আমি আদবেই করি নাই। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, আমার প্রবন্ধ পাঠকালে তিনি 'চন্দ্রাবিষ্ট' হইয়াছিলেন,—বস্তুতঃ তিনি 'চন্দ্রাবিষ্ট' কিম্বা 'তন্দ্রাবিষ্ট' হইয়াছিলেন, তাহা বিবেচনার যোগ্য। শ্রীঅঃ—

সক্ষম হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের দেশের গণক সমাজ। এই শ্রেণীর জ্যোতিষীরা আর এখন চন্দ্রের দিকে ফিরিয়াও তাকান না;—তাঁহাদের গণনা শুদ্ধ হইলেই হইল, চন্দ্রের প্রকৃত গতির সহিত ঐ গণনালব্ধ ফলের সামঞ্জস্য রাখার কোন প্রয়োজন তাঁহারা বোধ করেন না। তাঁহাদের মতে গণিত ফল দৈবলব্ধ বিশুদ্ধ জিনিষ, তাহার কোন প্রত্যবায় ঘটিতে পারে না। প্রকৃত চন্দ্রলব্ধ তিথিনক্ষত্রের সহিত গণিত তিথিনক্ষত্রের কোনরূপ মিল রাখা তাঁহাদের কার্য্য হইতে পারে না,—যদি কখনও ঐরূপ মিল রাখা দরকার হয়, তবে তাহা করা চন্দ্রেরই কার্য্য! চন্দ্র যদি স্বয়ং গণনার সহিত তাল মিলাইয়া চলিতে না পারে, পরন্তু গণকেরা স্বয়ং যাহার তত্ত্ব বুঝাইতে অক্ষম, এমন দুর্লভ ফলকে উলটপালট করিবার ক্ষমতা যদি চন্দ্রের থাকে, তাহা হইলে ইহাই প্রমাণ হইবে যে, চন্দ্র স্বয়ংই চন্দ্রাবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। অপরন্তু আকাশের জ্যোতিষ্কই হউন কিম্বা সাহিত্যক্ষেত্রের খদ্যোতই হউন, যাহারা চাঁদকে এইরূপে বিপর্য্যস্ত করিতেছেন,—লজ্জারক্তিমাভাবর্জ্জিত বরফাবৃত ও অতিবন্ধুর 'চন্দ্রমুখকে', সলজ্জ, সুকোমল, সুগোল নারীমুখের উপমাস্থল করিয়া তুলিতেছেন, এবং নানা উৎপাতে বিপদগ্রস্ত চাঁদকে গণকদিগের গণনার তালে চলিতে না দিয়া, তাহাতে হাসির ফোয়ারা ছুটাইতে চেষ্টা করিতেছেন,—তাঁহারা সকলেই চন্দ্রাবিষ্ট হইয়াছেন।

এই সম্মিলনীতে সমবেত সকলেই সাহিত্যসেবী, তাই আমাকে সভয়ে কথা কহিতে হইতেছে; তবে যদি আপনারা আমার প্রতি কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করিয়া আমার কথা বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আমার নিজের মত আপনাদের কাছে ব্যক্ত করিতে পারি,—তাহা এই যে, আমাদের দেশের আধুনিক জ্যোতিবব্যবসায়িগণ—যাহারা প্রাচীন গণনপ্রণালীর পৌনঃপুনিক ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক জ্যোতিষের সকলবিধ ফল উৎপাদন ও তাহা চয়ন করিয়া বঙ্গীয় জনসমাজকে মোক্ষলাভে সহায়তা করিতেছেন, অথচ সে সকল গণনফলেও যথার্থতা প্রতিপাদন জন্য চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহদিগের প্রকৃত গতি পর্য্যবেক্ষণের কোন আবশ্যকতা অনুভব করেন না—তাঁহারা ভিন্ন বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে এবং সৌরজগতের জ্যোতিষ্ক সমাজে সকলেই চন্দ্রাবিষ্ট এবং চন্দ্র স্বয়ং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক "চন্দ্রাবিষ্ট"!!

রঞ্জন শিল্প।

এই শিল্প ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; এই শিল্প প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিকাশ হইয়াছিল কিনা, এবং তাহার কোন লিখিত প্রমাণ কোন পৌরাণিক শাস্ত্রে আছে কিনা, আমি বলিতে পারি না। কোন সহিষ্ণু সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির এই বিষয়টী অনুসন্ধানের সামগ্রী বটে। তবে এবিষয় কতগুলি জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা একটু ভাবিবার বিষয়। অনেক প্রাচীন কাল হইতে এদেশে রেসমী কাপড় রং করিবার জন্য লাক্ষার ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। কাপাস নির্ম্মিত জিনিষের উপর ইহার ব্যবহার প্রায় দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ইহা রেসম এবং পশম রং করিবার জন্যই উপযুক্ত। ইহার রঞ্জনপদার্থ Laccaceric acid। সুতরাং ইহা অম্ল রং ভাবে Tinchlaide ও oxalic acid সংযোগে ব্যবহার হইয়া থাকে। oxalicর পরিবর্ত্তে এদেশে তেতুলের জল ব্যবহার হইয়া থাকে। নীলের হাউজ প্রস্তুত করিবার জন্য সাজিমাটী চুণ লোহা ইত্যাদি ব্যবহার অনেক পূর্ব্বাবধি চলিয়া আসিতেছে। তুলা ও রেসম দুই এর উপরই নীল ব্যবহার হইয়া থাকে। মঞ্জিষ্ঠা এবং মরিণ্ডা দ্বারা পাকা লালরং করিতে হইলে ফটকিরি প্রয়োজন। এই তত্বটী অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কতগুলি রং ভিন্ন উপাদান সংযোগে কার্য্যকরী হয়, আত্মশক্তিতে ততদূর হয় না। বর্ত্তমান সময়ে এই শ্রেণীর রংগুলিকে madant রং বলে। ইহাদের ব্যবহারের জন্য কোন একটী ধাতু ঘটিত oxide বস্ত্রের ভিতর সন্নিবিষ্ট করা প্রথমতঃ প্রয়োজন। তৎপরে এই প্রস্তুত বস্ত্র উক্ত শ্রেণীর রংএর ভিতর দিলে ঐ oxide এর সঙ্গে সংযুক্তা হইয়া একপ্রকার Lake প্রস্তুত হয়। এই lake বস্ত্র-সূত্রের ভিতর অতি ঘনিষ্টভাবে সম্বন্ধ হওয়ায় পাকা রং প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ এইজন্য alum al-acetale, al-sulphat cr-acetal, cr-chloride, fe-acetate, Fe-chloride, Zin, chloride cr-sulphat, Tartar Emetic acid pot-Tartrate Bichromate of potash প্রভৃতি ব্যবহার হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে রঞ্জন রসায়ন বিপুল উন্নতির সঙ্গেও ফিটকারি

এবং লৌহের ব্যবহার মূলে একপ্রকারই আছে; আমাদের দেশে পাকা লাল রংকরা বরাবরই ফট্‌কারী যোগে হইয়া আসিয়াছে; বর্ত্তমান, সময়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে পাকা লাল রং করা হয় তাহাতেও সুতাকে প্রথমতঃ al-sulphate সংযোগে mordant করা হয়; বাজারে যাহা Turkey Red নামে পরিচিত তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক পদ্ধতি বাহির হইয়াছে; কিন্তু প্রত্যেক পদ্ধতির মূলেই প্রথম এই al-oxide আছে; উদ্ভিজ্জ রং পরিবর্ত্তে এখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত রং ব্যবহার হয়; ইউরোপে alizarine আবিষ্কারের পূর্ব্বে madda নামক উদ্ভিদ দক্ষিণ আমেরিকা হইতে আনাইয়া ব্যবহার করিতে হইত; madda এর রঞ্জনী পদার্থ ও তৈরি alizarine একই জিনিষ, এদেশে madda এর পরিবর্ত্তে morinda অথবা maujete ব্যবহার হইত; কিন্তু সকলের মূলেই সেই এক al-oxide এবং এক colour lake। পাকা বেগুণী রং করিতে হইলে হিরার কস কিম্বা অন্য কোন Iron compd. morida কিম্বা maujete এর সঙ্গে ব্যবহার হইত; এখনও বেগুণী রং করিতে হইলে alizarine এর সঙ্গে Iron. madant ব্যবস্থা হইয়া থাকে metallic madant ছাড়া অন্যান্য madant এরও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন mordant বিশেষভাবে পাকা করিতে হইলে কোন একটী স্নেহ পদার্থ ব্যবহার হইয়া থাকে, সাধারণতঃ Turkey Red oil গন্ধকযুক্ত রেড়ির তেল এই কাজে লাগান হয়। ইহা গন্ধক দ্রাবক ও রেড়ির তৈলসংযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বস্ত্রকে এই oil madant করিয়া তাপ সংযোগে শুকাইতে হয়। এই তৈলের এক প্রধান জিনিস Reconobic acid। উচ্চ তাপে ইহা একটী anhydride এ পরিণত হয়। এই anhydride, al-oxideকে সূতার ভিতর খুব শক্ত ভাবে আঁটিয়া ধরে। ইহাকে fixing agent বলে। এরূপ প্রমাণ আছে যে, হিন্দুরা লাল রং করিবার জন্য প্রথমে দুগ্ধের ভিতর কাপড় ভিজাইয়া রৌদ্রে শুকাইত। তৎপরে ফট্‌কারীর জলে ঐ শুষ্ক বস্ত্র ভিজাইত। এখানে দেখা যাইতেছে যে, sulphated রেড়ির তেলের পরিবর্ত্তে দুগ্ধকে স্নেহ পদার্থ ভাবে ব্যবহার হইত এবং উচ্চ তাপের পরিবর্ত্তে রৌদ্রে শুকান হইত। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, ঐরূপ anhydrideএর ক্রিয়া পূর্ব্বেও জানা ছিল।

নীল জলের সঙ্গে মিশে না। উহাকে ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে প্রথমত

অবস্থান্তরিত করিয়া সাদা করিতে হয়। এই সাদা নীল জলে গলিয়া যায়, নীলের হাউঝ প্রস্তুত করিতে হইলে কোন একটী পরিবর্ত্তন-কারক পদার্থের প্রয়োজন, ইহা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, এদেশে নীলের মধ্যে চূণ, সাজীমাটী কোন একটী লৌহজাত পদার্থ ব্যবহার হইয়া থাকে। কখন কেবল মাত্র এক খণ্ড লৌহ এবং গন্ধক দ্রাবক ব্যবহার হয় এই হিরার কস এবং চূণ হইতে নীল হয়। এখন Hydro-sulphite এইজন্য রূপান্তরিত ভাবে ব্যবহার হয়, এবং ইহার ক্রিয়া অতি উৎকৃষ্ট। এবং এখনও নীল ব্যবহারের যতগুলি পদ্ধতি আছে, তাহার মধ্যে আমাদের দেশের এই পূর্ব্বাপর প্রচলিত পদ্ধতি একটী। এই সকল চর্চ্চা করিয়া বর্ত্তমান সময়ের খ্যাতনামা রঞ্জন রঙ্গালয়ের অধ্যাপকগণ প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্বন্ধে কোন বিশেষ স্থিরমত প্রকাশ করিতে সাহসী হন না। যদি বলিতে হয় যে, ইহা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, অতীত প্রাচীনকালে এদেশে বিজ্ঞান চর্চ্চায় অনেক উন্নতি হইয়াছিল। আর যদি বলিতে হয় যে, এ সকল কেবল মাত্র ব্যবহারিক জ্ঞান, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, যে সত্যগুলি এখনও স্থির সত্য বলিয়া গৃহীত, সেগুলি আবিষ্কার করিতে অনেক প্রয়োগ পরীক্ষা করিতে হইয়াছে, এবং পদার্থ বিদ্যার অনেক চর্চ্চা করিতে হইয়াছে।

অতি অল্প দিন হইল Rhea তন্তু Europeএর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এখন রঞ্জন বিদ্যাবিৎ এবং তন্তুতত্ত্বজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, রিয়া তন্তু ভবিষ্যতের বস্ত্র শিল্পের প্রধান উপকরণ হইবে। Rhea হইতে সূত্র প্রস্তুত ইত্যাদি এখন একটী বিশেষ আলোচনার বিষয় হইয়াছে। Rhea হইতে সূত্র প্রস্তুত করা বড় শক্ত। এইজন্য কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের ভারত গবর্ণমেণ্ট ৫০ হাজার টাকার একটী পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই Rhea নির্ম্মিত বস্ত্র মিশর দেশীয় পূর্ব্বকালের রক্ষিত শবাধারে পাওয়া গিয়াছে, এবং ভারতবর্ষে বর্ষির সূতা প্রস্তুত করিবার জন্য পাড়াগাঁয়ে গৃহস্থেরা ইহা হইতে নিজেরা সূতা বাহির করিয়া এই কাজে ব্যবহার করিয়াছে, এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই সূতা অতিশয় শক্ত, এমন কি, পাট অপেক্ষা প্রায় আট গুণ শক্ত। বড় বড় মাছ ধরিতে এই শক্ত সূতা ব্যবহার অনেক পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত ভাবিবার বিষয় নহে কি ?

আমার বিশ্বাস এই সকল শিল্প সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর হাতে আসিয়া

পড়িয়াছিল, এবং এই সকল ঘৃণিত ব্যবসা বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এখনও রংরাজেরা এদেশে নিম্নশ্রেণীর লোক। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সাহিত্য, দর্শন, এবং চিকিৎসাবিদ্যা চর্চ্চায় নিযুক্ত ছিলেন। এই সকল বিজ্ঞান এমন শ্রেণীর লোকের চর্চ্চার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল, যাহাদের দ্বারা কোন উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই।

উদ্ভিজ্জ—রং।

অনেকের বিশ্বাস আছে যে, ভারতবর্ষের উদ্ভিজ্জ রংগুলি দ্বারা ব্যবহারোপযোগী নানাবিধ পাকা রং করা যাইতে পারে। এ বিশ্বাস থাকা বিচিত্র নহে, কারণ আমরা এখনও প্রাচীন গৃহস্থদের ঘরে বহুকালের রং করা সুন্দর সুন্দর বস্ত্র দেখিতে পাই। সেই বেগুণী, ময়ুর কণ্ঠী, সমমানী, ঘরবতী প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর রংকরা বস্ত্র এখনও অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। চিত্র বিচিত্র calico print এখনও অনেক স্থলে বর্ত্তমান আছে। অতি প্রাচীন সময়ের calico print এবং কার্পেট সংগ্রহ আমি imperial Institute এ দেখিয়াছি। আপনারা জানেন যে, যে Industry এখন calico printing নামে পরিচিত, উহা এক সময়ে Calicut সহরে বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইত এবং calico নামও ঐ সহরের নাম হইতে হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের natural dyestuffs গুলির মধ্যে কেবল মাত্র ৪।৫টী পাকা রং করিবার পক্ষে উপযুক্ত এবং ২টী মাত্র commercially important. আমাদের দেশে যে সমস্ত পাকা রং হইত, তাহা কেবল ঐ গুলির সংমিশ্রণ। মানজিতের ভিতর রঞ্জনী পদার্থের নাম purpuria and not alizaride সুতরাং মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা যে লাল রং হইতে পারে, তাহা তত পাকা নহে। মরিণ্ডার রঞ্জনী পদার্থ alizarie, সুতরাং ইহা দ্বারা খুব ভাল পাকা রং হইতে পারে এবং Bundelkund এ লাল খেরুয়া ও হিসাবের খাতা বাঁধিবার কাপড় ইহা দ্বারা বেশ রং হইতে পারে। মরিণ্ডা দ্বারা রঞ্জিত কাপড় উঁইতে ধরে না। সুতরাং ইহা হিসাবের খাতা বাঁধাই করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং এই ভাবেই ইহা প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। নীল এবং খয়ের এখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকিতেছে। নীলের অবস্থা ভাল নহে, প্রতি বৎসর ইহার রপ্তানী হ্রাস হইতেছে। এবং আর কতদিন টিকিবে, বলা যায় না। Java নীলের পরেই বঙ্গদেশের নীল উৎকৃষ্ট। এই বঙ্গদেশের নীল এখনও বহুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। কিন্তু

বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুতীয় নীল (সংশ্লিষ্ট নীল) এখন বঙ্গদেশের নীলেরও স্থান অধিকার করিতেছে। ইহার দুইটী প্রধান কারণ আছে। ১। ইহা Paste অবস্থায় কিনিতে পাওয়া যায় সুতরাং ব্যবহার পক্ষে খুব সুবিধা। বঙ্গদেশের নীল ব্যবহারের উপযুক্ত করিবার পূর্ব্বে উহাকে চূর্ণ করিয়া কাদা কাদা করিতে হয়।

২। ইহাতে প্রকৃত রঞ্জনী পদার্থ কতটুকু আছে, তাহা জানা আছে। বঙ্গদেশের নীল ক্রয় করিবার পূর্ব্বে উহা বিশ্লেষণ করিয়া না কিনিলে ঠকিতে হয়। সুতরাং সাধারণ লোকেরা অল্প রঞ্জনী পদার্থের জন্য অনেক সময় বেশী পয়সা দিয়া থাকে এবং ঠকে। খয়ের এখনও প্রচুর পরিমাণে বিদেশে যায় এবং তুতের সংযোগে ইহাদ্বারা অতি উৎকৃষ্ট রং করা হয়।

অন্যান্য যেসকল উদ্ভিজ্জ রং আছে যথা কুসুম পলাস কমলা সেফালিকা হরিদ্রা ইত্যাদি ইহাদের কোনটীই পাকা রং করিবার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে না।

বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুতীয় রং এত আবিষ্কার হইয়াছে যে, উদ্ভিজ্জ রং এর ব্যবস্থায় প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। উদ্ভিজ্জ রং সকল বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু লাভজনক শিল্পের জন্য দুই একটী ব্যতীত ব্যবহার করা যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়না। ইউরোপে Weld, Furtic Madder, Cochineal প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ রং গুলি ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট ব্যবহার হইত, কিন্তু এখন আর ব্যবহার হয় না। ১৮৫৬ সনে সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক উপায়ে রং Sir William Pakin দ্বারা প্রস্তুত হয়। ১৮৬৮ সনে গ্রেবা ও নিবারম্যান বৈজ্ঞানিক উপায়ে alizarine প্রস্তুত করিয়াছেন। alizarine আবিষ্কারের পর হইতেই রঞ্জন শিল্পে বিপুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ১৮৭০ সনে যে alzarine ৬।৭ শিলিং পাউণ্ড দরে বিক্রয় হইত, এখন অহার মূল্য ৯ পেনি এক পিপে। alizarine দ্বারা যে কাজ হইতে পারে, এক জাহাজ বোঝাই madder দ্বারা তাহা হয় না, অথবা একঘর বোঝাই মরিণ্ডা কিম্বা মঞ্জিষ্টা দ্বারা তাহা হয় না। পূর্ব্বে এদেশে যে পদ্ধতি অনুসারে Turkey Red প্রস্তুত হইত, তাহাতে ৩ সপ্তাহ লাগিত এবং জিনিষও খুব পাকা ও দেখিতে খুব সুন্দর হইত। কিন্তু প্রতিদ্বন্দিতায় টিকিতে হইলে সময় ও পরিশ্রমের মূল্য দেখিয়া বলিতে হয়। alizarine সংযোগে নূতন পদ্ধতি অনুসারে Turkey Red ৪।৫ দিনে শেষ হয়।

যদি কেহ ভাবের উপর বলিতে চান বলিতে পারেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দিতায় টিকিতে হইলে আমাদিগকে পুরাতন ছাড়িয়া নূতনকে ধরিতেই হইবে। সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতি কাজে লাগাইতে হইবে। এখন কেহ পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে Turkey Red প্রস্তুত করিতে চাহিলে তাহাকে আমরা বাতুল বলিব। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমস্ত পৃথিবীর সম্পত্তি। ইহাতে আপনপর নাই। সুতরাং যেটী উৎকৃষ্ট ও সম্ভবপর, তাহা বিদেশী হইলেও ধরিতেই হইবে। না ধরিলে আমাদের লুপ্তপ্রায় শিল্পের উদ্ধার কল্পনামাত্র।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে সকল রং প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু বলিব। বর্ত্তমান সময়ে প্রায় ১২০০ রং এইরূপে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি লাভজনক শিল্পের উপযুক্ত। রঞ্জন রসায়ন মোটামোটী দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) রাসায়নিক উপায়ে রং প্রস্তুত করতঃ ইহাদের গুণানুসারে শ্রেণী বিভাগ করা এবং রাসায়নিক গঠন (constitution) ঠিক করা ইত্যাদি। ২। এই সময়ে রংগুলির গুণানুসারে শিল্প-কার্য্যে প্রয়োগ। এই দ্বিতীয় ভাগকেই রঞ্জনশিল্প বলে। ইহা বৈজ্ঞানিক ভাবে বুঝিতে হইলে এবং করিতে হইলে এই সমস্ত রংগুলির গুণ জানা চাই এবং যে জাতীয় বস্ত্র কিম্বা সূত্র কিম্বা রং করার উপযুক্ত জিনিষ যথা কাট, মৃত্তিকা, মোম, গালা খড়ের উপর ঐ সকল প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহাদের মৌলিক পদার্থগুলির সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা চাই।

রঞ্জনশক্তি অনুসারে রং গুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

(1) Biasic (2) acid (3) salt (4) mordant (5) colours formed on the fibre (6) developed colours (7) vat colours·

তন্তু গুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

উদ্ভিদ তন্তু	জান্তব তন্তু
তুলার তন্তু	পশম ও রেসম

এ ব্যতীত কৃত্রিম তন্তু আছে যথা—কৃত্রিম রেসম,

বিশুদ্ধ তুলার প্রধান উপকরণ cellulose, বিশুদ্ধ পশমের প্রধান উপকরণ keratin, বিশুদ্ধ রেসমের প্রধান উপকরণ fibroin cellulose কেবল C. H. O এর সংযুক্ত পদার্থ কিন্তু keratin & fibroin C. H. O & N এর

সংযুক্ত পদার্থ। এই প্রকার সমস্ত উদ্ভিজ্জতন্তুর প্রধান উপকরণ সমূহ কেবল তিনটী মৌলিক পদার্থে গঠিত এবং সমস্ত জান্তব তন্তুর প্রধান উপকরণ সমূহ চারিটা মৌলিক পদার্থে গঠিত। এক শ্রেণীর মৌলিক পদার্থের ভিতর যবক্ষারজান আছে, অপর শ্রেণীর মৌলিক পদার্থের ভিতর উহা নাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই মূল তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া পৃথক পৃথক শ্রেণীর সূত্রের রঞ্জন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই দুই শ্রেণীর তন্তুর উপর ক্ষার এবং দ্রাবকের ক্রিয়া পৃথক পৃথক।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবে রঞ্জন করিতে হইলে তন্তুগুলির গুণ জানা প্রয়োজন। এই গুলি জানা না থাকিলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

এখন এই পৃথক পৃথক শ্রেণীর তন্তুর সঙ্গে পৃথক পৃথক শ্রেণীর রংএর ক্রিয়া সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলিব। সমস্ত কথা বলিতে হইলেই কঠিন হইয়া পড়িবে। মোটামোটী বলিতে হইলে বলা যায়, Basic রং দ্বারা জান্তব তন্তু পশম, রেসম সহজে রং করা যায়। কিন্তু সূতা রং করিতে হইলে উহাকে Tannic acid দ্বারা করিতে হয়। আমাদের দেশে Tannic acid এর অভাব নাই। বিনা পয়সায়ও যথেষ্ট পাওয়া যায়। হরিতকী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই হরিতকী সংযোগে Basic রং দ্বারা সুন্দর উজ্জল রং সুতার উপর করা যায়। ইহা খুব পাকা না হইলেও মন্দ নহে। সতরঞ্চ ইত্যাদির রং করার পক্ষে এই পদ্ধতি আমাদের দেশের সস্তায় এবং সহজে হইতে পারে; পর্দার কাপড় ও নানাবিধ ছিট, যাহাকে প্রতি সপ্তাহে ধোপার অত্যাচার সহ্য করিতে হয় না, তাহাতে এইভাবে হইতে পারে।

রেসমের উপর সাবানের জল সংযোগে এই শ্রেণীর রং দ্বারা বেশ রং হয়। রঞ্জন পত্রের তাপ অনেক নিম্নে রাখিতে হয়। ৫০ ৬০ ডিক্রীর উপরে নহে। সাবানের উদ্দেশ্য অসম রঞ্জন নিবারণ করা।

কার্পাসজাত বস্তুর উপর এশ্রেণীর রং দ্বারা পাকা রং হয় না। এই শ্রেণীর রং ব্যবহার করিলে একবার ধুইলেই প্রায় সাদা হইয়া যায়।

পশম এবং রেসমের উপর এই শ্রেণীর রং যথেষ্ট ব্যবহার হইয়া থাকে। পাকা রং করার উদ্দেশ্যে গন্ধক দ্রাবক এবং ক্ষার দ্রাবক ব্যবহার করা হয়।

লবণযুক্ত বর্ণ—এই শ্রেণীর রং কার্পাসজাত বস্তুর উপর সহজে ব্যবহার করা

যায়। ইহার উদ্দেশ্য রঞ্জন পাত্রের সমস্ত রং আকর্ষণ করা। রেসমের উপর দুই একটি ছাড়া এই শ্রেণীর রং ব্যবহার হয় না।

এক শ্রেণীর রং কতেক উদ্ভিজ্জাত এবং কতেক বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রস্তুত হয়। ইহা দ্বারা সকলের উপরই অতি উৎকৃষ্ট রং করা যায়। Logwood, Madder, প্রভৃতি এই শ্রেণীর রং। এখন এলিজেরাইন এই শ্রেণীর প্রধান রং। ইহার অপরিসীম ব্যবহার শুনিলে অবাক হইতে হয়। মাদ্রাজ প্রদেশে বস্ত্র রঞ্জন শিল্প অনেক আছে। এক বৎসরে এই প্রদেশে এই রং ১৭ লক্ষ টাকার বিক্রয় হইতেছে। ইহা অনেক প্রকার আছে। এই সমস্ত পৃথক পৃথক রং দ্বারা সমস্ত প্রকার তুলা, পশম ও রেসম উপর পাকা রং করা যায়।

Aniline black সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বল ও পাকা কাল রং। ইহার প্রস্তুতের ৩।৪ বিভিন্ন পদ্ধতি আছে।

রং-প্রকাশক সংযোগে এক প্রকার রং হইতে নানা প্রকার রং করা যায়। Primaline নামক রং হইবার প্রধান উদাহরণ। লবণ সংযোগে Primaline দ্বারা Primrose পীতবর্ণ রং করা যায়। তৎপরে বিভিন্ন প্রকারের বস্তু দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের রং করা যায়। এই শ্রেণীর উদাহরণ নীল।

সমস্ত রঞ্জন ও মুদ্রণ শিল্পের একটি বিস্তৃত জ্ঞান পাইতে হইলে রসায়ন শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লইয়া আরম্ভ করা প্রয়োজন।

এখন কার্পাসজাত বস্তু ও পশম সম্বন্ধে অল্পকিছু বলিয়া শেষ করিব।

আমাদের দেশে কার্পাস চাসের উন্নতি না করিতে পারিলে বস্ত্র বয়ন বিদ্যার অধিক উন্নতি সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। সূক্ষ্মস্থূল বস্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে তাহার বিশিষ্ট কার্পাস প্রয়োজন। মিসরের কার্পাস কিম্বা আমেরিকার কার্পাস এ দেশে আমদানী করিয়া সূত্র প্রস্তুত করিতে হইলে পারিয়া উঠা যাইবে না। সিন্ধুপ্রদেশে মিসর—কার্পাস চাষের চেষ্টা হইয়াছে এবং অনেকটা কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছে। বড় ও ছোট তাতের উপর রঞ্জন শিল্পের ভাল মন্দ অনেক সময় নির্ভর করে। মিসর ও আমেরিকার কার্পাসে প্রস্তুত সুতা দেখিতে বেশ চক্‌চকে। এই সূতার উপর রং বেশ খোলে এবং রঞ্জিত সূতা বেশ চক্‌চকে দেখায়। আমাদের দেশের কার্পাসে তা হয় না। caustic সোডার সহিত cellulose এর ক্রিয়া হইলে কার্পাসের ভিতর এক প্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয়। এই ক্রিয়া লম্বা তন্তু বিশিষ্ট কার্পাসের উপর অতি সুন্দর। সূতা দেখিতে ঠিক রেসমের

ন্যায় চক্‌চকে হয়; এই তুলা রঞ্জন পদার্থ ভাল রকম আকর্ষণ করে। আমাদের দেশের ছোটতাতবিশিষ্ট কার্পাসের এইরূপ হয় না এবং সে রকম সুন্দর রংও হয় না; কার্পাসের উন্নতি না হইলে এই অভাব গুলি পূরণ হইবে না; লম্বা তাত বিশিষ্ট কার্পাস আমাদের দেশে না হওয়ার কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না; ঢাকার মসলিনের সূতা পার্ব্বত্য ত্রিপুরার কার্পাস হইতে হইত; এখনও তথায় লম্বা তাতের সূতা জন্মে; চেষ্টা করিলে এই কার্পাস প্রচুর পরিমাণে জন্মান যাইতে পারে।

আমাদের দেশে রেসমের ব্যবসায় একটু বিশেষত্ব আছে; স্বভাবতঃই আমাদের দেশ এই ব্যবসার জন্য উপযুক্ত এবং বহু প্রাচীন কাল হইতে ইহা আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে; কেবল তাহা নহে, এদেশ হইতে অনেক রেসম বহুকাল হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়া আসিতেছে; কিন্তু কার্পাস ব্যবসার অবস্থা সেরূপ নহে; আমাদের নিজেদের অভাব পূরণ করিয়া বিদেশে রপ্তানী করিবার ন্যায় ক্ষমতা কত কাল পরে হইবে, বলা যায় না; মিসরের ছোট ও বড় কার্পাসের ন্যায় উৎকৃষ্ট কার্পাস বহুল পরিমাণে জন্মাইয়া তাহা হইতে জিনিষ প্রস্তুত করিয়া বিদেশী বাজার জয় করিতে যে চেষ্টা ও সময় লাগিবে, তাহার সহস্র ভাগের একভাগ চেষ্টায় আমাদের রেসমের ব্যবসা উন্নত করিয়া এ দেশকে একটী প্রধান রেসম ব্যবসায়ের কেন্দ্র করিয়া তুলিতে পারা যায়।

রেসমরঞ্জন ও রেসম ছিট প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমাদের দেশের রেসম সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। পলু পোকার রেসম সাধারণতঃ রেসম নামে পরিচিত। অন্যান্য প্রকার রেসম বন্যরেসম নামে পরিচিত। পলুপোকা হইতে যে সূতা হয়, তাহাকে organzine বলে এবং নিকৃষ্ট গুটি হইতে যে সুতা হয় তাহাকে Tram বলে। organzine টানা ভাবে ব্যবহার হয় এবং Tram পৈরেণ ভাবে ব্যবহার হয়। স্থিতি স্থাপকতা, কাঠিন্য প্রভার এ তারতম্য থাকার জন্য ইহাদের রঞ্জন পদ্ধতিতে তারতম্য করিতে হয়। রেসমের উজ্জ্বলতা ইহার সর্ব্বপ্রধান স্বাভাবিক গুণ। থারি রঞ্জন ক্রিয়া অতি সাবধানে করিতে হয় যেন ইহার উজ্জ্বলতা নষ্ট না হয়। অনেক সময় রঞ্জনপদ্ধতি ও রাসায়নিক বস্তু দ্বারা উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়। এই উজ্জ্বলতা অনেক সময় যন্ত্র ও তৈলসংযোগে পালিশ করা যায়।

রেসমরঞ্জক ও Bleacher-দিগের রেসমের রাসায়নিক উপকরণ সম্বন্ধে

সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। রেসমতন্তুর প্রধান মূল উপাদান দুইটী—(১) Fibroin, ভিতরের অংশ। সমস্ত তন্তুর ইহা প্রায় ⅚ অংশ। (২) উজ্জ্বলতা বাহিরের আচ্ছাদন পদার্থ ইহার রং হলুদে। ইহা সহজে ফুটন্ত জল গরম সাবান ও ক্ষারসংযোগে গলিয়া যায়। রেসমতন্তুকে সাদা করিতে হইলে অথবা রঞ্জনের উপযুক্ত করিতে হইলে সাবান কিম্বা পাতলা ক্ষার ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতেও এই হলুদে রং নিয়া সম্পূর্ণ সাদা না হইলে ইহাকে bleach করিতে হয়।

রেসমের ওজন বৃদ্ধি করা একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়; রঞ্জন এবং finishing এর সময় ওজন বৃদ্ধি করার রাসায়নিক উপায়ে শতকরা ২০০—৩০০ গুণ ওজন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে; কাল রেসমের ওজন বৃদ্ধি করিতে হইলে সাধারণতঃ নাইট্রেট লৌহ এবং ট্যানিন্ ব্যবহার হয়। প্রথম-টীতে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে দ্বিতীয়টীর ভিতর দিতে হয়। রেসম অতিশয় চিনি আকর্ষণ করিতে পারে। আমাদের দেশে এই চিনি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ইহাতে ওজন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

রেসমের রং করিতে উত্তাপ সম্বন্ধে সাবধান হইতে হয়। অল্প তাপে ইহার ক্রিয়া বেশী হয় সাধারণতঃ ৭০ ডিগ্রীর উপর উঠিলে রং আকর্ষণ শক্তি কমিয়া যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর রং এর জন্য বিভিন্ন দ্রব্য ব্যবহার করা দরকার।

Acid colours—acid bath ($H_2 5o_4$)

Salt Dyestuffs—acetic acid bath

Madant dyes— ... ... পৃথক পৃথক পদ্ধতি।

আমাদের দেশে যাহারা অল্প অল্প রেসম রঞ্জন করিয়া থাকে, তাহারা উহা ভাল জানে না। এই জ্ঞান রেসম রঞ্জনে একটী মূল্যবান পদার্থ।

কোন রং কোন সময়ে ব্যবহার করা উচিত, তাহা অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। কোন কোন জিনিষ সর্ব্বদা ধুইতে হয়, সুতরাং রং ধোতে পাকা হওয়া দরকার, যেমন ধুতির পাইড়। কোন জিনিষ রৌদ্রে এবং আলোতে সর্ব্বদা থাকিবে। সুতরাং রং ধোতে বিশেষ পাকা না হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু রৌদ্র ও আলোতে পাকা হওয়া দরকার। সস্তায় রং করিতে হইলে সে দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। এ সকল বিষয় সংক্ষেপে বলা বড়ই কঠিন এমন কি অসাধ্য।

বন্য রেসমের মধ্যে তসর মুগা ও এড়ি প্রধান। ইউরোপে তসরের খুব

আদর। এই শিল্পটী সুশৃঙ্খল পদ্ধতি অনুসারে চলেনা বলিয়া ইউরোপে ইহার বাজার ঠিক থাকে না। একটু চেষ্টা করিয়া শিক্ষিত লোকেরা এই ব্যবসা হাতে নিলে ইহা একটী ভাল জিনিষ হইতে পারে। ইহার কীর্ত্তি দিন দিনই বাড়িতেছে।

তসর রঞ্জন করা একটু শক্ত। ইহার ছিদ্রশূন্য তন্তুতে সহজে রং প্রবেশ করিতে চাহে না। তসরের উপর কাল রং একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষ। ইহার ইউরোপেও আদর আছে। এখন পর্য্যন্ত কোন ভাল পদ্ধতি আবিষ্কার হয় নাই। এদেশেও আলপাকার পরিবর্ত্তে কাল তসর ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ছিটপ্রস্তুত—সম্বন্ধে একটু না বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করা অনুচিত। এরূপ লিখিত আছে যে, এই শিল্প সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে হইয়াছিল। কিন্তু ইহার উন্নতি এদেশে বেশী হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে এদেশে যেটুকু আছে, তাহা অতি নিকৃষ্ট রকমের অতি প্রাচীন কালে যে কাষ্ঠ-সাজ দ্বারা ছাপাপদ্ধতি ছিল, এখনও তাহাই আছে। যন্ত্রের ব্যবহার এদেশে ছিল না। সম্প্রতি বম্বেতে একটী ছোট কারখানা হইয়াছে। ছিট প্রস্তুত পদ্ধতি তিন রকম আছে (১) সোজাসোজি ছাপা (২) রং করিয়া উঠাইয়া ফেলা (৩) রং করিবার পূর্ব্বে শুভ্রস্থান আবৃত করিয়া রাখা। এদেশে কেবল নিকৃষ্ট রকমে একটু ছাপা হয়। মোম দিয়া কাপড়ের উপর ছবি করিয়া পরে তাহা শীতল অবস্থায় রং করা হইত। রং করার পর গরমজলে ধুইয়া ফেলিলে মোম গলিয়া গিয়া সাদা বাহির হইত। আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে ছিট প্রস্তুত এদেশের একটী প্রধান শিল্প হইবে। এতদ্দেশে স্থানে স্থানে একটু আধটু রেসম চিত্র এখনও আছে। শ্রীরামপুরের রুমাল এবং নামাবলী এখান হইতে মান্দ্রাজে অনেক রপ্তানী হইয়া থাকে।

মুর্শিদাবাদের রং করা রেসম ব্রহ্মদেশে আফ্রিকা এবং ইউরোপেও বহুল পরিমাণ কাটতি ছিল; আফ্রিকায় অনেক রপ্তানি ছিল। ব্রহ্মদেশে এই রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে; জাপানী রেসম সে বাজার অধিকার করিয়াছে; ইহার কারণ একমাত্র এই যে, জাপান্ এখনকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে রঞ্জন ও bleaching করিয়া অতি সস্তায় সুন্দর জিনিষ দিতেছে। মুর্শিদাবাদে এখনও লাক্ষাদ্বারা রং করা রেশম আফ্রিকা ইউরোপে যায়। লাক্ষার পরিবর্ত্তে অন্ত রং ব্যবহার করিলে অনেক সস্তা হইবে। আমার উপদেশ

লইয়া মুর্শিদাবাদের একজন মহাজন অন্ত রং করিয়া অনেক রেসম আফ্রিকা পাঠাইয়াছেন; মুর্শিদাবাদে রেসমের আর একটী সুন্দর শিল্প আছে রং করিবার পূর্ব্বে ইচ্ছামত চিত্র শেলাই করিয়া পরে রং করা হয়। ইহাতে ছিটে ছাপার মত ক্রিয়া হয়; কিন্তু এই নিকৃষ্ট উপায়ে করিলে কত দিন এই সুন্দর শিল্পটী টিকিবে বলা যায় না; ইহাও বিদেশে রপ্তানী হয়। অতি সহজে ও সস্তায় রং করার পরে discharge print করিয়া দিলে সময়ও অর্থের বহুল লাভ হয়, আমি একজন মহাজনকে একখানা নমুনা করিয়া দিয়াছিলাম; ইহাতে বাষ্প প্রয়োজন হয়, তিনি ইহার নাম শুনিয়াই পিছাইয়া গেলেন।

রেসম শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকিতে হইলে কেবল রেসম চাষ পদ্ধতির উন্নতি করিলে হইবে না, রঞ্জন ও bleaching এর উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যে যে জেলায় রেসমের চাষ আছে, সেই সেই জেলায় ছোট ছোট রঞ্জন কারখানা খোলা উচিত। ইহাতে বেশী যন্ত্র দরকার হয় না। ছোট একটী খাড়া বয়লার, একটী ছোট এঞ্জিন কল, একটী ছোট বারি নিষ্কাসক যন্ত্র এবং কয়েকটী কাঠের রঞ্জন পাত্র হইলেই একটী ছোট রঞ্জন কারখানা হইতে পারে। ৪।৫ হাজার টাকায় যন্ত্র ইত্যাদি এবং ২০০০৲ টাকায় রাসায়নিক বস্তু ও রং হইলেই একটী ছোট খাট রঞ্জন কারখানা হইতে পারে। এরূপ ৩।৪ টী রঞ্জন কারখানা প্রত্যেক জেলায় হইলে অল্পসময়ের মধ্যে এই শিল্পটীর অনেক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। দুই-চারি রকমের রং এক কারখানায় হইলেই অনেক কাজ হইয়া যায়। ইহার জন্য লোক শিক্ষিত করিয়া দেওয়া কঠিন কাজ নহে। কার্পাস জাত বস্তু রং করার ব্যবসা অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য একটু বড় রকম কারখানা না করিলে লাভজনক হয় না কিন্তু রেশম রঞ্জন শিল্পে এদেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। ইহা ছোট হইলেও অনায়াসে চলিতে পারে। এই সকল ছোট রঞ্জন কারখানা হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ রেশম রং হইতে পারে।

অনেক সময় আমরা পরের জিনিষ দেখিয়া বড় ভুলিয়া যাই। আমাদের সে গুলি উপযুক্ত কিম্বা বাঞ্ছনীয় কিনা, তাহা না ভাবিয়াই একটা মনে মনে স্থির করিয়া রাখি। এদেশে কুটীর শিল্প আমরা যত বাড়াইতে পারি, তত মঙ্গল। জর্ম্মণিতে আমি যে রঞ্জনশালায় কাজ করিতাম, সেটী এত বৃহৎ যে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। ১৫ মাইল রেইলওয়ে ঐ কারখানার ভিতর। ২০০শত Doctors of Chemistry তথায় কাজ করেন। সেই সকল বড় কথা ভাবিলে

আমাদের চলিবে না। বিশেষতঃ আমার বোধ হয় যে বড় বড় কারখানায় কেবল মাত্র এক শ্রেণীর লোকের উপকার। দরিদ্র লোকদিগের হাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত শোষণ করিয়া নিজের উদর পূরণ করেন। উহারা গো মেষের মত জীবন যাপন করে। কুটীর-শিল্পে দেশের ব্যবসায়ী শ্রেণীর দৈহিক মানসিক উন্নতি হইবে। আবার বাঙ্গালীর ঘরে হাসি ফুটিবে।

রং অনুকরণ বিষয়টি একটু শক্ত। একটী রং দেখিয়া ঠিক তদ্রূপ রং করার নাম রং-অনুকরণ। কেবল রং এক রকম হইলেই হয় না, ইহার অন্যান্য গুণ গুলিও বজায় রাখা চাই। একটী রং দেখিয়া ঠিক সেইরূপ রং কাপড়ের উপর করা যাইতে পারে। এবিষয় এতদিন এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, কেবল অভিজ্ঞতা দ্বারাই এই কাজ হইতে পারে। পূর্ব্বে সম্ভব হইতে পারিত, কারণ তখন কেবল অতি অল্প সংখ্যক রং ব্যবহার হইত। এখন ইহার জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রথম দরকার, তৎপরে অভিজ্ঞতা। ঠিক দেখিতে এক প্রকার রং অনেক রকমেই হইতে পারে। অথচ একটী হয়ত খুব কাচা হইবে এবং একটী পাকা হইবে। সুতরাং অনুকরণ করার উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা কোন্ রং কিরূপ, তাহা সহজেই নির্ণয় করা যায়। এক এক শ্রেণীতে অনেক রং আছে, তাহাদের মধ্যেও কোনটী ব্যবহার করা হইয়াছে, ইহা ঠিক করা এখন আর কঠিন কাজ নহে। পরে যখন রংটী ঠিক হইল, তখন তাহার পরিমাণ ঠিক করা কেবল একটু সাধারণ অভিজ্ঞতার কার্য্য।

স্বয়ংবহ যন্ত্র।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে এই যে প্রবন্ধ উপস্থিত করিতেছি, তাহাতে নূতন কথা কিছুই নাই। ভূমণ্ডলে নূতন নাকি কিছুই নাই। থাক্ বা নাই থাক্, আমরা পুরাতনের দিকে তাকাইয়া সুখী হই, কখনও বা কদাচিৎ ক্ষুব্ধও হই। কিন্তু একথা নিশ্চিত, পুরাতনের সহিত নূতনের যোগ ঘটাইতে না পারিলে নূতন দ্বারা জাতীয় দেহের পুষ্টি হয় না।

কালের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। প্রাচীনেরা দিনে সূর্য্য এবং রাত্রে তারা দেখিয়া সেই এক-টানা স্রোতের বিভাগ করিতেন। কিন্তু দিবা ও রাত্রি ছোট নয়, পূর্ব্বাহ্ণপরাহ্ণও ছোট নয়। দিবাভাগে উচ্চ বৃক্ষের ছায়া, যষ্টির ছায়া, এমন কি, আমাদের দেহের ছায়া পরিমাণ করিয়া স্থূলতঃ কাল অবধারণ করায় বিচিত্র কিছু নাই। বোধ হয় ইহা হইতে দণ্ড অর্থে কাল-বিভাগ-বিশেষ হইয়াছে।

কিন্তু ছায়াও সূর্য্য-সাপেক্ষ। এই হেতু তাম্রী বা ঘটীর প্রচলন হইয়াছিল। তাম্রনির্ম্মিত ঘটের নিম্নার্দ্ধ লইয়া ঘটী যন্ত্র হইত। ইহার আকার মাথার খুলীর তুল্য। এই হেতু কোন কোন সিদ্ধান্তে ইহাকে কপাল-যন্ত্রও বলা হইয়াছে। ঘটের অধোভাগে সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকিত। স্বচ্ছ জলে ভাসাইয়া দিলে ঘটে ছিদ্র দিয়া জল প্রবেশ করিত এবং কিয়ংকাল পরে ডুবিয়া যাইত। অহোরাত্রে—জ্যোতিষে নাক্ষত্র অহোরাত্রে—ষাটি বার ডুবিতে পারে, এইরূপ প্রমাণের ঘটী নির্ম্মিত হইত। যে সময়ে ঘটী একবার ডুবিত, সে সময়ের নাম ও ঘটী বা ঘটিকা। ঘটী হইতে বাঙ্গালা ঘড়ী শব্দ। ঘটীতে ষাটি পল পরিমিত জল ধরিতে পারিত। ৬০ পলে এক ঘটিকা। বাঙ্গালা তেলের পলাতে সেই পল শব্দ রহিয়াছে। ঋগবেদাঙ্গ জ্যোতিষে ঘটীর পরিবর্ত্তে প্রস্থ সংজ্ঞা আছে। বিষ্ণু পুরাণেও প্রস্থ সংজ্ঞা আছে। জল তৈলাদির মান পাত্রের নাম প্রস্থ ছিল। অতএব কত প্রাচীন কাল হইতে যে এদেশে ঘটী যন্ত্রের ব্যবহার আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না।

কিন্তু যে যন্ত্র দ্বারা কালজ্ঞানার্থ লোক বসাইয়া রাখা আবশ্যক, তাহা কদাপি

সকলের ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে না। এই হেতু লল্লাদি জ্যোতিষী ঘটী নির্ম্মাণের উপদেশ করিয়াছেন। এক অহোরাত্রে ঘটী কতবার ডুবিল, তাহা জানিয়া ত্রৈরাশিক দ্বারা সেই ঘটী কাল পাওয়া যায়। ব্রহ্ম গুপ্ত (খ্রীঃ ৭ম শতাব্দী) অন্য প্রকার ঘটী যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইষ্ট-প্রমাণ নলকের (সমপরিবর্ত্তুল পাত্রের) মূলে ছিদ্র করিয়া জলপূর্ণ করিবে। এক এক ঘটী কালে জলস্রাব হেতু জলের উচ্চতা যত যত কমিয়া
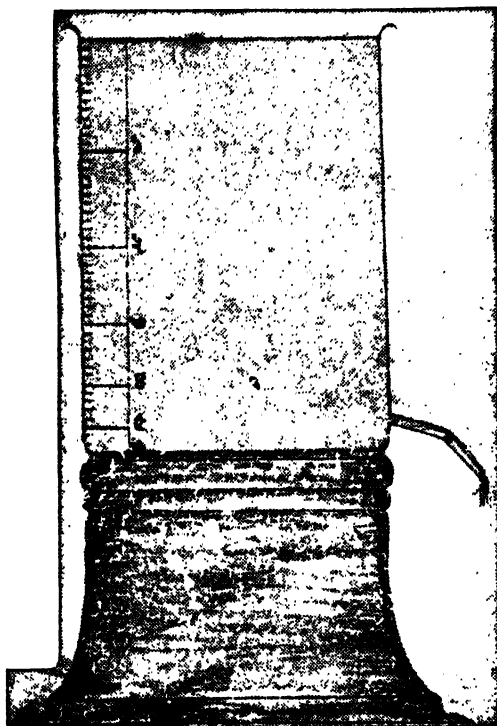
১ম চিত্র। নাড়িকাযন্ত্র।

যাইবে, নলকের গায়ে সেখানে সেখানে অঙ্ক দিলে, অনায়াসে কাল জ্ঞান হইতে পারিবে। ১ম চিত্র দেখুন। ঘটী যন্ত্রের প্রত্যেক নিমজ্জন না দেখিলে সময় জানা যায় না, নাড়িকা যন্ত্রে সে অসুবিধা নাই। বোধ হয় এই নাড়িকা-যন্ত্র নাম হইতে দণ্ড বা ঘটীর নামান্তর নাড়ী বা নাড়িকা হইয়াছে।

শুধু এদেশে নয়, প্রাচীন মিশরে ও বেবিলোনিয়াতে এবং তথা হইতে গ্রীসে এবং য়ুরোপের অন্যান্য দেশে জলস্রাব দেখিয়া সময় জ্ঞান হইত। শুধু প্রাচীন কালই বা কেন, খ্রীষ্টের ১৬শ শতাব্দীতে দেনমার্ক দেশীয় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ তায়কো-ব্রাহি তাঁহার বেধ-শালায় জল-ঘড়ী দ্বারা কাল পরিমাণ করিতেন। চীনেরা এখনও করে, এবং আমাদের দেশ হইতে তাঁবী এখনও তিরোহিত হয় নাই।

কিন্তু আমাদের তাম্রী ও য়ুরোপের জল-ঘড়ীর মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। এদেশে তাম্রীতে জল প্রবেশ দেখিয়া, য়ুরোপে পাত্র হইতে জল নিঃসরণ দেখিয়া কালজ্ঞান হইত। পাত্র হইতে ছিদ্র পথে জল নিঃসৃত হইতে থাকিলে সমকালে সম পরিমিত জল বহির্গত হয় না। কারণ পাত্রে জলের উচ্চতা যত কমিতে থাকে, জল-স্রাব-বেগ তত কমে। এই হেতু জলপাত্র সর্ব্বদা জলপূর্ণ রাখিতে হইত। ২য় চিত্র দেখুন।

আরও প্রভেদ আছে। গ্রীকদিগের গণনায় দিবা অর্থে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তকাল, এবং এই কালের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগের নাম ঘণ্টা ছিল। সুতরাং গ্রীষ্মকালে তাহাদিগের ঘণ্টা দীর্ঘ এবং শীতকালে হ্রস্ব হইত। এরূপ অসমান-ঘণ্টা-জ্ঞাপক জল-ঘড়ী নির্ম্মাণ করা সহজ ছিল না। আমাদের সে অসুবিধা ছিল না; জ্যোতিষে অপরিবর্ত্তনীয় নাক্ষত্র অহোরাত্র, লৌকিক ব্যবহারে সাবন অহোরাত্র সমান ভাগ করিলেই চলিত। সুতরাং ঋতুভেদে ছোট-বড় ঘটী আবশ্যক হইত না।

পূর্ব্বকালে নাড়িকা যন্ত্রের জল-স্রাব দ্বারা বহুবিধ যন্ত্র চালিত হইত। লল্ল (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী,) ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর প্রভৃতি প্রাচীন খ্যাতনামা জ্যোতিষীগণ এই প্রকার যন্ত্র ন্যূনাধিক বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, সেদিনকার মহামহোপাধ্যায় ৺ চন্দ্রশেখর সিংহ সামন্ত মহাশয়ও এইরূপ যন্ত্র রচনা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। যে যন্ত্র আপনি ভ্রমণ করিতে থাকে, যাহা কোন মানুষ চালায় না, সে যন্ত্রকে প্রাচীনেরা স্বয়ংবহ বলিতেন। এক দিন সামন্ত মহাশয়কে স্বয়ংবহ নির্ম্মাণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া-
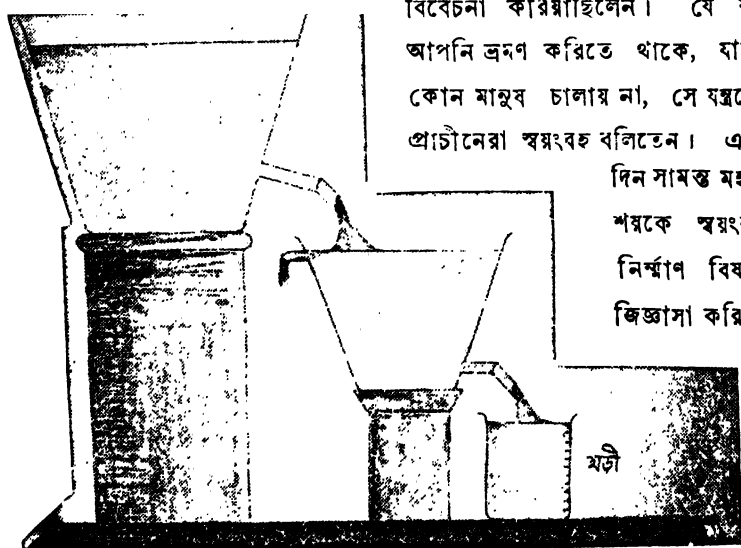
২য় চিত্র। জলঘড়ী।

ছিলাম। তিনি লল্ল ও ব্রহ্ম গুপ্ত কখনও দেখেন নাই ; সূর্য্য সিদ্ধান্ত ও ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণি তাঁহার সম্বল ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, এই যন্ত্রের সম্পূর্ণ বর্ণনা কোথাও পাই নাই, প্রাচীন সিদ্ধান্ত-লিখিত সূত্র-জল-পারদ এবং অলাবু স্মরণ করিয়া নিজের অনুভবদ্বারা এক স্বয়ংবহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। সে যন্ত্রের আকার এই। ৩য় চিত্র দেখুন। একটী চক্র দুই আধারে স্থিত আছে। চক্রের নেমিতে এক সূত্র বেষ্টিত
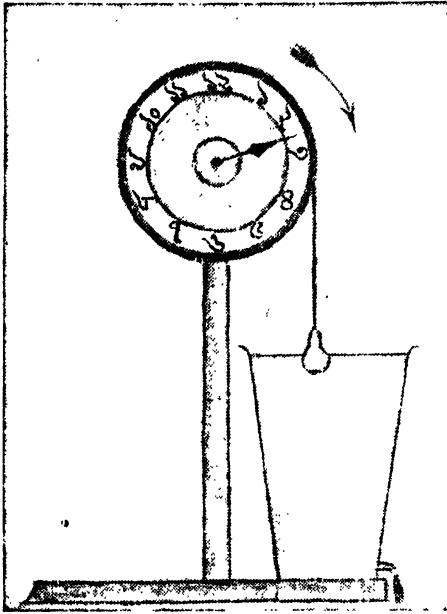
৩য় চিত্র। স্বয়ংবহ ঘটীচক্র।

আছে। সূত্রের এক অগ্র চক্রে বদ্ধ, অন্য অগ্র হইতে কিঞ্চিৎ পারদযুক্ত এক অলাবু লম্বিত আছে। এই অলাবু এক বৃহৎ জলকুণ্ডের জলে ভাসিতেছে। কুণ্ড হইতে জলস্রাব হইলে অলাবু নিম্নগামী হয়, তখন সূত্র-বদ্ধ চক্রটী অল্পে অল্পে ঘুরিতে থাকে।

বলা বাহুল্য, তাঁহার উদ্ভাবনা শক্তির পরিচয়ে আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। আর বুঝিয়াছিলাম, আমারে চিন্তাপ্রণালী অধুনা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। কারণ যদিও অবিকল এইরূপ যন্ত্র ব্রহ্মগুপ্ত বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার একটী আর্য্যা হইতে বস্তু জ্ঞান হওয়া দুরূহ।*

---

* এমন দুরূহ যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ও ব্রহ্মগুপ্তের টীকায় অর্থান্তর ঘটাইয়াছেন। দ্বিবেদী মহাশয় মনে করিয়াছেন, জলস্রাবের আঘাতে চক্রটী ভ্রমণ করিবে। বস্তুত" জলস্রাবহেতু অলাবু নামিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে চক্রটী ভ্রমণ করে। ব্রহ্মগুপ্তের শ্লোকটী এই.—

কীল স্থোপরিগামিনি তৎপর্য্যয় সূত্রকে ধৃতমলাবু।

প্রাগ্বহ্নলকে প্রক্ষিপ্য নাড়িকা স্রবতি পানীয়ে।

কোন প্রকারে একটা গতি পাইলে তদ্দ্বারা পুত্তলিকার নৃত্যের তুল্য অন্য বস্তুর গতি সম্পাদন করিতে পারা যায়। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ নাড়িকা-যন্ত্র সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্র চক্রও ঘুরাইতেন। আজিকালি বিদ্যালয়ে বিলাতী "ওরেরী" যন্ত্র যেরূপ, সেকালে গোল যন্ত্র সেরূপ ছিল। জলস্রাব দ্বারা তাহা ঘূর্ণিত হইত। সুতরাং প্রচুর শিল্পনৈপুণ্য আবশ্যক হইত। ইহা দ্বারা লগ্নাদি কালজ্ঞানও হইত।

লল্ল এবং ব্রহ্ম গুপ্ত কাল জ্ঞাপক বহুবিধ যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। একটী এইরূপ। ৪র্থ চিত্র দেখুন। এক মনুষ্যমূর্ত্তির মধ্যভাগে মুখ পর্য্যন্ত এক ছিদ্র আছে। তাহার উদরে অতি দীর্ঘ কিন্তু অত্যল্পপরিসর বস্ত্রখণ্ড আছে। মনুষ্যের মুখ মধ্যে স্থাপিত এক কীলক-নলের (মসৃণ ঋজু দণ্ডের উপরে স্থিত নলের বা আধুনিক কপিকলের চাকার) উপর দিয়া বস্ত্রের এক অগ্র বহির্গত হইয়াছে। এই অগ্রে আবশ্যক পরিমিত পারদযুক্ত এক অলাবু বদ্ধ আছে। অলাবুটী এক কুণ্ডের জলে ভাসিতেছে। কুণ্ড হইতে জল যেমন নির্গত হইবে, মনুষ্যের মুখ হইতে বস্ত্রও তেমনি বহির্গত হইবে। বস্ত্রের যত অঙ্গুলী বাহিরে আসিলে এক এক দণ্ড সময় হইত, তত অঙ্গুলী দূরে দূরে বস্ত্রে গুটিকা বদ্ধ থাকিত। দুই দণ্ড গত হইলে দুইটী গুটিকা, তিন দণ্ড গত হইলে তিনটি গুটিকা, এই ক্রমে গুটিকা বহির্গত হইত। কত দণ্ড সময় গত, তাহা গুটিকার সংখ্যা দেখিয়া সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিত।
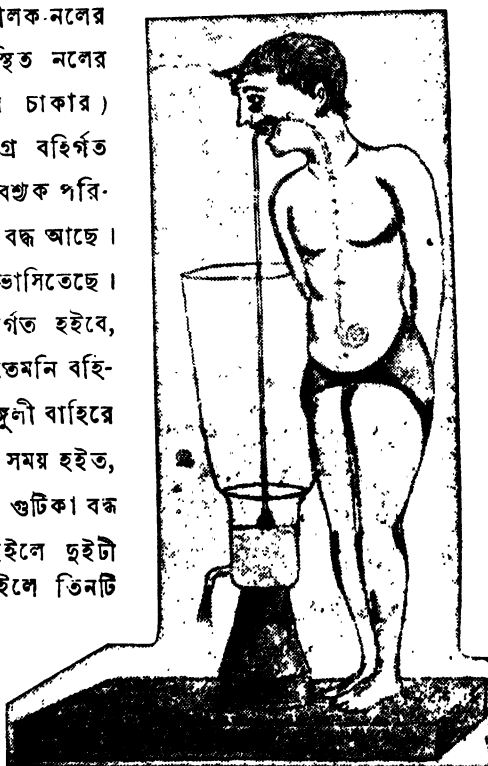
৪র্থ চিত্র। স্বয়ংবহ নরযন্ত্র।

লল্ল স্পষ্ট। যথা—

জল কুণ্ডে হ্রধশ্ছিদ্রে ঘটিকা কালাঙ্কিতে জলস্রুত্যা।
গোলে বেষ্টন সূত্রাগ্রবদ্ধতুম্বং ক্ষিপেৎ সরসম্
স্রবতি চ যথাযথাম্ভ স্তথাতথালাবু গচ্ছমানমধঃ
ভ্রময়তি গোলকমম্ভো মুক্তাঙ্কা নাড়িকা যাতাঃ।

এইরূপ কোন যন্ত্রে এক নরমূর্ত্তি নিকটস্থ অন্য নরমূর্ত্তির মুখে জল নিক্ষেপ করিত, কোন যন্ত্রে বর মুখ দিয়া বধূর মুখে গুটিকা প্রক্ষেপ করিত, কোন যন্ত্রে দুই মল্ল যুদ্ধ করিত, কোন যন্ত্রে ময়ূর সর্প গিলিত, কোন যন্ত্রে কাঠি নিক্ষিপ্ত হইয়া পটহে কিংবা ঘণ্টার শব্দ করিত, ইত্যাদি। এই সকল কৌতুকজনক যন্ত্রের উদ্দেশ্য কালজ্ঞাপন। আজি কালি যেমন বিলাতী ঘড়ীতে নরনারীর মূর্ত্তির অঙ্গ বিশেষ চালিত করিয়া শিল্পী গ্রাম্য জনকে বিস্মিত করে, সেকালের জল ঘড়ীতে তেমনি করিত। পটহবাদ্য কিংবা ঘণ্টাবাদ্যের সহিত আজিকালির বিলাতী ঘড়ীর ঘণ্টাবাদ্য তুলনা করা যাইতে পারে।

কথিত আছে, পূর্ব্বকালে—খ্রীষ্টজন্মের নাকি পূর্ব্বে—আলেকজান্দ্রিয়া নগরে কোন জ্যোতিষী কুণ্ডে জলস্রাব করাইয়া ঘণ্টাঙ্কিত চক্র চালাইতেন। ৫ম চিত্র দেখুন। খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কন্‌স্‌টান্টিনোপল নগরে এক 'চমৎকার পিত্তল ১টা হইতে ১২টা বাজাইত।' খ্রীঃ ৯ম শতাব্দীতে সম্রাট শার্লমেনকে পারস্যাধিপতি এক জল-ঘড়ী উপহার দিয়াছিলেন। তাহাতে ১২ ঘণ্টা জানাইতে ১২টা দ্বার ছিল। এক এক ঘণ্টায় এক এক দ্বার খুলিত, এবং যত ঘণ্টা সময় তত গুটিকা বহির্গত হইয়া এক পটহের উপরে পড়িত।

মানুষের স্বভাব চিরদিন সর্ব্বত্র একই প্রকার আছে।

শিল্পীর মন এক বিষয়ে আবদ্ধ থাকে না। যিনি একটী যন্ত্র আবিষ্কার করেন, তিনি অন্য যন্ত্র নির্ম্মাণে ধাবিত হন। সেকালের আর্য্যগণ পারদ জল তৈল সাহায্যে চক্র ভ্রমণের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এরূপ স্বয়ংবহ যন্ত্রের উল্লেখ লল্লে (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) প্রথম পাই। তারপর ব্রহ্মগুপ্তে, তারপর ভাস্করাচার্য্যে (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী) সেই যন্ত্রই ভিন্নাকারে পাই। ভাস্করের বর্ণনা অনুবাদ করিতেছি। 'গ্রন্থি কীলশূন্য লঘু কাষ্ঠময় [লল্ল বলেন শ্রীপর্ণী অর্থাৎ গামার কাঠের] এক চক্র ভ্রম-যন্ত্রে [কুন্দন-যন্ত্রে] সিদ্ধ করিবে। উহার নেমিতে সম প্রমাণ, সমছিদ্রযুক্ত, সমগুরু অর যোজনা করিবে। এই সকল অর নদীর আবর্ত্তের ন্যায় একই দিকে কিঞ্চিৎ বক্র হইবে। অরের অর্দ্ধাংশ পারদ পূর্ণ করিয়া অরের ছিদ্রমুখ বন্ধ করিবে। এইরূপ চক্র দুই আধারে স্থিত হইলে

স্বয়ং ভ্রমণ করিবে। কারণ যন্ত্রের একদিকে পারদ অর-মূলে এবং অন্যদিকে অরঅগ্রে ধাবিত হইবে। শেষোক্ত দিকের পারদের আকর্ষণে চক্র স্বয়ং ভ্রমণ করিবে।
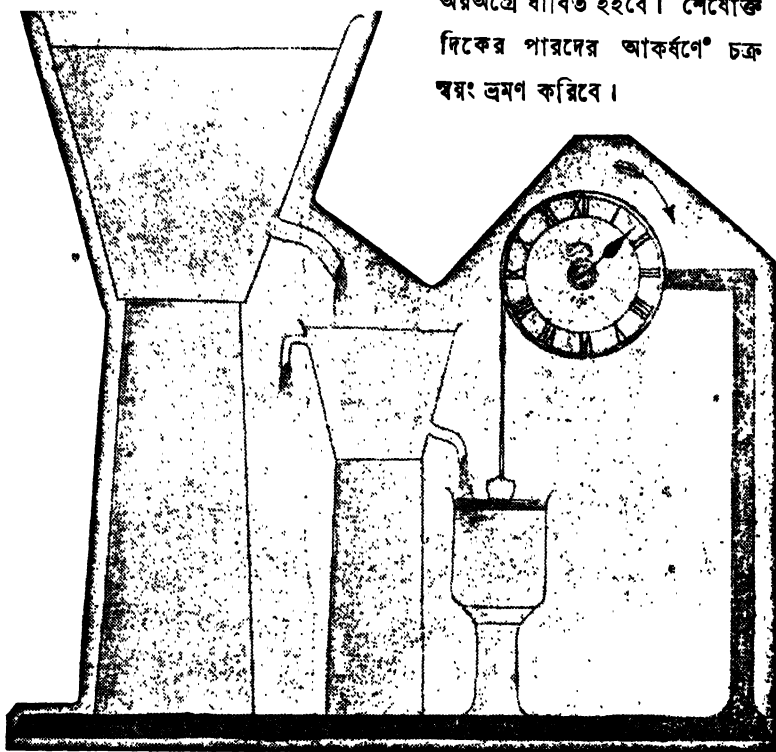
৫ম চিত্র। স্বয়ংবহ জলঘড়ী।

৬ষ্ঠ চিত্রে ঐরূপ চক্র প্রদর্শিত হইল। কিন্তু ব্যাপারটা কি? ইহা কি আধুনিক বিজ্ঞানে নিন্দিত সদাবহ যন্ত্র? কিম্বা আরও কিছু ছিল, যাহা গুপ্ত রহিয়া গিয়াছে? এরূপ যন্ত্রদ্বারা লল্ল ভগোলযন্ত্র ভ্রমণের কথা বলিয়াছেন। স্বয়ংবহ যন্ত্রের রহস্য পাছে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় (বর্ত্তমান) সূর্য্যসিদ্ধান্ত রহস্য গুপ্ত রাখিতে শিষ্যকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়াছেন। শিল্প-কৌশল প্রকাশে যিনি এত শঙ্কিত, অবশ্য তিনি কোন কথা বলিতে পারেন না। এজন্য তিনি পারদ জল তৈলাদির প্রয়োগ 'দুর্ল্লভ' বলিয়া সারিয়াছেন। তাঁহার টীকাকার রঙ্গনাথ (খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দী) বলেন, 'স্বয়ংবহ যন্ত্র অসাধারণ মনুষ্যের অসাধ্য; এই হেতু উহা দুর্ল্ভ; অন্যথা প্রতিগৃহে প্রচুর স্বয়ংবহ

থাকিত। সমুদ্রের অন্য প্রান্তবাসী ফিরঙ্গেরা স্বয়ংবহ বিদ্যায় সম্যক অভ্যস্ত। ইহা কুহক বিদ্যার অন্তর্গত।'

এ আবার কি কথা? ভাস্করাচার্য্যও কুহকবিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। তবে কি কুহকের ন্যায় স্বয়ংবহও গুপ্ত রহিয়া গিয়াছে? কিন্তু যে বর্ণনা পাইতেছি, তাহাতে য়ুরোপের সদাবহ আবর্ত্তচক্র মনে আসিতেছে। এই চক্রের আকার ৭ম চিত্রে প্রদর্শিত হইল। আবর্ত্তাকার অরসমূহের অন্তর্ব্বর্ত্তী গুলিকার ভারে চক্রের ভ্রমণ কল্পিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এইরূপে চক্রভ্রমণ অসাধ্য।

ভাস্কর অন্য দুই প্রকার স্বয়ংবহ বর্ণনা করিয়াছেন। এই দুইটী ব্রহ্মগুপ্তে নাই। একটী এইরূপ। ৮ম চিত্র দেখুন। 'ভ্রমযন্ত্র দ্বারা চক্রের নেমিতে দুই অঙ্গুল গভীর এবং দুই অঙ্গুল বিস্তৃত একটী সুষির বা নালী করিয়া চক্রটী দুই আধারে স্থাপন করিবে। নালীর উপরে তালপাতা মম্ দিয়া জুড়িবে। পরে তালপাতার কোন স্থানে ছিদ্র করিয়া নালী মধ্যে পারদ ঢালিবে যেন নালীর অধোভাগ পূর্ণ হয়। পুনর্ব্বার একপার্শ্বে বিদ্ধ করিয়া জল প্রবেশ করাইবে যেন অন্য পার্শ্বে জল যায় না। অনন্তর ছিদ্র বদ্ধ করিবে। এখন জলদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চক্র স্বয়ং ভ্রমণ করিতে থাকিবে। পারদ দ্রব পদার্থ বটে, কিন্তু গুরু। এই হেতু উহাকে জল অন্য পার্শ্বে সরাইতে পারিবে না।'

ইহার অর্থ কি এই যে, পারদ অধোভাগেই থাকিবে; জল পারদ ঠেলিতে থাকিবে, এবং তাহাতেই চক্র ঘুরিতে থাকিবে? যদি এই অর্থই ঠিক হয়, তাহা হইলে এখানে কাল্পনিক সদাবহের সুন্দর দৃষ্টান্ত পাইতেছি।

ইহার সহিত এই খ্রীষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের এক সদাবহ যন্ত্র তুলনা করুন। ৯ম চিত্রে এক কুণ্ডে পারদ, এবং কুণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে এক নলে

জল আছে। পারদকুণ্ডের উপরে এক চাকা এবং ভিতরে আর চাকা আছে। ঐ দুই চাকাকে বেষ্টন করিয়া এক সূত্র' আছে। সূত্রে কতকগুলি লঘু (যেমন সোলার) বর্ত্তুল বদ্ধ আছে। বর্ত্তুলগুলি জলে ভাসিয়া উঠিতে থাকিবে, সঙ্গে সঙ্গে চাকা দুইটীও ঘুরিতে থাকিবে।
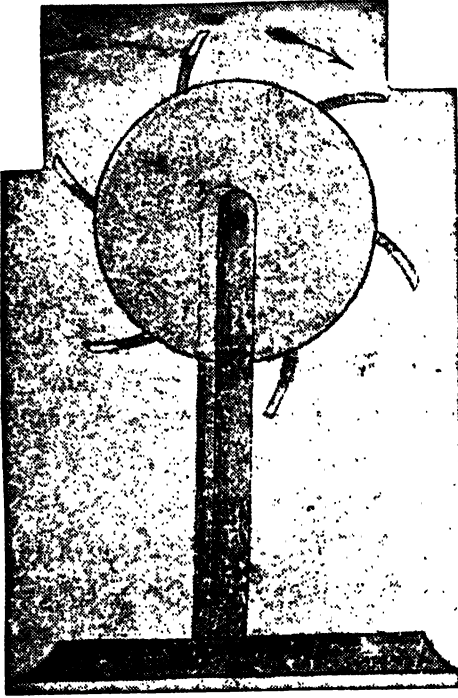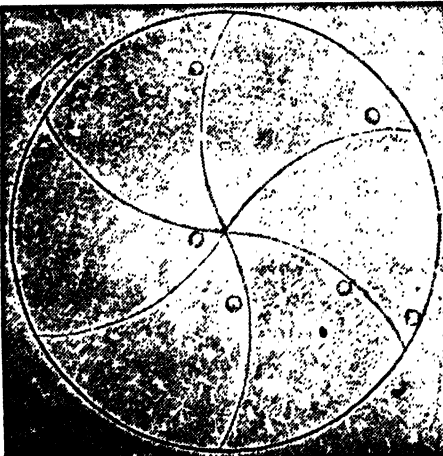
৬ষ্ঠ চিত্র। স্বয়ংবহ।

ভাস্করাচার্য্যের তৃতীয় স্বয়ংবহ এইরূপ। ১০ম চিত্র দেখুন। 'এক চক্রের নেমিতে ঘটী বদ্ধ আছে। কূপাদি হইতে জলোত্তোলনের ঘটচক্রবৎ এই চক্রকে দুই আধারে ধারণ করিবে। তাম্রাদি ধাতু নির্ম্মিত অঙ্কুশাকার এক নল দিয়া কুণ্ডের জল ঘটীমুখে পড়িবে। তখন চক্রটী পূর্ণ ঘটী দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ঘুরিতে থাকিবে। চক্র হইতে চ্যুত জল চক্রের অধঃস্থিত প্রণালী দিয়া যদি কুণ্ডে গমন করে, তাহা হইলে কুণ্ডে পুনর্ব্বার জল প্রক্ষেপ আবশ্যক হইবে

৭ম চিত্র। আবর্ত্তচক্র।

৮ম চিত্র। স্বয়ংবহ ?

না।'

এখানে ভাস্কর প্রথমাংশ ঠিক বলিয়াছেন, বক্রা-কার অঙ্কুশ যন্ত্র বা "কুক্কুটনাড়ী" যন্ত্রের (ইংরেজী সাইফন) প্রয়োগ দেখাইয়া-ছেন। ছিন্ন-কমল কমলিনী-নল লইয়া কুক্কুট নাড়ীর দৃষ্টা-ন্তও দিয়াছেন। এবং বলিয়াছেন, এই কুক্কুট নাড়ী শিল্পীদিগের এবং
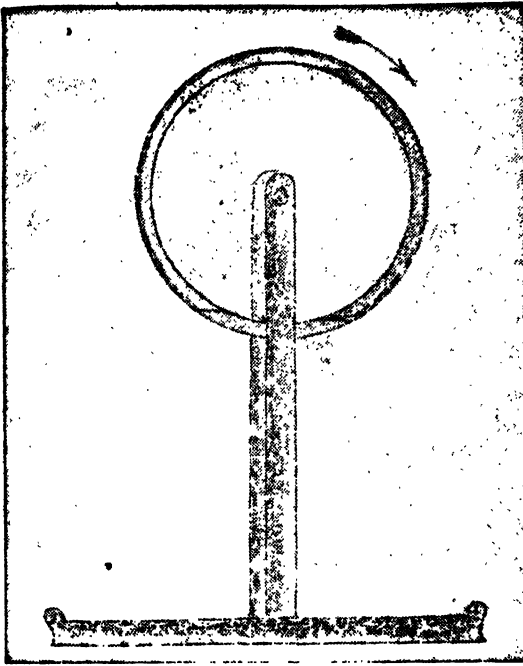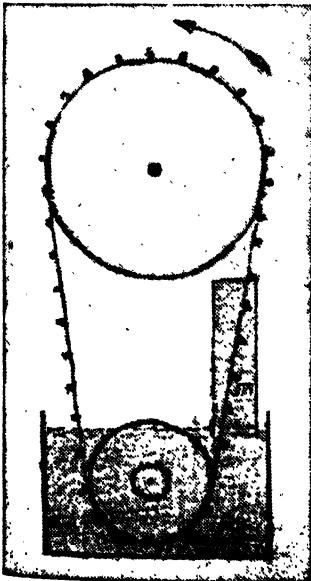
হরমেখলীদিগের নিকট প্রসিদ্ধ আছে। হরমেখলী কাহারা, তাহা এখন অজ্ঞাত। যাহা হউক, "চক্রচ্যুতং তদুদকং কুণ্ডে যাতি প্রণালিকয়া" বলিয়া নীচের জল উপরে উঠিবার সম্ভাবনা করিয়াছেন। আজিকালিও যে ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত য়ুরোপে পাওয়া যায় না, এমন নহে। এক কল্পনায়, এক জলচক্র আর্কিমীডের ইস্কুরূপ যন্ত্র চালিত করিতেছে। উর্দ্ধগত জল জলচক্রে পড়িয়া জলচক্রকে ঘূর্ণিত করিতেছে। ১১শ চিত্র দেখুন।
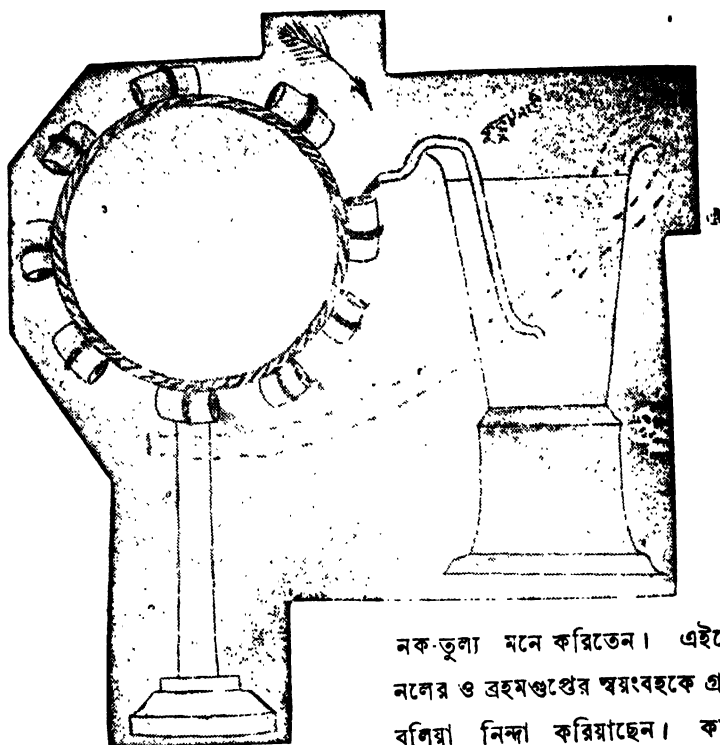
ভাস্করাচার্য্য স্বয়ংবহ যন্ত্রকে ক্রীড়া-

নক-তুল্য মনে করিতেন। এইহেতু নলের ও ব্রহ্মগুপ্তের স্বয়ংবহকে গ্রাম্য বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কারণ

১০ম চিত্র। স্বয়ংবহ।

তাহা সাপেক্ষ, অর্থাৎ জল ফুরাইয়া গেলে জল প্রক্ষেপের প্রয়োজন হয়। যে যন্ত্রে চতুরচমৎকারকরী যুক্তি থাকে, তাহা ভাস্করের মতে গ্রাম্য নহে।* বাস্তবিক তিনি প্রথরধীসম্পন্ন ছিলেন; বোধ হয় এই হেতু স্বয়ংবহ স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিবার তাঁহার ধৈর্য্য ছিল না।

দেখা গেল, প্রাচীনেরা স্বয়ংবহ অর্থে এমন যন্ত্র বুঝিতেন, যাহা চালিত করিতে মানুষ আবশ্যক হয় না, এবং যাহা একবার চালিত হইলে সতত চলিতে থাকে। অর্থাৎ স্বয়ংবহ হইতে সদাবহে গিয়া পড়িয়াছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞান

---

* যথা
যদধোবদ্ধনলং তৎ সাপেক্ষত্বাৎ স্বয়ংবহং গ্রাম্যম্।
চতুরচমৎকারকরী যুক্তির্যন্ত্রং নহি গ্রাম্যম্॥
এবং বহুধা যন্ত্রং স্বয়ংবহং কুহকবিদ্যয়া ভবতি।
নেদং গোলাশ্রিতয়া পূর্ব্বোক্তত্বাদয়াপ্যুক্তম্।

ঘোষণা করিতেছে, সদা গতি অসম্ভব। বলিতেছে, জড় সৃষ্টি করিতে পারা যায় না, তেমনি শক্তিও পারা যায় না। যে যন্ত্রে শক্তি যত থাকে, তাহা ততই থাকে, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। পূর্ব্বকালে লোকে মনে করিত, (শুধু প্রদেশে নয় য়ুরোপেও), যে কাঠ, লোহা পিতলের চাকা ও দণ্ডের যোগাযোগ ঘটনা দ্বারা প্রকৃতিকে ফাঁকি দিয়া কাজ
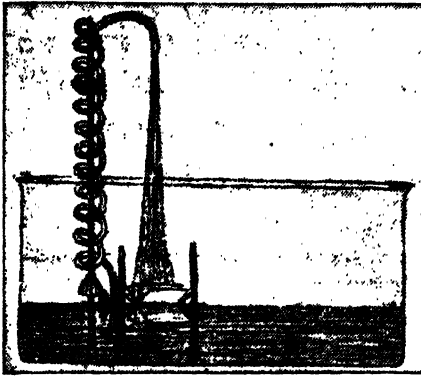
১১শ চিত্র। স্বয়ংবহ।

করাইয়া লইতে পারা যায়। প্রকৃতির রহস্যে প্রকৃতি গোপন করিয়া রাখিয়াছে। আমরা নিত্য দেখিতেছি, নদী বহিতেছে, বাতাস খেলিতেছে, গাছের ফল পড়িতেছে, আকাশে মেঘ বেড়াইতেছে। কই, কাজের ত বিরাম নাই! আকর্ষণ, বিকর্ষণ, সংকোচন, প্রসারণ, সংসক্তি ও আসক্তি এবং সমুদয় আণবিক ক্রিয়া গুপ্তবলের বাহ্যবিকাশ। কোন কোন ক্রিয়া নিরন্তর চলিতেছে। চলুক, আধুনিক বিজ্ঞান—আধুনিক বলিতেছি, কারণ শক্তি যে সৃষ্ট হইতে পারে না, এ তত্ত্ব অধিক দিন জানা যায় নাই,—আধুনিক বিজ্ঞান স্পষ্টভাষায় বলিতেছে, যে শক্তিই কাজ করুক এবং যতক্ষণই করুক, বিরামই তাহার পরিণাম! এমন যে সুকৌশল-সম্পন্ন আমাদের দেহ, যাহা নিজের জীর্ণসংস্কার নিজেই করে, ইহারও কর্ম্মের বিরাম ঘটে। অথচ মানব-রচিত যন্ত্রের বিরাম ঘটবে না—তদ্রূপ সন্দেহ উদয় হয় নাই। আধুনিক বিজ্ঞানের দেশে, য়ুরোপ ও আমেরিকায় সদাবহ যন্ত্র আবিষ্কার-প্রলোভনে অদ্যাপি বহু ব্যক্তি প্রতারিত হইতেছে।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মানদণ্ডে য়ুরোপের প্রাচীন জ্ঞান পরিমাণ করা ন্যায়-সঙ্গত নহে, আমাদের দেশের পুরাতন জ্ঞান পরিমাণ করাও নহে। আশ্চর্য্যের কথা কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত সূর্য্য সিদ্ধান্তে স্বয়ংবহ নাম পাইয়াই উৎফুল্ল চিত্তে প্রাচীন আর্য্যগণের জ্ঞান গরিমার প্রতি উপহাস বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, সকল স্বয়ংবহ এক তত্ত্বে নির্ম্মিত হয় নাই,

পরন্তু জলচক্র নির্ম্মাণ দ্বারা গতি সম্পাদন হেতু প্রাচীনদিগকে প্রশংসা করিতে হয়। বিলাতী ক্লক-ঘড়ীকে স্বয়ংবহ মনে করা যেরূপ, আমাদের সিদ্ধান্তের ভ্রমণমশীল যন্ত্রকেও স্বয়ংবহ মনে করা সেরূপ। গুরু দ্রব্যের নিম্ন গতি দ্বারা চক্র ভ্রমণ করানই যাবতীয় স্বয়ংবহ যন্ত্রের মূলতত্ত্ব। খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীতে হাইগেন্‌স নামক পণ্ডিত দোলক প্রয়োগ করিয়া ক্লক ঘড়ীকে প্রকৃত কালমান যন্ত্র করিয়াছেন। আমাদের আর্য্যগণ দোলকশূন্য ক্লক-ঘড়ীর আবিষ্কর্ত্তা বলিলে দোষ হয় না। কে জানে, এদেশ হইতে বিদেশে ক্লক-ঘড়ীর মূল-সূত্র যায় নাই ?”

ক্ষোভের বিষয় এই যে, দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে জ্ঞান, যে প্রয়োগ-কুশলতা এদেশে প্রচুর ছিল, ক্রমশঃ তাহার বিকাশ হয় নাই। পরন্তু বর্ত্তমান-কালে তাহার লোপ ঘটিয়াছে। জলপ্রবাহে শক্তি যে লুকায়িত আছে, তাহা প্রাচীনেরা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনা করিয়াও প্রয়োগকুশল শিল্পী হইতে পারি নাই। আমাদের সুজলা নদীবহুলা বঙ্গভূমির ধান্য জলাভাবে শুকাইয়া যায়, আমরা হা-অন্ন স্বরে ক্রন্দন করি। আমরা মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি, বায়ু বহে। কিন্তু যে শক্তি বহমান পবনে সঞ্চিত থাকে, তাহা দ্বারা কার্য্য সিদ্ধির পন্থা দেখি না। সূর্য্য আমাদের ন্যায় অ-পাত্রের দেশে এত তাপ বিতরণ না করিলে ভাল করিতেন, আমরা মুক্ত হস্তের দান ভোগ করিতে জানি না। রামায়ণের কবি ইন্দ্র বরুণ পবন তপনকে রাবণের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; আমরা দেখিয়াও দেখি না, কবিকল্পনা সফল হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

লোক-তত্ত্ব।

আমার প্রতি সম্মিলনীর সম্পাদক মহাশয়ের আদেশ, সংক্ষেপে কয়টী কথা বলিয়া এই সভায় Ethnology" সম্বন্ধে একটা আলোচনার অবতারণা করা। মুখবন্ধের কার্য্যটা কোনও যোগ্যতর ব্যক্তির উপর দিয়া আমাকে মুক্তি প্রদান জন্য প্রার্থনা করিয়াও কোন ফল পাই নাই। কাজেই অযোগ্য হইয়াও আলোচনাটা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে বাধ্য হইতেছি; কথাটা উত্থাপন করিয়াই আমার মুক্তি। প্রকৃত আলোচনা সমবেত বন্ধুগণ করিবেন।

Ethnology শাস্ত্রের বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধীয় কথার অবতারণা করিতে গেলে, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের সম্বন্ধেও দুই একটা কথা বলিতে হয়। অনেকের মতে Ethnology শাস্ত্রটা Anthropology শাস্ত্রের অন্তর্গত একটা শাখা শাস্ত্র।

Anthropology বা মানব-বিজ্ঞান (কেহ কেহ ইহাকে মানব-তত্ত্ব-বিজ্ঞান নাম দিয়াছেন) জীব বিজ্ঞানের (Biology) একটী বিশেষ অংশ। এই মানব বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ ও প্রকৃতির, বিধিবদ্ধ (Systematic) আলোচনা হইয়া থাকে। মানব বিজ্ঞান, জীব-জগতে ও বহির্জগতে মানবের স্থান, সম্বন্ধ ও পার্থক্য নির্ণয় করিয়া থাকে।

যে শাস্ত্র দ্বারা মানুষে মানুষে যে প্রকৃতিগত পার্থক্য ও একতা রহিয়াছে, তাহা মূল ধরিয়া সমস্ত মানবমণ্ডলীকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভাগ করিয়া তাহাদের পরস্পরে ও মানব সাধারণের সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা করা যায়, আমরা তাহাকে বর্ণতত্ত্ব বা Ethnology বলি।

মানব-বিজ্ঞান (Anthropology) একটী শাস্ত্ররূপে অতি অল্প দিন হইল পরিগৃহীত হইয়াছে। অল্প দিনের হইলেও বিজ্ঞান জগতে ইহার প্রতিপত্তি ও পরিব্যাপ্তি খুব অধিক। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মনুষ্য জাতির বর্ণভেদ বর্ণনাকে Ethnography (বর্ণ-বিচার) নাম দেওয়া হইয়াছিল। মনুষ্য জাতির ভাষার একতা ও বিভিন্নতা তুলনা করিয়া বর্ণ বিভাগ স্থির করা হইয়াছিল।

Ethnology (যাহাকে আমরা বর্ণতত্ত্ব নামে অনুবাদ করা ভাল মনে

করিতেছি) কথাটা ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে Ethnological Society দ্বারা প্যারি নগরে প্রথম প্রচলিত হয়। উক্ত সভা, বর্ণতত্ত্ব শাস্ত্রদ্বারা মানবের শারীরিক গঠন,অবয়ব, বুদ্ধি শক্তি, ও ভাষার একতা বৈলক্ষণ্যতা এই সবগুলি বিচার করিয়া মনুষ্য জাতির ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ নির্দ্ধারণ (race) প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য্য Paul Broca এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় আরও বিস্তৃত করিয়াছেন।

জীব জগতে মানুষ একটী বিশিষ্ট জাতি বা Species। প্রাণী জগতে Species বা জাতি নির্ণয় করার একটা মোটামুটি উপায় আছে। নিয়মটির ব্যতিরেক থাকিলেও ইহা জতি নির্ণয়ে বিশেষ সহায়। সেই জন্য সেই লক্ষণটা এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন। কতকগুলি সমানাবয়ব ও সমান-ধর্ম্মাক্রান্ত জীব-সমষ্টিকে তখনই Species বা জাতি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে, যখন দেখা যায় যে, ঐ সমষ্টির বহির্ভূত যে কোন একটী প্রাণীর সহিত ঐ সমষ্টির অন্তর্ভূত কোনও একটী প্রাণীর যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া অপত্য প্রসূত হইলে, সেই অপত্য সর্ব্বদা ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই সূত্রের সাহায্যে আমরা স্পষ্টই বলিতে পারি যে, সমস্ত মানবমণ্ডলী একই speciesএর (জাতির অন্তর্গত। এই সমগ্র মণ্ডলী বা জাতির মধ্যে প্রকৃতিগত অবয়ব গুলিকে পার্থক্যের মূল ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন দলে বা বর্ণে মানব জাতিকে মোটামুটি তিন শাখায় ভাগ করা হইয়া থাকে। পারিস মিউজিয়ামের প্রসিদ্ধ প্রকোর কোয়াতার ফেজের মতে মানব জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে এক বিশাল মহীরুহের ন্যায়। ইহার কাণ্ড মানব সমষ্টি ধরিলে বর্ণভেদ শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণ, তিনটি সুবৃহৎ শাখা রূপে ধরা যাইতে পারে। এই শাখাত্রয় পুনরায় নানা উপশাখায় ও পল্লবে বিভক্ত হইয়া প্রকাণ্ড মহীরুহ রূপে মানব জাতির "বিশ্বরূপ" প্রদর্শন করিতেছে। শ্বেত শাখা আবার আর্য্য, (Aryan), যবন (Semitic) এবং প্রাচীন প্রাচ্য (Alloplyle) প্রভৃতি উপশাখায় বিভক্ত। পীত শাখায় মোগল ও চীন প্রভৃতি, এবং কৃষ্ণ শাখায় নিগ্রোটো (Negrito), দ্রাবিদির এবং হোটেনটঠ প্রভৃতি উপশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতবর্ষে এই প্রধান তিন শাখাই বর্ত্তমান। ১৮৬৭ খ্রীঃ আচার্য্য Huxley ইংলণ্ডের বর্ণতত্ত্ব সভাতে এ বিষয়ে আলোচনা উপস্থিত করার উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, প্রকৃতি আপনিই যেন পর্ব্বত ও সমুদ্র সুরক্ষিত

ভারতকে দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে বিভক্ত করার জন্য একটী দূরব্যাপী সমতল ক্ষেত্র সৃজন করিয়াছেন; আমরা এই সমতল ক্ষেত্রকে নদী-সৈকত বলিতে পারি। ইহা আরব উপসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমে সিন্ধু ও পূর্ব্বে গঙ্গা,এই দুই বৃহতী জলধারা এই সমতল ক্ষেত্রকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাই সেই কৃষ্ণ হরিণের (Black antelope) প্রাকৃতিক লীলাক্ষেত্র, আর ব্রাহ্মণের পবিত্র আশ্রম-কানন। দক্ষিণের নীরস ও বন্ধুর অধিত্যকা বা দাক্ষিণাত্য এবং উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব্বোত্তরের শৈলশৃঙ্গ-সমাচ্ছন্ন পার্ব্বত্য প্রদেশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রন্ত। এই তিন ভূভাগই মিশ্রবর্ণের আবাসস্থল হইলেও মোটামুটী দাক্ষিণাত্যবাসী ও দ্রাবিড়ী কৃষ্ণবর্ণ, সমতলক্ষেত্র নদীসৈকতে মিশ্রিত আর্য্যবর্ণ এবং উত্তর পার্ব্বতীয় প্রদেশে মোঙ্গলীয় বর্ণ, সংখ্যায় ও সামর্থ্যে প্রাধান্য অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

এই সব বর্ণ-সমস্যা কেবল ভাষা বা ত্বকের বর্ণদ্বারা নিরাকৃত হয় না। কঙ্কাল ও করোটির পরিমাপ, মস্তক ও মস্তিষ্কের প্রসার, চুল ও লোমের গঠন-বৈচিত্র্য, চক্ষুর বর্ণ, নাসিকার প্রসার ও উচ্চতা, কর্ণের আকৃতি ও অবস্থিতি প্রভৃতি নানা উপায়ে স্থিরীকৃত হয়। এই সব তত্ত্ব বিশুদ্ধভাবে অনুসন্ধান করিতে গেলে সজীব মানবেরও নানারূপ মাপ গ্রহণ করিতে হয়। গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে এই সব মাপ অনেক স্থানে গৃহীত হইয়াছে সত্য। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় বর্ণতত্ত্ব শাস্ত্রে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন না করায় কার্য্যটী সুসম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমার মনে হয়, সম্পাদক মহাশয় সেইজন্যই এই সম্মিলনী সভায় বর্ণতত্ত্ব শাস্ত্রের আলোচনার প্রবর্ত্তন করিতে বিশেষ প্রয়াসী হইয়াছেন। আর এই শাস্ত্রের আলোচনার সাক্ষাৎ কোনও উপকারিতা নাই, একথাও বলা যাইতে পারে না। জাতীয় অভ্যুত্থান ও পতন, ব্যক্তি বিশেষের জন্ম মৃত্যুর ন্যায় অবশ্যম্ভাবী নহে। ব্যক্তি বিশেষের জরা ও মৃত্যু ধ্রুব বলিয়াই জাতি বা বর্ণের বার্দ্ধক্য বা মৃত্যু নিশ্চিত, তাহা মনে করার কোনও কারণ নাই। বিচার ও বহুদর্শন দ্বারা জাতীয় অবনতির কারণ গুলি ধরিতে পারিলে নেতারা অনুগামীদিগকে সময়ে সতর্ক করিয়া জাতীয় বার্দ্ধক্য বা মৃত্যুকে দূরীকৃত করিতে পারেন। জাতি বা বর্ণের উন্নতি বা অবনতি, এই বর্ণতত্ত্ব শাস্ত্রের বিষয়ীভূত। কাজেই ইহা মানবসমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের বিশেষ প্রিয় সামগ্রী। ইহা আমাদের ভাবিবার ও আলোচনা করিবার শাস্ত্র।

শ্রীবণওয়ারিলাল চৌধুরী।

"বাঙ্গালা ন্যাসনালিটি।"

(NATIONALITY।)

আমরা আজ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছি। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারণ আমাদের উদ্দেশ্য। আমার মতন লোকের এই সম্মিলনে কোন প্রকার কার্য্যের ভার লওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতার কথা। কারণ বাঙ্গালী সন্তান হইয়াও নানা কার্য্যে থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা করার অবসর আমার এত অল্প হইয়াছে যে, আমার মতন লোকের সেই জ্ঞান লইয়া এই বিদ্বজ্জন সম্মিলনে উপস্থিত হওয়া কেবল হাস্যভাজন হওয়া মাত্র। অধিকন্তু যে বিষয়টীর আলোচনার জন্য আমি উপস্থিত হইতেছি, তাহা ইংরাজি ভাষায় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাহার আলোচনা করিলে এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে যে, বাঙ্গালা ভাষায় তাহা আজিও পাওয়া যায় না। এই জন্য আমার ক্রটী গ্রহণ করিবেন না। তবে আমি যে বিষয়টী উপস্থিত করিব, আপনারা তাহারই কেবল আলোচনা করিবেন। যদি আমি বিষয়টী ইংরাজী-বাঙ্গালা কথায় আপনাদের নিকট বিশদরূপে উপস্থিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। এই সময়ে আর একটী কথাও বলিয়া রাখা আবশ্যক। আমি এই কয়টী আলোচনা করিতে করিতে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, আপনাদের আমি তাহা গ্রহণ করিতে বলি না। যদি এই প্রবন্ধে আপনাদের এই বিষয় মনোযোগ আকর্ষিত হয় এবং আপনারা এই বিষয়টী ভাবিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে আমি আমার কর্ত্তব্য করিয়াছি বলিয়া মনে করিব। বিষয়টী খুব জটিল এবং ইহার সম্বন্ধে অনেক আন্দোলন ও বিচার আবশ্যক। অনেক লোকের গবেষণা ও পরিশ্রমের ফলে ক্রমশঃ ইহা পরিষ্কার হইবে।

এখন যাহারা বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতেছে, তাহারা বা তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা যে চিরকালই বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিত, তাহা মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখি না। এইজন্য প্রথমেই আমি বাঙ্গালা ভাষাকি করিয়া

প্রসারণ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার দুই একটী উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিব।

আমি যখন চট্টগ্রামে ছিলাম, তখন মহামুনি নামক স্থানে চৈত্রসংক্রান্তিতে "মহাবিষুব" পর্ব্বে Chittagong Hill Tracts-বাসী মঙ্গোলীয় জাতীয় (Mongolian) অধিবাসীদের প্রথমে সেই পর্ব্ব উপলক্ষে সমবেত হইতে দেখি। সাধারণতঃ ইহারা "জুমিয়া মগ" (Jumia mug) নামে পরিচিত। আজি পর্য্যন্ত ইহারা ভূমিকর্ষণ করিতে শেখে নাই। গয়াল বা বন্যগরু তাহাদের গৃহের নিকট রাত্রিতে আসিয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহারা যে সমস্ত আজিও পুষিতে শেখে নাই। গরু পুষিলে তাহার দুধ খাওয়া যায়, তাহাদের দ্বারা জমি চাষ করা যায় বা একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে তাহারা ভারবহণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে, ইহারা আজিও তাহারা জানে না। ইহারা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, এই জন্য ইহাদের মগ বলে। যে প্রকারে তাহারা শস্য বপন করে, তাহাকে "জুম" বলে বলিয়া ইহারা "জুমিয়া মগ" বলিয়া পরিচিত। ইহাদের বিষয় যদি কেহ জানিতে চান, তাহা হইলে Capt. Lewin কৃত Chittagong Hill tracts and their dwellers therein নামক পুস্তক পাঠ করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন। ইহাদের দেশে তিন জন রাজা আছেন। তাহার মধ্যে এক জনের নাম চকমা রাজা (Chukma Rajah) এই চকমা রাজার রাজ্য ঐ Hill tracts মধ্য স্থলে অবস্থিত। ইহার Head Quarters—সহরটীর নাম রাঙ্গামাটী (Rangamati). এই খানে বাঙ্গালীরা গিয়া দোকান পসরা খুলিয়াছেন—এই খানে একটী Entrance school—সরকার হইতে খোলা হইয়াছে। ইহার ফলে দেখা যাইতেছে—এই প্রদেশের লোকদের বাঙ্গালী সাজিবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। এখন যিনি রাজা, তাঁহার নাম "ভুবনমোহন রায়।" এই রাজা একবার চট্টগ্রাম সহরে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। দেখিয়াছিলাম, তখন তিনি ঠিক আমাদের মতন কাপড় পরিয়াছেন। কথাবার্ত্তা সব বাঙ্গালা ভাষায় হইল। তিনি Entrance পরীক্ষা পাস করিয়াছিলেন। শুনিলাম, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত অপর এক মঙ রাজার কন্যার (Mong Rajah) সহিত বিবাহ স্থির হওয়ায় সেই মেয়েটীকে শিক্ষার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই রাঙ্গামাটী স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিতে যে সব ছেলেরা চট্টগ্রামে আসিয়াছিল—দেখিলাম, তাহারা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা, এই দুই ভাষায় পরীক্ষা

দিতেছে। তাহা শুনিয়া কি আপনাদের মনে হইতেছে না যে, অলক্ষ্য ভাবে ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা ভাষার প্রসারণ হইতেছে। চট্টগ্রাম স্কুলে একজন শিক্ষক আছেন, তাঁহার নাম"কৈলাসচন্দ্র",তিনি জাতিতে কুকি। তিনি আমাদের সহিত বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় কথা কহিতেন না। ইনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আমি যখন সেখানে ছিলাম, তখন তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী বৌদ্ধের কন্যাকে বিবাহ করিলেন। ইহার উদাহরণ কুকিদের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী সভ্যতার আলোক কি প্রকার কার্য্য করিবে, তাহা বোধ হয় আপনারা সহজে বুঝিতে পারিতেছেন।

আর এক দিনের কথা বলিতেছি। এক দিন চট্টগ্রাম হইতে রেলে আসিতেছিলাম—তখন অন্য এক গাড়ীতে "হরি সঙ্কীর্ত্তন" হইতেছিল। শুনিতে পাইতেছিলাম, অনেক লোক একসঙ্গে গান করিতেছিল, ক্রমে যখন আমরা আসিয়া একটী বড় ষ্টেসনে পৌছিলাম, তখন গান বন্ধ লইল। গাড়ী সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়, আমি নামিয়া দেখিতে গেলাম—কাহারা গান করিতেছিল। গাড়ীর কাছে গিয়া দেখি যে, মণিপুরীরা গান করিতেছিল, গান বন্ধ হওয়ার পর হইতেই তাহারা তাহাদের নিজেদের ভাষায় কথা কহিতেছে, আর বাঙ্গালা ভাষায় নয়। আপনারা বোধ হয় অবগত আছেন যে, মণিপুরীরা বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে,এই জন্য তাহারা পূজা প্রভৃতি কার্য্যে বাঙ্গালা ভাষাই ব্যবহার করে। সেই দিনই রাস উপলক্ষে দলে দলে মণিপুরীরা নবদ্বীপে আসিতেছে,দেখিলাম। বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে কেবল বাঙ্গালা ভাষা প্রসারণে সাহায্য করিতেছে, তাহা নয়, এখন আবার এই অনার্য্য মঙ্গোলীয় (Mongolian) মণিপুরীদের মধ্যে এক শ্রেণী উপবীত লইয়া ব্রাহ্মণ সাজিয়া যজনযাজন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহা হইলে আপনারা কি বলিলেন যে, ব্রাহ্মণ মাত্রেই আর্য্যবংশ সম্ভূত? ইহাতে আর কথা কি মনে হইতেছে না—(Non Aryan Non Hindu Race) অনার্য্য অহিন্দু জাতি ক্রমে হিন্দু হইয়া হিন্দু সমাজে মিশিতেছে। আপনারা ইহাদিগকে কেহ ভাল ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণে করিবেন না; তাহারাও আপনাদের আর গ্রহণ করিবে না। উত্তর পশ্চিমের ব্রাহ্মণেরা কি আমাদের দেশের ব্রাহ্মণকে আবাহমান ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া আসিতেছে? বাঙ্গালা দেশের পূর্ব্বে কি হইতেছে, তাহা বলিলাম। পশ্চিমে কি হইতেছে, তাহাও দেখুন। বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা ও হাজারিবাগ জেলার যে অংশ বাঙ্গালা দেশের সহিত সংশ্লিষ্ট, আমি সেখানে সাঁওতালদের সহিত মিশিয়াছি।

দেখিয়াছি যে, যখন তাহারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা কয়, তখন তাহারা সাঁওতালী ভাষায় কথা কয়—কিন্তু বাঙ্গালীদের সহিত তাহারা সর্ব্বদাই ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালায় কথা কয়। একটু অবস্থার উন্নতি হইলেই বাঙ্গালীর মতন ধুতি, জামা, জুতা পরিয়া "বাঙ্গালী বুবু" সাজিয়া বেড়ান অতি গৌরবের কথা মনে করে। এমন কি, খ্রীষ্টান পাদ্রীরা খ্রীষ্টান সাঁওতালদের বাঙ্গালী সাজাইয়া গ্রামে গ্রামে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ান—দেখান যে খ্রীষ্টান হইলে এইরকম "বাঙ্গালী বুবু" হওয়া যায়। কেহ কেহ বলিবেন, বাঙ্গালীদের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য ইহারা দোভাষীর ন্যায় বাঙ্গালা বলিলে বাঙ্গালা প্রসারণ হইল না। মানভূম জেলায় গেলেই ইহার উত্তর পাইবেন। সেখানে "ভূমিজ" (Bhumij) বা ভূঁইয়া (Bhunya) বলিয়া এক জাতি দেখিতে পাইবেন। তাহাদের শারীরিক গঠন দেখিলে একবারও আপনাদের সন্দেহ হইবে না যে, তাহারা অনার্য্য (Dravidian race) দ্রাবিড়ী বংশ সম্ভূত। তাহাদের আচার ব্যবহার এখনও দ্রাবিড়ী জাতিদের ন্যায়। ভাষা একেবারে বাঙ্গালা, অন্য কোন ভাষা জানেই না। তাহাদের "বঙ্গা" "বঙ্গী" "মরং বুরু" (Banga Bongi Morung Buru) আর উপাস্য নয়, ঐ সব দেবতাদের একেবারে ত্যাগ করিয়াছে বলিতে পারি না, তবে হিন্দু দেবদেবী তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এই দেবতারা পশ্চাতে পড়িয়াছে। এখন ইহারা একটী Hindu caste হইয়াছে। এদিকেও হিন্দুধর্ম্মের প্রসারণ হইয়াছে, বাঙ্গালা ভাষারও প্রসারণ দেখা যাইতেছে।

আমি আরও একটী উদাহরণ দিব। আপনারা যদি কেহ শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করিতে বিহারে যান, তাহা হইলে দেখিবেন যে, স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে তিন দল শিক্ষক দরকার। বাঙ্গালী ছেলে থাকিলে বাঙ্গালী শিক্ষক দরকার, মুসলমান ও কায়স্থ ছেলেদের জন্য উর্দ্দু জানা শিক্ষক দরকার, অন্য হিন্দুদের জন্য হিন্দি জানা শিক্ষক আবশ্যক। সাধারণতঃ সকলে হিন্দি ভাষায় কথা কহিলেও পুস্তক পড়াইবার সময় তিন স্বতন্ত্র অক্ষর ও তিন স্বতন্ত্র ভাষা একজনের পক্ষে জানা বড় সহজ নয়। স্কুল বিভাগের উচ্চ শ্রেণীতে ইংরাজিতেই অনেক কাজ হয়, তবে সেখানেও অনুবাদ করিবার সময় তিন শ্রেণীর শিক্ষক দরকার হয়। কিন্তু উড়িষ্যায় যান—নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চশ্রেণী পর্য্যন্ত কোথায়ও এক জনের বেশী শিক্ষক দরকার হয় না। উড়িয়া শিক্ষকেরা সকলেই বাঙ্গালা জানেন। বাঙ্গালী ও উড়িয়া ছেলে এক

শ্রেণীতে থাকিলে তাহারা নিজ নিজ ভাষায় পুস্তক পড়িতেছে বটে,কিন্তু তাহার জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষক দরকার হয় না। যদি শিক্ষক বাঙ্গালী হন, তিনি বাঙ্গালায় পড়ান, কোন উড়িয়া ছেলের তাহাতে অসুবিধা হইবে না। তাহারা সকলেই বাঙ্গালা পড়িতে জানে। উড়িয়া শিক্ষক হইলে তাঁহারা বাঙ্গালা পুস্তক পড়িতে জানেন, বাঙ্গালী ছেলেদের কোন অসুবিধা নাই। ভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার উড়িয়ায় কোন পুস্তক নাই—বাঙ্গালা হইতে তাহারা ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে গেলে তাহাতেই তাহাদের অনুবাদ শিক্ষা হইয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষা উড়িষ্যা দেশে কিরূপ প্রচলন হইতেছে, ইহা হইতে তাহা আপনারা সহজেই বুঝিতে পারেন। আমি উড়িষ্যা দেশে বাস করিবার সময় একজনও উড়িয়া ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করি নাই, যিনি বেশ শুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় আমার সহিত কথা কথা বলেন নাই। বরং আমি এমন শুনিয়াছি, যদি আমি তাঁহাদের সহিত উড়িয়া ভাষায় কথা কহিতাম, তাহা হইলে তাঁহারা মনে করিতেন যে, আমি তাঁহাদের হেয়জ্ঞান করিয়া বেহারা শ্রেণীর লোক মনে করিতেছি। আমরা মাথা কামান অশিক্ষিত উড়িয়া বাঙ্গালা দেশে দেখিতে পাই, কিন্তু উড়িষ্যায় যান, দেখিবেন, শিক্ষার সঙ্গে কি পরিবর্ত্তন হইতেছে। উড়িয়া একেবারে বাঙ্গালীর ন্যায় পোষাক পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছে। এমন একটা রব উঠিয়াছে বটে যে, "Orissa for the Uryas" "এই রবটী এখনও তেমন জাঁকিয়া উঠে নাই, কারণ যিনি এই রব ভাল করিয়া তুলিয়াছেন,নিজে উড়িয়া হইলেও আচার ব্যবহার কথাবার্ত্তায় তিনি সম্পূর্ণ বাঙ্গালী। বিগত ৪। ৫ শত বৎসর হইতে বাঙ্গালীরা উড়িষ্যায় গিয়া বাস করিতেছেন, উড়িষ্যায় সাধারণের ধর্ম্ম চৈতন্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্ম। এবং উড়িষ্যার জমিদারীর অধিকাংশ ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালীদের হাতে আসিয়া পড়িতেছে। এই সব কারণে উড়িষ্যায় বাঙ্গালা ভাষার এত আদর হইয়াছে। এদিকেও কি বাঙ্গালা ভাষার প্রসারণ দেখিয়া আমাদের আনন্দ হয় না?

আমি এতক্ষণ বাঙ্গালা ভাষার প্রসারণের কথা বলিতেছি—এই বাঙ্গালা সাহিত্য-সম্মিলনে এই কথা জানিয়া সকলের কত আনন্দ হইবে। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে আর একটী কথারও আমি অবতারণা করিতেছি, তাহা এই যে, যাহারা বাঙ্গালা ভাষা গ্রহণ করিতেছে, তাহারা কি সব বাঙ্গালী—বাঙ্গালী বলিয়া কোন একটা race আছে, কিম্বা কখনও ছিল কি? পূর্ব্বে দেশে যাহারা বাঙ্গালা ভাষা বা বাঙ্গালীর ধর্ম্ম বা বাঙ্গালীর সভ্যতা গ্রহণ করিতেছে, তাহারাও

সব (Mongolian) মঙ্গোলীয় জাতি সম্ভূত। পশ্চিমে যাহারা আমাদের সহিত মিশিতেছে, তাহারাও সব (Dravidian) দ্রাবিড়ী জাতি সম্ভূত। এই রাজসাহী ডিবিসনে যে "রাজবংশী"দের প্রাধান্য দেখা যাইতেছে, তাহারা (Mongolian) মঙ্গোলীয় জাতি সম্ভূত। তবেত আমরা দেখিতেছি যে, বাঙ্গালা ভাষায় যাহারা কথা কয়, তাহারা ত সব এক জাতি (race) সম্ভূত নয়। উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালীদের ধমনীতে যে আর্য্য রক্ত রহিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আর্য্য (Aryan), মঙ্গোলীয় (Mongolian) ও দ্রাবিড়ী (Dravidian) তিন শ্রেণী হইতেই যখন লোক আসিয়া ও একত্র মিশিয়া বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতেছে, তখন ইহাদের উৎপত্তি এক, তাহা কেমন করিয়া বলিব?

কেহ বলিবেন যে, মসলা (materials) নানাস্থান হইতে আসিতে পারে, সব যদি ভাঙ্গিয়া গড়িয়া এক হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতে যে একটি nation হইবে না, তাহা কে বলিবে? এই এক বাঙ্গালা ভাষায় সব এক করিতেছে। এই বাঙ্গালা ভাষা আমাদের বাঙ্গালা জাতি গঠনের মূলমন্ত্র। এই জন্যই ত আমরা বাঙ্গালার অঙ্গচ্ছেদে এত আপত্তি করিতেছি। কথাটা এখন ভাল করিয়া বিচার হউক। এক ভাষাতেই কি কখনও Nationality গঠন করিয়াছে? ইউরোপে France, Germany ও Italy তিন, দেশে এই বিশ্বাস যে, এক ভাষা nationality গঠনের একটী প্রধান উপাদান—এই তিনটী nationality গঠনে খুব সাহায্য করিয়াছে। আমাদের দেশেও তাহা করিবে না কেন? কেবল ভাষাই তাহা করিয়াছে, না অন্য অনেক কারণ nationality গঠনের মূল ছিল, ভাষা কেবল উপলক্ষ মাত্র।

Sidgwide সাহেব লিখিয়াছেন যে, একটী Nation গঠনে এই কয়েকটী উপকরণ দরকার—(১) এক বংশে (race) উৎপত্তি, (২) এক ধর্ম্ম (৩) এক প্রকার আচার ব্যবহার (Social custom) (৪) এক ভাষা (৫) এক ইতিহাস (common political History and common struggles against foreign foes). Risley সাহেবও তাঁহার People of India পুস্তকে এই ভাবই অন্য ভাষায় লিখিয়াছেন—"No, the word is ordinarily used, it seems to imply that the persons composing a nationality are keenly conscious, and may even be passionately convinced, that they are closely bound together by the tie of common interests and ideals, that in a special and intimate way they

belong to one another, and that the moral force and enthusiasm by which their sentiment of unity is inspired render it independent of the Government or Governments under which they may happen to live. This feeling of self-consciousness gives to a body of man a sort of personality, so that they become a moral unity with a common thought."

আমরা সকলে এক Nation, এই কথা মনে আসিলেই অমনি আমাদের মনে আর একটা ভাব আসা উচিত যে, অতি নিকট সম্পর্কিত এবং আমরা এক-ভাবাপন্ন। বাস্তবিক কি আমরা সকল বাঙ্গালীই এক ভাবাপন্ন?

দেখা যাউক, আমাদের এমন উপকরণ আছে কি না, যাহাতে আমরা সব এক হইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। একটা জিনিষ আমাদের অবশ্য আছে,যাহাতে আমাদের সকলকে এক করিয়াছে—তাহা আমাদের এক ভাষা, এবং এই ভাষা এক হওয়ায় আমাদের মনে একটা ধারণা হইয়াছে (Imagination—a mental attitude—a subjective conviction which may subsist independently of any objective reality) আমরা এক বংশ হইতে উৎপন্ন। যদিও ইহা সত্য নয়, তথাপি যদি এই ধারণা আমাদের জাতীয় জীবনে (National life) কাজ করে, তাহা হইলে বিভিন্ন প্রকারের মসলা আর্য্য, দ্রাবীড় বা মঙ্গোলীয় জাতীয় লোক বাঙ্গালা দেশে বাস করিলেও আমাদের এক হইবার পথ আছে। ইউরোপের কোন Nation কি কোন এক জাতি race হইতে সম্ভূত হইয়া একটী nation তৈয়ারী করিয়াছে? সব Nation এর ভিতরইত অন্য অনেক জাতি race মিলিত হইয়াছে। ইংরাজ জাতি ত Angles, Saxons, Jutes, Celts, Normans প্রভৃতি race এক হইয়া এক নূতন English nationality গঠন করিয়াছে। আমাদের তেমন হইবে না কেন? ভাষাত আমাদের সাহায্য করিতেছে।

বাঙ্গালা ভাষাতে আমাদের মনে এক বংশ হইতে উৎপন্ন ভাবটী—যদিও সময়ে সময়ে জানাইয়া দিতেছে বটে, but caste favour particularist rather than nationalist tendencies. এই জাতিভেদ আমাদের এক হইবার পথে এমন বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছে যে,যতদিন ইহা বর্ত্তমান থাকিবে,ততদিন আমরা এক হইতে পারিব কি না সন্দেহ। আমি কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে একথা বলিতেছি না—আমার ভারতবর্ষের Ethnology পাঠ করিয়া

এই ধারণা এমন বদ্ধমূল হইয়াছে—আজ আমি সেই কথাই আপনাদের নিকট বিশেষভাবে বলিব বলিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমি যে কেবল এই কথা বলিতেছি, তাহা নয়—Risley, Ibbetson, Senart প্রভৃতি প্রবীন Indian Ethnologists সকলেই এই কথা বলিতেছেন। একটি গল্প বলিয়া এই বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করিব।

একজন শ্রদ্ধেয় বাঙ্গালী একবার পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, রেলের গাড়ীতে এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজের সহিত আমাদের দেশের Political future সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ হয়। তাহাতে সেই ইংরেজটী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা চাও কি? তিনি বলিলেন যে,"আমরা চাহি যে,তোমরা আর কিছুদিন থাক, আমরা প্রস্তুত হইয়া লই,তাহার পর তোমাদের এ দেশ হইতে তাড়াইয়া দিব। আমাদের দেশ আমাদের হউক।" সাহেবটী জিজ্ঞাসা করিলেন,"কতদিন পরে তোমরা আমাদের তাড়াইয়া দিতে পারিবে, মনে কর।" তাহাতে তিনি বলিলেন—"প্রায় একশত বৎসর লাগিবে।" ইংরাজটী স্থির হইয়া একটু ভাবিয়া পরে বলিলেন যে, "বাবু, যতদিন তোমাদের মধ্যে জাতিভেদ থাকিবে, ততদিন আমরা নিশ্চিন্ত আছি। এই জাতিভেদ থাকিতে তোমরা কখনও এক হইতে পারিবে না। এক হইতে না পারিলে আমাদেরও কোন ভয় নাই।"

কেন তিনি এ কথা বলিলেন? জাতিভেদের মধ্যে এমন কি আছে যে, আমাদের এক হইতে দিবে না? দেখা যাউক, জাতিভেদের উৎপত্তির কারণ কি? তাহার ভিতর এমন কিছু আছে কি না, যাহাতে আমাদের এক হইবার পথে বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছে? কেহ হয়ত বলিবেন যে, পৃথিবীতে জাতিভেদ কোথায়ও উঠিয়া যায় নাই—ইংলণ্ডে ধনী নির্ধনের মধ্যে এত ব্যবধান যে, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না—সেখানে Lord বংশের লোকেরা অতি ঘৃণার চক্ষে অপরের দিকে চাহিয়া থাকে। ঐ সব দেশে aristocracy of wealth আছে, আমাদের দেশে aristocracy of birth, জাতিভেদ ছাড়া যায় না। সে সব দেশে যখন জাতিভেদে nationality গঠনে কোন প্রকার ক্ষতি হয় নাই, আমাদের দেশে যে তাহা দ্বারা ক্ষতি হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কি? একটা কথা স্মরণ করিতে হইবে যে, পৃথিবীতে কোন সময়ে যে সমাজের ভিতর এই ভাবে সব লোকই এক অবস্থাপন্ন হইবে, ইহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। যতদিন মানুষের মধ্যে বুদ্ধি ও শক্তির বিভিন্নতা থাকিবে,ততদিন বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী লোকেরা পৃথিবীতে সমান ভাবে প্রাধান্য পাইবেই।

আমাদের কথা এই যে,পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে এই বুদ্ধি বা শক্তি কেবল বংশ বিশেষে চিরকালের জন্য একচেটিয়া নাই বা থাকিবেও না, এবং তাহার উপর কোন সমাজও দাঁড়াইতে পারে না। রাখিবার চেষ্টা করিলেই তাহার ফল বিষময় হইবে। আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, পাশ্চাত্য দেশে Capital ও Labourএর মধ্যে যে সংগ্রাম উপস্থিত, তাহার ফলে সমাজের ভিতরকার অসামাঞ্জস্য ভাগ ক্রমে অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিতেছে। ইহা ভিন্ন Death Duties,Old Age Pension,Texation on unearned income, Nationalization of Land, Nationalization of Railways প্রভৃতি যে সকল উপায় অবলম্বিত হইতেছে, তাহা দ্বারা সমাজে কতকগুলি লোকের হাতে অর্থ আর জমিবার উপায় থাকিতেছে না। দেশের টাকা দশ জনের হাতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ভেদ একেবারে চলিয়া যাইতেছে না—যাইতে পারেও না। তবে কোন সমাজ বংশগত ভাবে তাহা রাখিবার চেষ্টাও করি-তেছে না—রাখিতে গেলে থাকিবেও না।

পাশ্চাত্য দেশে যখন আমাদের দেশের মত বংশগত জাতিভেদ দেখিতেছি না, তখন তাহার উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে আমাদের দেশের কথা আলোচনা করিতেই হইবে। ইহার উৎপত্তির কারণ কি?

সাধারণতঃ তিনটী কারণ দর্শিত হইয়া থাকে। প্রথমটী আমাদের দেশের শাস্ত্রকারদের। জাতিভেদের কথা উঠিলে আমরা প্রথমেই মনুর কথাই তুলি। মনু জাতিভেদ সম্বন্ধে একমাত্র লেখক নন। তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে অনেকেই এই বিষয়ে লিখিয়াছেন। আমরা সকলের মতামত আলোচনা করিবার সময় পাইব না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনুর মতকে literary theory বলিয়াছেন। ইহাদের সাধারণ এই মত যে, এদেশে আদিতে চারি বর্ণ ছিল। এই চারি বর্ণ মধ্যে আদান প্রদান চলিত। উচ্চশ্রেণীর কন্যা বিবাহ করিলে অনুলোম বিবাহ বলিত। নিম্নশ্রেণীর পুরুষে উচ্চশ্রেণী হইতে কন্যা গ্রহণ করিলে তাহাকে প্রতিলোম বলিত। এইরূপ উভয়বিধ বিবাহে যে সব সন্তান সন্ততি হইত, তাহাতে সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হইত। ক্রমে আদি চারিবর্ণও এই সঙ্কর বর্ণ ও তাহাদের সন্তান সন্ততিদের মধ্যে যত বিবাহ হইতে লাগিল, ততই নূতন নূতন প্রকার জাতির উৎপত্তি হইতে লাগিল। এই theory গ্রহণ করিয়া সময় সময় সংহিতাকারগণ বিপদে পড়িয়াছিলেন। যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, চীন, শক বা দ্রাবিড় জাতীয়

পরাক্রান্ত রাজারা বর্ত্তমান আছেন ও যখন ইহাও দেখিলেন, তাঁহাদের ক্ষত্রিয় বলিয়া না স্বীকার করিলেও চলে না, তাঁহাদের সঙ্করবর্ণ বলিলে চলে না—তখন আর একটা কথা উঠিল, তাঁহারা আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ ব্রাত্যক্ষত্রিয় সমাজে গৃহীত হইলেন। Main, Hunter প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই theoryটার এই অর্থ করিয়াছেন যে, প্রথমে যখন আর্য্যেরা এদেশে আগমন করেন, তখন আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই বর্ণ ছিল। আর্য্যেরা কার্য্যভেদে ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিন জাতি গঠন করিলেন। তিন জাতিই আর্য্যবংশ-সম্ভূত বলিয়া ইহাদের মধ্যে প্রথমে বিবাহ বন্ধ হইল না। আদিতে তেমন বাঁধাবাঁধি রকমে জাতিভেদ না থাকিলেও, ক্রমে বংশপরম্পরায় নিজেদের জাতিগত ব্যবসা চলিতে লাগিল ও এক ব্যবসায়ী লোকদের মধ্যে বিবাহ আদি বেশী চলিতে লাগিল। ক্রমে জাতিভেদ পাকা হইল। এদিকে অনার্য্যবংশীয়েরা দাস, দস্যু নামে পরিচিত হইতে লাগিল। তাহারা অনার্য্যদের দ্বারা বিজিত হইয়া তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত রহিল, শূদ্র জাতির উৎপত্তি হইল। উচ্চ শ্রেণীর পুরুষেরা যে তাঁহাদের কন্যা গ্রহণ করিতে লাগিলেন না, তাহা নয়। তখন করিয়াছেন—এখনও, মান্দ্রাজ প্রদেশে যদি আপনারা গমন করেন, তাহা হইলে স্থানে স্থানে দেখিতে পাইবেন যে, ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্রই কেবল ব্রাহ্মণ কন্যা গ্রহণ করিতেছেন—অন্য সন্তানেরা অন্য জল-আচরণীয় জাতির কন্যা গ্রহণ করিয়া বাস করিতেছেন। বাঙ্গালা দেশেও এই শূদ্র কন্যা গ্রহণ একেবারে লোপ পাইয়াছে—তাহা কেহ মনে করিতেন না। আমি চট্টগ্রামে যখন ছিলাম, তখন Gait সাহেবের Bengal Census Report, 1901, পাঠ করিয়া ও স্থানীয় ভদ্র লোকদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম যে, সে প্রদেশে "কুলজল্যা" নামে এক প্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে। সম্ভ্রান্তবংশের লোকেরা নিম্নশ্রেণীর অবিবাহিত দাসী আনিয়া বাড়ীতে রাখেন। এই দাসীরা বাড়ীর কর্ত্তার পায়ের হাঁটুতে বা গলায় একছড়া মালা ও জল দিয়া বরণ করিলে তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল। তাহাদের যে সন্তান সন্ততি হইবে, তাহারা সেই বাড়ীর কর্ত্তাদের উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকে। যিনি আমাকে এই সংবাদ দেন, তিনি নিজে "ঘোষ"বংশ সম্ভূত, তাঁহাদের রীতিতে এই সব দাসীপুত্র "ঘোষ" উপাধি গ্রহণ করিয়াছে। কায়স্থ বা বৈদ্যের ঘরে এই দাসীপুত্রেরা শূদ্র নামে পরিচিত। ব্রাহ্মণের ঘরে সন্তানেরা "ব্রাহ্মণ ডিঙ্গর" নামে পরিচিত হয়। তবে ক্রমে এই প্রথা প্রায় লোপ পাইয়াছে। পূর্ব্ব

বাঙ্গালায় যে সিকদার বা গোলাম কায়স্থ নামে এক জাতি গঠিত হইয়াছে—তাহার উৎপত্তি এইরূপ বলিয়া আমার বিশ্বাস। আপনারা যদি উড়িষ্যায় যান, তাহা হইলে সাগরপেষা নামে এইরূপ একশ্রেণীর লোক পাইবেন। নেপালেও সম্ভ্রান্ত লোকদের বাড়ীতে যে সব "কেটী" (Kati) রক্ষিত হয়, তাহাদেরও এইরূপ অবস্থা। আমি এই সব কথার উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, ইহা হইতে আপনারা জানিতে পারিবেন, যে প্রথার কথা আমরা মনুসংহিতাতে পড়িতেছি, তাহা আজিও বর্ত্তমান আছে। ইহা দেখিলে আর একটী কথাও বোধ হয় আপনারা সহজে বুঝিতে পারিবেন—কেমন করিয়া এই আর্য্য ও অনার্য্য বংশ ধীরে ধীরে মিশিয়া গিয়াছে। যদি মানহানির সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে আমি নাম করিয়া বলিতে পারিতাম যে, এইরূপ দাসীপুত্রেরা অর্থ ও পদ-মর্য্যাদা পাইয়া এবং ক্রমে কায়স্থ ও বৈদ্যবংশে পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়া, ঐ দুই জাতিতে গৃহীত হইয়াছেন।

আমরা এতক্ষণ মনুর Theory of mixed castes কি, তাহার আলোচনা করিলাম। কেহ কেহ বলিবেন, ইহা theory কি, ইহা যে fact। প্রকৃত ঘটনা দেখিয়াই তাঁহার লেখা। এ কথা বোধ হয় কেহ বলিবেন না যে, যখন মনু তাঁহার সংহিতা লেখেন, তখনই এই সব মিশ্রজাতিগুলি সংগঠিত হইতেছিল। এবং ইহাই ঠিক যে তাঁহার সময়ের পূর্ব্বে বৌদ্ধায়ন, অপষ্টম্ভ প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিজেও তাহার উপর নূতন কিছু কিছু যোজনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কোন কার্য্যের কারণ অনুসন্ধান করা অতি কঠিন কার্য্য, সম্পূর্ণভাবে কৃতকার্য্য হওয়া প্রায়ই ঘটে না। তাহার উপর সামাজিক বিষয়ে কোন কারণ অনুসন্ধান করা আরও কঠিন। এ অবস্থায় জাতিভেদের উৎপত্তির কারণ জানিতে যে কেহ কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। Inorganic World এর ভিতর যে সব নিয়ম চলিতেছে, তাহাদেরই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আমাদের আজিও ভাল করিয়া ধারণা হইতেছে না—তাহার উপর মানব-সমাজ, যাহা মানবের স্বাধীন চিন্তার উপর নির্ভর করিতেছে,—ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম গঠিত হইতেছে,—ইহার মধ্যে একটা কার্য্য কারণ নির্দ্দেশ করা কত কঠিন, তাহা আপনারা সহজেই বুঝিতে পারেন। এ অবস্থায় সংহিতাকারগণ যে জাতিভেদের মতন সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের খুব অধ্যবসায়ের প্রশংসা

করিতে হয়। কিন্তু যখন জানিতে পারি যে, একটী জাতির (caste) ইতিহাস দিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন সংহিতাকার ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—তখনই মনে হয়, অতীতের কারণ নির্দ্দেশ করিতে সকলেরই কল্পনার সাহায্য লইতে হইয়াছে। তাঁহারা যখন জীবিত ছিলেন, তখন সমাজে নানা শ্রেণীর লোক দেখিয়া তাহাদের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহার জন্য কল্পনা দরকার, কারণ পূর্ব্বের যাহা চলিয়া গিয়াছে, তাহাও ফিরিয়া আসিবে না যে, তিনি দেখিয়া তাহার বিষয় লিখিবেন। এই জন্য তাঁহারা কল্পনার সাহায্যে দুইটী theory লইয়া জাতিভেদের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন—সঙ্কর ও ব্রাত্য। মোটের উপর এই দুই theoryর সাহায্য লইয়াই ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন সমাজে সংহিতাকারেরা নূতন নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই জন্য একজাতির একাধিক ইতিহাস পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা দেশে কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির অধিনায়ক মহাশয়েরা যে ভিন্ন ভিন্ন সংহিতার সাহায্যে পরস্পরকে বিদ্রূপ করিতেছেন, তাহা আমা অপেক্ষা আপনারা খুব ভাল করিয়া অবগত আছেন।

কোন সময়ে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বলিয়া চতুর্ব্বর্ণ ছিল, তাহাতেই সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। কারণ ইহা এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে, আর্য্যেরা তখন সরস্বতী দৃষদ্বতী তীরে বাস করিয়া ঋক সামবেদ গান করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না। মধ্যদেশে যখন অগ্রসর হইলেন, তখন শ্রেণীবিভাগ আরম্ভ হইল, দেখা যায়, কিন্তু তখন পরস্পরের মধ্যে বিবাহ বন্ধ হয় নাই। কেহ কি বলিতে পারেন যে, এই সময়ও তাঁহারা অনার্য্য কন্যা গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহাদের দাস দাসী দরকার হয় নাই? তাহা হইলে আমরা কি বুঝিতে পারি না যে,একদিকে যেমন শ্রেণী বিভাগ হইতেছিল, সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের মধ্যে মিশ্রবিবাহও (Mixed marriages) চলিতেছিল। ঠিক কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত চারিশ্রেণীর উৎপত্তি হইল, তাহার পর মিশ্র-বিবাহ আরম্ভ হইল, এমন কল্পনা করার কারণ দেখা যায় না। বরং ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় যে, যে সময়ে অনার্য্যেরা কখনও বা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, কখনও বা আর্য্যদের নিকটে বাস করিয়া তাহাদের সহিত মিশিয়াছেন, সেই সময়ে একদিকে যেমন মিশ্র-বিবাহ হইতে লাগিল, অপরদিক তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে সকলের মধ্যে শ্রেণীবিভাগের উৎপত্তি আরম্ভ হইল। মিশ্রণ ও শ্রেণী বিভাগ, দুইই একসঙ্গে চলিতে লাগিল। এইজন্য বলিতে হয়

যে,ঠিক কোন্ সময়ে যে চতুর্ব্বর্ণ ছিল,তাহার প্রমাণ পাওয়া বড় কঠিন হইতেছে। সংহিতাকারদের কথা মানিতে হইলে একটী বিপদ উপস্থিত হয়। তাঁহারা যখন ব্রাত্য কথাটী ব্যবহার করিয়া চীন,হুণ,খস,দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন, তখন মানিতে হয় যে, অনার্য্যবংশ হইতেও ক্ষত্রিয় বংশ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। কারণ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, ব্রাত্যষ্টোম যজ্ঞ করিয়া এই ব্রাত্যেরা পুনরায় স্বজাতিতে প্রবেশ করিতে পারিতেন। বর্ত্তমান কালে কায়স্থেরা নিজেদের ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রমাণ করিয়া পুনরায় ক্ষত্রিয় দলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহা হইলে ত অনার্য্যদের আর্য্যদের সহিত মিশিবার পথ ছিল। ইহা যদি স্বীকার করিতে হয় ও মিশ্র বিবাহ অবারিত চলিত, স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইতে বলিতে হয় যে,ভারতবর্ষে আর অমিশ্র আদিবংশ নাই। একেবারে অমিশ্র আদি খুব বেশী আছে,স্বীকার না করিলেও,ইহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ভারতবর্ষের উত্তর অংশে অর্থাৎ সাধারণতঃ পুরাকালে যাহাকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিত, সেখানে উচ্চশ্রেণীর ধমনীতে যে আর্য্যরক্ত আছে, তাহা কাহারও অস্বীকার করার অধিকার নাই। আমরা মনুর মতের আলোচনা করিতে করিতে দেখিলাম যে, সংহিতাকারগণ সঙ্কর ও ব্রাত্য, এই দুইটী theories দিয়া আমাদের দেশের জাতিভেদের উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এদেশে যে মিশ্র বিবাহ হয় নাই, তাহা আমরা বলিতেছি না বা আচারভ্রষ্ট হইয়া কোন শ্রেণী হইতে নূতন শ্রেণী গঠন হয় নাই, তাহাও মনে করি না। তবে কেবল এই দুইটী কারণে যে ভারতবর্ষে এই বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আমরা মনে করি না।

Nesfield, Crookes প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষে আর্য্য অনার্য্য এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, এখন তাহাদের স্বতন্ত্র করা কঠিন। তবে এই জাতিভেদের কারণ কি? তাঁহারা বলেন, এই সকল জাতি ব্যবসা ভেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহারা বলিবেন যে, যাঁহারা যজন যাজন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেন। নিজ জাতির কার্য্যের সুবিধার জন্য তাঁহারা কেবল ব্রাহ্মণদের সহিত আদান প্রদান করা বেশী সুবিধাজনক মনে করিতে লাগিলেন। কালক্রমে এই জাতিভেদ বেশ পাকা হইয়া দাঁড়াইলে পরে তাঁহারা নিজ জাতির বাহিরে বিবাহ সম্বন্ধ একেবারে

বন্ধ করিলেন। ক্রমেই জাতিভেদ Crystallized হইয়া পড়িল। এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ব্যবসা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হইল। এই কারণে এক জাতি সব স্থানে দেখা যায় না, বা সব জাতি এক প্রদেশে দেখা যায় না। যে সব স্থানে লবণ বা সোরা প্রস্তুত করা আবশ্যক ছিল, সেখানে নুনিয়া (Nunia) জাতির গঠন হইল। যেখানে লবণের ব্যবসায় নাই, সেখানে আর নুনিয়া জাতির চিহ্নও পাওয়া যায় না। জাতিভেদ হইল বটে, তবে উচ্চ নীচ উৎপত্তির কারণ কি? তাঁহারা বলিবেন যে, সব ব্যবসাত ভাল ছিল না। যাহারা চামড়ার ব্যবসা করিল, তাহারা যজন যাজন পদে নিযুক্ত লোকদের সঙ্গে সমাজে সমান সম্মান কথনও পাইল না। এইরূপ ব্যবসা ভেদে উচ্চ নীচ জাতির উৎপত্তি হইল। এইজন্য তাঁহারা বলেন যে, এক এক প্রদেশে এক এক ব্যবসা ঘৃণিত না হওয়ায়, এক জাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সমাজে উচ্চ নীচ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই কৈবর্ত্ত জাতি বাঙ্গালা দেশে কোন স্থানে জল আচরণীয়, কোন স্থানে অচল। এই theory মধ্যে যে সত্য আংশিকভাবে নিহিত আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে এই theoryদ্বারা কেবল জাতিভেদের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা আমরা মানিতে পারি না। কারণ সদ্বংশ-জাত ব্রাহ্মণ সন্তান ও জেলে, মালা, বাগদী, বাউড়িকে কেহ এক স্থানে দাঁড় করাইলে যদি কেহ তাহাদের সকলকে এক বংশসম্ভূত মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের চক্ষের দোষ দিতে আমাদের কোন ভয় হয় না। আমরা এই functional origin of castes অগ্রাহ্য করিলেও আমাদের আর কোন theory আছে কি না?

Risley, Gait প্রভৃতি পণ্ডিতেরা আর এক theory উপস্থিত করিতেছেন। ইঁহারা বলিতেছেন যে, সংহিতাকারদের literary theory or Nesfield প্রভৃতি সাহেবদের fuctional theory মধ্যে সত্য নিহিত আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে আর দুইটী কারণ প্রধানতঃ ভারতবর্ষে জাতি-ভেদের আদি হইতে কার্য্য করিতেছে, সে দুইটী কারণ উপস্থিত আছে বলিয়া মিশ্র বিবাহ হইলেও, চীন, হুণ প্রভৃতি জাতিকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া লইলেও, বা মণিপুর প্রভৃতি স্থানে নূতন শ্রেণী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইলেও, ব্যবসা-ভেদে জাতিভেদের উৎপত্তি হইলেও, ভারতবর্ষে অতি পুরাকাল হইতে জাতিভেদের উৎপত্তি হইয়াছে ও বর্ত্তমানে হইতেছে। এই দুইটীর মধ্যে একটীকে আমরা fact বলিব, অপরটীকে fiction বলিব। Facts গুলি

এই যে, "pride of blood" and "idea of ceremonial purity." উচ্চ শ্রেণীর লোকদের বিশ্বাস যে, তাহাদের যে বংশে জন্ম, তাহা অন্য সব বংশ হইতে উন্নত। এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সংশ্রবে আসিলে, তাহাদের স্পর্শ করিলে ও তাহাদের অন্ন আহার করিলে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়, তাঁহাদের রক্ত দূষিত হয়। ভাল রক্তে (Pride of blood) বিশ্বাস লইয়া এখন পৃথিবীর অন্য-স্থানে সংগ্রাম চলিতেছে। Americaতে Europeans ও colourd races, Australiaতে Europeans and Asiatics,—South Africaতে Europeans and Blacks মধ্যে যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা আপনারা অবগত আছেন। এই দেশেও এখন ইংরাজ ও এদেশীয়দের মধ্যে যে সংগ্রাম যাইতেছে, এক সময়ে আর্দি ও অনার্য্যদের মধ্যে যে সংগ্রাম গিয়াছে, এখনও ব্রাহ্মণেরা যে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাহারই আভাস মাত্র। যেখানে এক শ্রেণীর লোক culture ও civilization লইয়া অন্য uncultured ও Barbarous জাতির সহিত একদেশে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেইখানেই এই সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। পৃথিবীর অনেক স্থানেই এই সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোথায়ও ভাল করিয়া জাতিভেদ পাকা দাঁড়ায় নাই। ভারতবর্ষে ইহা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেন দাঁড়াইল, তাহারই অনুসন্ধান করা দরকার।

আমি আর একটী factএর কথা তুলিয়াছি—তাহাতে আমি Idea of ceremonial point বলিয়াছি। জিনিষটা কি, তাহা আপনারা সকলেই ভাল বুঝেন, আজ যদি সদ্বংশজাত, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিয়া কোন কায়স্থ-সন্তান ভাত রাঁধিয়া দেন, তাহা হইলে কোন ব্রাহ্মণ তাহা খাইবেন না। এমন কি, পশ্চিমের কোন ব্রাহ্মণ বাঙ্গালা দেশের কোন ব্রাহ্মণের ঘরেও ভাত খাইবেন না। ইহার কারণ কি? এই বিষয়ে আমি এখানে আর বেশী কিছু বলিব না। কারণ বেশী বলিতে গেলে এই প্রবন্ধ এত বড় হইয়া যাইবে যে, তাহাতে সভার অন্য কার্য্যের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। এই ভাবটী দক্ষিণ ভারতে এমন বদ্ধমূল হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণে আহার করিতেছে, ইহা যদি কোন Pariah দেখে, তখনই যদি ব্রাহ্মণ আহার ত্যাগ করিয়া হাত মুখ না ধোন, তাহা হইলে তিনি জাতিভ্রষ্ট হইবেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতিতে যদি জল তুলে, সে জলে পা ধুইলেও ব্রাহ্মণের জাত যাইবে। কোন রাস্তা দিয়া যদি ব্রাহ্মণ যান, তাহা হইলে Pariah তাহা হইতে ৪০ হাত দূরে দাঁড়াইয়া থাকিবে।

কি কঠোর Idea of ceremonial Purity· কি কারণে ভারতবর্ষে জাতিভেদ আমাদের স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে, তাহা আপনারা এখন সহজে বুঝিতে পারিতেছেন। Sir Charles এই জন্য বলিয়াছেন যে, "The wedges which have riven asunder and are keeping separate the general mass of Indian People are furnished and applied by the system of caste.

The two great outward and visible signs of caste fellowship—intermarriage and the sharing of food are the bonds which unite or isolate groups."

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে Purity of blood সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাসটী এমন মর্ম্মাহত হইয়া গিয়াছে যে, আমার ভুলিয়াও একবার মনে করিতে পারি না যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ প্রচলন করিয়া (Intermarriage) ভারতবর্ষের সব জাতি এক হইয়া যাইব। এবং Idea of ceremonial Purity এমন কঠিন ভাবে আমাদের গ্রাস করিয়াছে যে, ভিন্ন জাতির অন্নগ্রহণ দূরে থাকুক, উচ্চশ্রেণীরা নিম্নশ্রেণীর কাছেও আসিবেন না।

অপর একটী কথার উল্লেখ করিয়াছি। Fiction জাতিভেদের মূলে আছে। একটী উদাহরণ দিলে এই কথাটী পরিষ্কার হইবে। কৈবর্ত্ত জাতির কথা দেখুন। যাঁহারা এই জাতির Physical characteristic পরীক্ষা করিবেন, তাঁহারাই বলিবেন যে ইহাদের মধ্যে Dravidian element খুব বেশী।

এই Dravidian Elementএর আর একটী প্রমাণ আছে। বাঙ্গালা দেশের পশ্চিমে অন্য কোন প্রদেশে ইহাদের দেখিতেও পাইলেন না। পশ্চিম বাঙ্গালার মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় ইহাদের সংখ্যা যেমন অধিক, তেমনি এইসব স্থানে ইহাদের অবস্থাও তেমন উন্নত। পূর্ব্ব আসামে ব্রহ্মপুত্র নদীর ধার পর্য্যন্ত ইহারাও অগ্রসর হইয়াছে। তাহা হইলে এই জাতির উৎপত্তি এই বাঙ্গালা দেশেই। ইহারা কোনদিন পশ্চিম হইতে আসে নাই। ইহাদের নিকটই দ্রাবিড়ী জাতীয় সাঁওতাল, কোলেরা বাস করিতেছে। এখন এই জাতীয় লোকদের আমরা দুইটী কার্য্যে নিযুক্ত দেখি, কতকগুলি চাষের কার্য্যে নিযুক্ত, কতকগুলি মাছধরা কাজে নিযুক্ত। যাঁহারা চাষ করিতেছেন, তাঁহাদের ব্যবসাটী তাদৃশ নিকৃষ্ট নয় বলিয়া ইঁহাদের সমাজে

তেমন নিম্ন স্থান নয়। এই জন্য তাঁহারা, তাঁহাদের আত্মীয় যাঁহারা মাছধরা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের সহিত আহার ত্যাগ করিয়াছেন। দুইটা স্বতন্ত্র জাতি হইয়া পড়িয়াছে। যখন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত, অমনি একটা fiction উপস্থিত হইয়াছে যে, ইহাদের উৎপত্তিও ভিন্ন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভাব হইল না—একটা geneology প্রস্তুত হইয়া গেল। ইহারা মাহিষ্য নাম গ্রহণ করিলেন। বাঙ্গালা দেশে জেলে কৈবর্ত্তেরা নূতন নাম আজিও লন নাই বটে, আসামে ইহারা "নদিয়াল" নাম গ্রহণ করিয়া একটা স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। মূলে এক জাতি ছিল, ক্রমে দুই জাতি হইল। ব্যবসা ভেদে ইহাদের ভেদ আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু আর এক হইবার উপায় নাই। এমন fiction আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যেমন ব্যবসা ভিন্ন তখন ইহাদের উৎপত্তিও ভিন্ন।

কেহ কেহ আপত্তি তুলিতে পারেন—অনার্য্য বংশ (Dravidian) কিরূপে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিল? এই শ্রেণীর আপত্তি-কারীদের বিশ্বাস যে, হিন্দু-সমাজের প্রসারণ নাই। লোকে খ্রীষ্টান, মুসলমান হয়—অহিন্দু যে আবার হিন্দু হয়, ইহাত কখনও শুনি নাই। হিন্দু বলিতেই আর্য্য জাতীয় বুঝিতে হইবে। বাহিরের কেহ কখনও হিন্দু হইতে পারে না। আমি মণিপুরীদের বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, হিন্দু হইবার শুধু নয়, হিন্দু ব্রাহ্মণ হইবার কথা বলিয়াছি। মনুতে দেখিবেন চীন, শক, দ্রাবীড়, যবন, খসেরাও ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। কেবল অতীত কালের কথা বলিতেছিনা—বর্ত্তমানেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আপনারা কেহ যদি ছোটনাগপুর বেড়াইতে যান, তাহা হইলে আপনাদের নিকট সাঁওতাল, মাহিলী ও ভূমিজ, এই জাতির তিনজন লোক যদি উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলে আপনারা আকারে ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখিতে পাইবেন না। তবে আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদে প্রভেদ দেখিতে পাইবেন। ভূমিজ বা ভুঁইয়ারা বাঙ্গালী সাজিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষায় কথা কয়, হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে—এক কথায় ইহাদের বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে ধরা যায়। হিন্দুর মধ্যে একটা নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। মাহিলীরা (Mahili) যখন আপনাদের মধ্যে কথা কয়, তখন সাঁওতালি ভাষায় কথা কয়, নতুবা অন্য কাহারও সহিত কথা কহিবার সময় ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দি বা বাঙ্গালায় কথা কহিবে। নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ ভাবে

বঙ্গা বঙ্গির (Bonga Bongi) পূজা ছাড়ে নাই। পরিধানে বিলাতী কাপড় হিন্দুস্থানিদের মতন করিয়া পরিতে শিখিয়াছে। সাঁওতালেরা কিন্তু হিন্দুনাম লইতে ঘৃণা করে, নিজেদের "হর" বলিয়া জানে, আর সব "দিকু" ব্রাহ্মণ জাতির উপর একেবারে শ্রদ্ধা নাই, হিন্দু দেবদেবীর নামও সহ্য করিতে পারে না। পরিধানে মোটাসূতার হাতে বোনা কাপড়। কিন্তু যেমন চেহারায়, তেমনি আর একটী বিষয়ে ইহাদের একতা বুঝা যায়। হিন্দুদের গোত্র নাম ঋষি মুনি দিয়া। আমাদের কাহারও গোত্র কি, জিজ্ঞাসা করিলে "গৌতম" কি "বিশ্বামিত্র" বলিব। এবং কখন কখন গৌতম গোত্রের বালক নিজ গোত্রের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। ইহাকে Eponym বলে, কিন্তু সব শ্রেণী মধ্যে এই গোত্রনাম কোন জীবজন্তু বা গাছপালা দিয়া। কেহ "হাঁসদা" কেহ "মুর্মু"। ইহাকে totem বলে। 'হাঁসদা" বংশের কেহ কখনও হাঁসদাবংশে বিবাহ করিতে পারিবে না। দেখা যায়, কোন কোন স্থানে অসভ্য জাতি হিন্দুসমাজ মধ্যে প্রবেশ কালে এই সব totem নাম ত্যাগ করিয়া একটী একটী হিন্দু eponym নাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তন্মধ্যে তাহাদের "কাছওয়া" (অর্থাৎ কচ্ছপ) নামটী "কশ্যপ" হইতে প্রায় অভিন্ন বলিয়া প্রায়ই এই গোত্রটী হিন্দু হইবার সময় পছন্দ করিয়া লয়। এই শ্রেণীর মধ্যে এই জন্য "কশ্যপ" গোত্রের আধিক্য দেখা যায়। একদিন একজন "ঘাটওয়ার" (ghatwar)কে তাহার গোত্রের কথা আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে বলিল, তাহার "গোৎ" "কাছওয়া"। ঘাটওয়ারা কিন্তু জল-আচরণীয় শুদ্ধ জাতি। কোন প্রকার হিন্দুর অখাদ্য খায় না। পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিলাম যে, তাহারা কখনও কচ্ছপ খায় না। তাহাদের বিশ্বাস যে তাহারা সকলে "কচ্ছপ" হইতে উৎপন্ন, এই জন্য তাহারা কচ্ছপ পূজা করিবে ও তাহা কখন বধ করিবে না বা তাহা আহার করিবে না। যে জাতি যখন totem নাম গ্রহণ করে, তখন তাহারা আর সে জন্তু বা গাছ নষ্ট করে না। যে হাঁসদা, সে কখন হাঁস মারিবে না। তাহাদের বিশ্বাস যে হাঁস হইতে তাহাদের বংশ উৎপন্ন হইয়াছে, যে পূজ্য, তাহাকে কি কখনও মারা যায়, খাওয়া যায়? এই গোত্র নামগুলিকে তাহাদের অনার্য্য বংশ হইতে উৎপত্তির চিহ্নও রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহারা জল-আচরণীয় হিন্দুজাতিতে পরিগণিত হইয়াছে।

এইসব কথা লইয়া আলোচনা করিবার সময় একদিন আমার এক শ্রদ্ধেয়

বন্ধু বলিলেন যে, পৃথিবীতে যেখানে ইউরোপীয়েরা গিয়া বাস করিতেছে, তাহারা সেই দেশের আদিম অসভ্যদের ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে, ভারতবর্ষে আর্য্যদের উপনিবেশের সঙ্গে সঙ্গে আদিম অধিবাসীদের ধ্বংস হয় নাই, বরং এক একটী নূতন জাতি গঠন করিয়া তাহাদের হিন্দুসমাজে আশ্রয় দিয়াছেন। ইহা extinction নয়, incorporation. কথাটীর ভিতর যে কিছু সত্য নাই, তাহা বলিতেছিনা। কিন্তু যে pride of blood লইয়া আর্য্যেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার একটুও তাঁহারা কমান নাই। তাহাদের স্থান দিয়াছেন, সমাজের নিম্ন স্থানে। নিজেদের কাছেও আসিতে দেন নাই।

ইংলণ্ডের কথা লওয়া যাউক। এখানে Celtic races প্রথমে বাস করিতেছিল—যখন Tuetons, Angles, Saxons, Tutes প্রভৃতি আসিয়া বাস করিতে লাগিল, তখন প্রথমে খুব সংগ্রাম হইল, কিন্তু পরে দুই জাতি মিশিয়া এক হইয়া গেল। তাহার পর যখন Normans আসিয়া বসিল, তখন প্রথমে অত্যাচার অবিচার চলিতে লাগিল। কিন্তু ২০০।৩০০ বৎসরের মধ্যে সব একাকার হইয়া গেল। ইহার মূলে দুইটী কারণ দেখা যায়। একটী এই যে, ইহাদের সকলেরই রং প্রায় এক রকম ছিল, সকলেরই সভ্যতা প্রায় এক রকম ছিল। ভাষা ভিন্ন হইলেও আমাদের দেশের আর্য্য অনার্য্যের মতন বিভিন্ন ছিল না। আর একটী কথা সকলেরই ধর্ম্ম এক ছিল। Pride of blood ছিল না—ধর্ম্ম এক হওয়ায় আদান প্রদান সহজেই চলিতে লাগিল। সব এক হইয়া যাইবার পথে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইল না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজ ও বুয়ার অতি অল্প দিনের মধ্যে এক হইয়া যাইবে। কিন্তু Blacksদের সঙ্গে এক হওয়া বড় কঠিন। সেখানে Pride of blood এক হইবার পথে দাঁড়াইয়া আছে। ভারতবর্ষে এই Pride of blood জাতিভেদের মূলে রহিয়াছে। এখন আমরা এই বাঙ্গালা দেশে মনুসংহিতার Theory লইয়া সেই পুরাতন তিন দ্বিজবর্গের মধ্যে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি। হিন্দু সমাজের নিম্ন জাতি সব ভাল আর্য্যবংশ সম্ভূত জাতি বলিয়া প্রমাণ করিয়া উচ্চ হইতে চেষ্টা করিতেছেন। সেই Pride of blood এখনও আমাদের মধ্যে কাজ করিতেছে। চারি দিকেই এই movement দেখা যাইতেছে। আমাদের আর্য্য হইতেই হইবে। অনার্য্যদের প্রতি আমাদের এত ঘৃণা যে,আমাদের ধমনীতে যে অনার্য্য রক্ত আছে,তাহা স্বীকার করি-

তেও আমাদের লজ্জা হয়। আমাদের Idea of ceremonial purity বলিয়া দিতেছে, অনার্য্যদের স্পর্শেও পাপ আছে। যে সব অনার্য্যবংশ আমাদের ভাষা, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজে নূতন জাতি গঠন করিয়াছে, তাহারও আর্য্য সাজিবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু যাঁহারা বড়, তাঁহারা ছোটদের দাবী গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নন্। পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ কমিবার কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না। অধিকন্তু ব্যবসা ভেদে নূতন নূতন প্রদেশে বাস করিয়া নূতন নূতন জাতির উৎপত্তি হইয়া জাতি সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া যাইতেছে। আমাদের Nation হইবার পথে বিঘ্নই উপস্থিত হইতেছে—আমরা এক হইতে পারিতেছি না। আমি আর দুইটী উদাহরণ দিয়া আমার এই বিষয়ে যাহা বক্তব্য আছে, তাহার শেষ করিব।

আপনারা যদি Census Report পাঠ করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের বাহিরে (আমি শ্রীহট্টকে বাঙ্গালার ভিতর ধরিতেছি) বৈদ্যজাতি দেখিতে পাইবেন না। বৈদ্য জাতির এই বাঙ্গালা দেশেই উৎপত্তি। ইহাদের জাতিগত ব্যবসা চিকিৎসা করা। আমাদের দেশে এই শাস্ত্রের সহিত তন্ত্রের কিরূপ নিগূঢ় সম্পর্ক, তাহা আমার বন্ধু এই সভার সভাপতি (Dr. P. C. Ray) তাঁহার History of Hindu Chemistry পুস্তকে দেখাইয়াছেন। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা একপ্রকার এই বাঙ্গালা দেশেই নিবদ্ধ। বৈদ্যদের মধ্যে অধিকাংশই যে তান্ত্রিক, তাহাও আপনাদের অবিদিত নাই। এই সব কথাগুলি একত্র করিলে কি আমরা বুঝিতে পারি না, বাঙ্গালাদেশে তন্ত্র ও চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে করিতে ও ব্যবসা নিজেদের সীমাবদ্ধ হইয়া গেলে এই বৈদ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছে? ইহা একটী functional caste. বাঙ্গালা দেশের বাহিরে বৈদ্য বলিলে আজিও জাতি বুঝায় না—একটী ব্যবসা বুঝায়। ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য সব জাতিতেই এই ব্যবসা করিতে পারে। আপনারা এখন একটা কথা তুলিবেন, ইঁহারা যখন বৈদ্য বলিয়া জাতিতে পরিণত হন নাই, তাহার পূর্ব্বে ইঁহারা কি জাতি ছিলেন? একটা ভিন্ন জাতি পরিবর্ত্তিত হইয়াত বৈদ্য জাতি হইয়াছে? সে জাতি কি জাতি ছিল?

অতীতের কথা বলা সর্ব্বদাই কঠিন। তবে যদি কিছু চিহ্ন থাকিত, তাহা লইয়া কল্পনার সাহায্যে আমরা কিছুদূর অগ্রসর হইতে পারি। আপনারা যদি চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট জেলা ও ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার পূর্ব্ব

অংশে গমন করেন, তাহা হইলে দেখিবেন,ঐ প্রদেশে কতকগুলি বংশ বৈদ্য ও কতকগুলি বংশ কায়স্থ বলিয়া পরিচিত। আহারও আদান প্রদানে তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার ভেদ নাই। এমন কি, কোন কোন বংশ কিছু দিন কায়স্থ, তাহার পর কিছুদিন বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দুই জাতির বিবাহ হইতে সম্ভূত সন্তানেরা তাহাদের পিতা মাতার বৈধ সন্তান, তাহা High Court এ এক মকর্দ্দমায় স্থির হইয়া গিয়াছে। কেহ বলিবেন যে, যথেষ্ট লোক সংখ্যা না থাকায় এই অবস্থা হইয়াছে। পূর্ব্বে পার্থক্য ছিল, কিন্তু এখন উভয় জাতি বাধ্য হইয়া এইরূপ সম্বন্ধ করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে সমস্ত বৈদ্য সংখ্যা প্রায় ৮৫ হাজার। তাহার মধ্যে এই কয়েক স্থানে প্রায় ৪০ হাজার বৈদ্য। তাঁহাদের মধ্যে যে ছেলে মেয়ে পাওয়া না যায়, তাহা কে বলিবে। এই সব স্থানে কায়স্থ প্রায় ২ লক্ষের কম হইবে না। তাঁহাদের যে নিজজাতির ভিতর বিবাহের সুবিধা হয় না, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। আর কৈ সেখানেত বৈদ্য ও ব্রাহ্মণে বা কায়স্থ ও ব্রাহ্মণেত বিবাহ দেখা যায় না। হিন্দুসমাজে তাহাদের সমান সম্মান বলিয়া এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। কেবল এই স্থানেই কি এইরূপ হয়? আপনারা যদি বৈদ্যদের আদি কুলজিলেখক ভরতমল্লিকের "চন্দ্রপ্রভা" পাঠ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, তিনি অসঙ্কোচ চিত্তে বৈদ্য কায়স্থের বিবাহের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সে আজ প্রায় ৩০০।৩৫০ বৎসরের কথা। তিনি পূর্ব্ববাঙ্গালার বৈদ্যদের কথা লিখেন নাই—রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ বৈদ্যদের কথা লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিতেছেন "এমন কি, সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্য পণ্ডিত ভরত মল্লিক তাঁহার চন্দ্রপ্রভা নামক বৈদ্যকুল-পঞ্জিকায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, সেনভূমের রাজবংশ মধ্যে যাঁহারা অস্ত্রশস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী, তাঁহারা কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন, তাঁহারাই বৈদ্য বলিয়া অভিহিত হন।" কায়স্থবৈদ্যের মধ্যে যখন এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তখন ইহারা দুইটী জাতি হইয়া কেন মারামারি আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করা উচিত।

কায়স্থজাতিও একটী functional caste পুরাতন সংস্কৃত পুস্তক পাঠ করিলে জানা যায় যে, রাজসরকারে যাঁহারা লেখাপড়ার কাজ করিতেন, খাজনা আদায় করিতেন, তাঁহারাই কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইতেন। অবশ্য তাঁহারা উচ্চশ্রেণী হইতে জন্মগ্রহণ করিতেন। নূতন Idea of ceremonial purity

অনুসারে রাজদরবারে কখন বসিতে স্থান পাইতেন না। এখনও শ্রীহট্ট জেলায় জমিদার সরকারের প্রধান লেখককে পুরকায়স্থ বলিয়া ডাকা হয়। এই শ্রেণীর লোকে হিন্দু রাজাদের সময় ও তাহার পর মুসলমানদের সময় "পার্শি" ভাষা শিখিয়া রাজদরবারে লেখকের কাজ করিয়াছেন। আনি আকবরীতে কায়স্থদের কথা সকলেই পাঠ করিয়াছেন। হুসেন সাহেব প্রভৃতি বাঙ্গালার নবাবদের আমলে যে কায়স্থেরা রাজদরবারে প্রধান স্থান গ্রহণ করিতেন, তাহাও আপনাদের অবিদিত নাই। ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন যে, The head ministerial officer of the Visaya office was the Jyestha Kyestha, (J. A. S. B. 1894 p, 44) যখন বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ ছিল এবং সেই বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে তান্ত্রিক ধর্ম্ম যখন এদেশ হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের লোপ সাধন করে, তখন আদিশূর যে ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত কায়স্থদের আসার প্রবাদ শুনা যায়। তাহার পর যখন বল্লাল সেন কৌলীন্য-প্রথার সূত্রপাত করেন, তখন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-দের মধ্যেই সেই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া কুলজিকাররা লিখিয়া গিয়াছেন। বল্লালের ও তৎপুত্র লক্ষ্মণের রাজসরকারে কায়স্থ কর্ম্মচারীর কথা শুনা যায়। কোন পুস্তকে বা কুলজিতে বৈদ্যদের কথাত জানা যায় না। তখন বোধ হয় বৈদ্যজাতির গঠন হয় নাই। ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিই চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন ও এই ব্যবসা করিতেন। এদেশেই ব্রাহ্মণেরা চিরকালই সমাজের প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের পরই যাঁহারা সমাজে দ্বিতীয় স্থান পাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা রাজসরকারে লেখকের কাজ করিতেন, তাঁহারা "কায়স্থ" নামে পরিচিত হইতেন। অন্যদিকে এই দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ অপর কতক ব্যক্তি তান্ত্রিকসাধন ও চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বৈদ্যজাতিগঠনের সূত্রপাত করেন। ক্রমে যখন মুসলমানদের সময় কায়স্থেরা রাজসভায় বসিয়া পার্শী ভাষা চর্চ্চা করিয়া রাজানুগ্রহ পাইতে লাগিলেন—তাঁহাদের আত্মীয়েরা তান্ত্রিক সাধন ও সংস্কৃত চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ করিয়া সমাজে সম্মান পাইতে লাগিলেন। এদেশে সেই সময়ে তন্ত্রের খুব প্রভাব ছিল, কাজেই এই তান্ত্রিক সাধকেরা ব্রাহ্মণের পরই সমাজে স্থান পাইতে লাগিলেন। ক্রমে দুইটী স্বতন্ত্র জাতি গড়িয়া উঠিল। পার্শী ভাষায় অভিজ্ঞ কায়স্থেরা রাজানুগ্রহে ধনসম্মান পাইয়া সমাজে বড় রহিলেন, বৈদ্যের তন্ত্র-সাধনা ও সংস্কৃত আলোচনা তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। এমন পরাক্রান্ত

দুইটী জাতি যখন একবার গড়িয়া উঠিল, তখন Fiction উপস্থিত হইল। ইহারা যখন ভিন্ন ব্যবসায়ী, তখন ইহাদের উৎপত্তিও ভিন্ন। কায়স্থেরা ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় হইলেন, বৈদেরা অম্বষ্ঠ হইলেন। আমার এক বিশেষ বন্ধু বলিয়াছেন যে, মনু যে শক (Sak) জাতিকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন—তাঁহারা সকলে Scythian or Skythian বা কায়থীর বংশ-সম্ভূত। সক জাতি এক সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম ও উত্তর অংশে মথুরা পর্য্যন্ত যে রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রমে ভারতের অন্য জাতির সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছেন। আর্য্যেরা যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও সে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন—আর্য্যদের সহিত অনার্য্যদের যেরূপ রং আচার ব্যবহারের পার্থক্য ছিল, তাঁহাদের সহিতও অনার্য্যদের সেইরূপ পার্থক্য ছিল। কাজেই তাঁহারা অনার্য্যদের সহিত না মিশিয়া আর্য্যদের সহিত সহজে মিশিতে পারিয়াছিলেন। এই শক জাতীয় রুদ্র-দমন Rudradaman প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির সময় সংস্কৃত চর্চ্চার জীবন দান করেন। এই কায়থীর জাতি হইতেই কায়স্থ কথাটীর উৎপত্তি। ইহার মধ্যে সত্য নিহিত আছে কি না, তাহা বিশেষ বিচারের বিষয়। বৈদ্যেরা চিকিৎসা ব্যবসায়ী, মনুসংহিতার অম্বষ্ঠেরাও চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা স্থির করি-লেন, তাঁহারাও অম্বষ্ঠ। একটা দেশ ছিল—সেই দেশবাসীরা অম্বষ্ঠ জাতি ছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া যে, ঐ সব অম্বষ্ঠ বৈদ্য ছিলেন বা সব বৈদ্য অম্বষ্ঠ ছিলেন, এমন কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। মনুর অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তির Theory ঠিক কিনা, তাহাও একবার বিবেচনার কারণ ছিল। এখনও পশ্চিমে অম্বষ্ঠ জাতীয় কায়স্থ দেখা যাইতেছে।

দুইটী functional castes—কায়স্থ ও বৈদ্যের উৎপত্তি সম্ভবতঃ এক হইলেও তাহারা তাঁহারা ক্রমে দুই জাতি হইয়া পড়িলেন—পরস্পরেরও বিবাহ বন্ধ হইল, আহার বন্ধ হইল, দাস সেন প্রভৃতি উপাধি থাকিলেও ইহাদের উৎপত্তি এক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াই উভয় জাতিতে পরস্পরের উপর সমাজে প্রধান স্থান পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। Fiction আসিয়া উভয়ের উৎপত্তি ভিন্ন স্থির হইল। জ্ঞাতি শত্রুর ঝগড়া ক্রমে বাড়িয়া গিয়াছে। এখন এই দুই জাতির মধ্যে এমন বিদ্বেষ দেখা যায়, তাহাতে মনে হয় না যে, ইহারা শীঘ্র আর এক হইতে পারিবেন।

হুয়েং সাং (Houeng Tasang) যখন বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলেন, তখনও তিনি এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত দেখিয়াছিলেন। কির্ণ সুবর্ণের (বর্ত্তমান কালে মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী রাঙ্গামাটি কাণসোণা) রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত এদেশে তখন বৌদ্ধদের নির্য্যাতন করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহার পর আদিশূর আবার এদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য উত্তর পশ্চিম হইতে ভাল ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন বলিয়া এদেশে প্রবাদ আছে। তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল, আমরা তাহা আজও জানিতে পারি নাই। আমার মনে হয়,তাঁহার বংশীয় রাজারা গঙ্গা ভাগীরথীর তীরে কোথায়ও (খুব সম্ভবতঃ গৌড়ে) রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আদিশূর ঠিক পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত ঘটনা মনে না করিলেও,ইহা বিশ্বাস করা যায় যে,ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুন প্রতিষ্ঠার জন্য কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহার ও তাঁহার বংশধরদের সময় এদেশে আসিয়াছিলেন। উড়িষ্যা দেশেও এইরূপ প্রবাদ রহিয়াছে। সেখানেও যজ্ঞ করিবার জন্য ১০০০০ দশ হাজার ব্রাহ্মণের আগমনের কথা প্রচারিত। আমরা জানি যে, কোন নূতন দেশে যখন বিদেশীয় লোক আগমন করে, তখন তাহারা নদীর ধার (river valley) দিয়াই অগ্রসর হয়। উড়িষ্যায় আসিয়া সুবর্ণরেখা নদীর ধার দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। মিথিলা মগধ হইতে বাঙ্গালা দেশে না আসিয়া এই ব্রাহ্মণেরা সুবর্ণরেখার তীর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা গঙ্গা ভাগীরথীর ধার দিয়া আগমন করিয়াছিলেন। যাঁহারা কামরূপ (আসামে) যান,তাঁহারা করতোয়া নদীর ধার দিয়া উত্তরে গিয়া পরে লোহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) নদীর ধার দিয়া অগ্রসর হন। এক মিথিলা মগধ হইতে সকলের আগমন বলিয়া উড়িয়া, বাঙ্গালা, ও আসামী ভাষার নৈকট্য এত অধিক। যাঁহারা এই তিন ভাষা ও বিহারী ভাষার পরস্পরের মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে, জানিতে চান, তাঁহারা Grierson সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত Linguistic Survey of India পুস্তক পাঠ করিলে সবিশেষ অবগত হইবেন। বিহারীদের বিশ্বাস, তাহারা হিন্দি ভাষায় কথা কয় ও তাহাদের নিকট সম্পর্ক উত্তর পশ্চিমের লোকদের সহিত। যাহারা লেখাপড়া শিখিতেছে, তাহারা হিন্দি ভাষার চর্চ্চা করিতেছে সত্য, কিন্তু সহরের বাহিরে গ্রামে সাধারণতঃ যে ভাষায় কথা কয়, তাঁহাকে তাহারা গাঁওয়ারী (Ganwari) ভাষা বলেন। এই গাঁওয়ারী ভাষার সহিত আমাদের ভাষার সহিত নিকট সম্পর্ক। মিথিলাতে

ব্রাহ্মণেরা যে অক্ষর এখন ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার নমুনা Grierson সাহেবের Linguistic Survey of India পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা বাঙ্গালা অক্ষর হইতে অভিন্ন। এই অক্ষর সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি স্থায়রত্ন মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, "এক্ষণকার পুস্তকে মুদ্রিত যে বাঙ্গালা অক্ষর দেখা যায়, তাহাই যে প্রাচীনকালের বাঙ্গালা অক্ষর নহে, তদ্বিষয়ে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়-দিগের গৃহে ৩।৪ শত বৎসরের হস্তলিখিত যে সকল সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়,তাহার অক্ষর সকল এখনকার অক্ষর অপেক্ষা অনেকাংশে বিভিন্ন। সচরাচর ঐ সকল অক্ষরকে "তিরুটে (বোধহয় ত্রিহুটে) অক্ষর বলে। ঐ অক্ষরে দেবনাগরের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।" শ্রীকার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় লিখিত "ক্ষিতীশবংশাবলি-চরিত পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি, এদেশে নবদ্বীপেই প্রথম স্থায় ও স্মৃতির চর্চ্চা হয় এবং মিথিলা দেশ হইতে বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া এদেশে সংস্কৃত চর্চ্চার স্থত্রপাত করেন। তাহার পূর্ব্বে মিথিলা প্রদেশের বা চম্পতি মিশ্র, বিবেকবর শূলপাণি, ধর্ম্মরত্ন সংগ্রাহক জীমূতবাহন প্রভৃতি স্মৃতি সংগ্রহকারগণের ব্যবস্থানুসারে বঙ্গদেশে ধর্ম্মকাণ্ড ইত্যাদি চলিয়া আসিত। এই জন্যই আমরা বিদ্যাপতিকে প্রথমে বাঙ্গালী কবি বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম।

এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, এই গঙ্গা ভাগীরথী তীরই প্রথমে বাঙ্গালা দেশের আর্য্যদের বাসস্থান ও সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। গৌড় বা নবদ্বীপ এই নদীর তীরেই অবস্থিত ছিল। এস্থান হইতেই চারিদিকে সভ্যতার আলোক বিস্তীর্ণ হইয়াছে। এই নদীর একদিকে রাঢ় দেশ ও অপর দিকে বারেন্দ্র ভূমি। যখন এই নদীর উভয় তীরে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, তখন ক্রমেই এই বৃহৎ নদী পার হইয়া পরস্পরের মধ্যে আহারাদি ও বিবাহ সম্বন্ধ কমিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে দুইস্থানে বাসজনিত আচার ব্যবহারও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। একটী কারণে এই প্রভেদ ক্রমে বদ্ধমূল হইল। সেটী বংশ নামের উপাধি। আপনারা যদি বম্বে প্রদেশে যান, সেখানে দেখিবেন যে,ব্রাহ্মণের নামে তাঁহাদের গ্রামের নাম দেখিতে পাইবেন। যেমন রামকৃষ্ণ গোপাল ভান্দ্রাকার। এখানে রামকৃষ্ণ নামটী তাঁহার নিজের, গোপাল তাঁহার পিতার নাম, ভান্দ্রাকার গ্রামের নাম। অর্থাৎ ভান্দ্রা-কার-নিবাসী গোপালের পুত্র রামকৃষ্ণ। মান্দ্রাজেও ব্রাহ্মণদের নামে ঐরূপ

স্থানের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ Sir T. Madhav Rao নামে যে স্থানের নাম আছে, তাহা কেহ সন্দেহ করেন না। কিন্তু ঐ Tটী Tanjore অর্থাৎ তাঞ্জোরের মাধব রাও। বাঙ্গালোরের এক সুপ্রসিদ্ধ ধনীর নাম ধর্ম্ম রত্নাকর আর্কট নারায়ণ স্বামী মুদাশির। ইহার মধ্যে আর্কট কথাটী জ্ঞাপন করিতেছে যে তিনি ঐ সহরবাসী ছিলেন। এদেশেও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের সেরূপ ঘটিয়াছে,রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রামচন্দ্র—"বন্দঘাটি"স্থানের"উপাধ্যায়",হরকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ হরকৃষ্ণ "চট্ট"গ্রামের "উপাধ্যায়।" পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের ৫৬টী "গাঁই" অর্থাৎ "গ্রামিন" বা গ্রামের অধিকাংশ রাঢ় দেশের মধ্যে খুজিয়া বাহির করিয়া তাঁহার বাঙ্গালা দেশের জাতীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মণ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। যখন হইতে এই নামের পশ্চাতে প্রথম "বন্দ্যোপাধ্যায়" বা "চট্টোপাধ্যায়" লিখিত হইতে লাগিল, তখন হইতেই তাঁহারা বারেন্দ্র দেশবাসী ব্রাহ্মণদের হইতে স্বতন্ত্র বংশ সম্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইলেন। আমাদের সেই Fiction আসিয়া উপস্থিত হইল। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র তখন স্বতন্ত্র বংশ সম্ভূত বলিয়া স্থির হইয়া গেল। ক্রমে পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ বাড়িতে লাগিল। এখন এই দুইটী দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত।

শূরবংশীয় রাজাদের পর আবার এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম ও তাহার সহিত অতি নিকট সম্পর্কিত তান্ত্রিক ধর্ম্ম এদেশকে গ্রাস করিবার আয়োজন করিল। এদিকে দাক্ষিণাত্য হইতে আগত সেন রাজগণ গঙ্গাতীরে রাজধানী সংস্থাপন করিয়া বসিলেন। তাঁহারা শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের সহিত উড়িষ্যা দেশ হইতে বৈদিকক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশে আসিলেন। ইঁহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক। পশ্চিম হইতে যে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা আসিয়া বাস করিলেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু আমরা এখন জানিতে পারি যে, উড়িষ্যা দেশে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা যে স্থান হইতে উড়িষ্যায় যান, বাঙ্গালাদেশের পাশ্চাত্য বৈদিকেরাও সেইস্থান হইতে আসিয়াছেন। একদল উড়িষ্যা দেশ ঘুরিয়া এখানে আসিয়াছেন, আর একদল বরাবর সোজা এখানে আসিয়াছেন। এখানেও Fiction উপস্থিত হইয়া দুইটী স্বতন্ত্র জাতি গঠন করিয়াছে।

আর অধিক উদাহরণ দেওয়ার আবশ্যক মনে হয় না। আপনারা এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে, প্রথমে আর্য্যেরা যখন এদেশে আগমন করেন, তখন

তাঁহারা অনার্য্যদের ঘৃণা করিতেন, তাঁহাদের pride of blood জন্য তাঁহারা ইহাদের সহিত স্বতন্ত্র থাকিবার চেষ্টা করিতেন। ইহা ভিন্ন তাঁহাদের Idea of ceremonial purityও তাঁহাদের স্বতন্ত্র রাখিত। অনার্য্যদের স্পর্শেও তাঁহাদের জাতিভ্রষ্ট হইতে হইত। কিন্তু এই অনার্য্যদের কন্যা গ্রহণ বন্ধ হয় নাই। কাজেই মিশ্র জাতির উৎপত্তি হইতে লাগিল। স্থানভেদে বাস ও ব্যবসা ভেদের জন্য জাতি বিভিন্নতাও আরম্ভ হইল। অপরদিকে অনার্য্য জাতি সকল আর্য্যদিগের ভাষা ও আচার ব্যবহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এবং ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া হিন্দুসমাজের প্রসারতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ক্রমে সমাজের নানা শ্রেণীর লোক দেখা যহেতে লাগিল। এই নানা শ্রেণীর লোকের উৎপত্তি স্থির করিবার জন্য fiction উপস্থিত হইল। ইহারা যখন সকলে স্বতন্ত্র, ইহাদের উৎপত্তিও স্বতন্ত্র। Fiction জাতিভেদ পাকা করিয়া দিল। ক্রমে ইহা আমাদের সমাজের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিল। একদেশে বাস ও এক ভাষায় কথা কহিয়াও আমরা কেবল পরস্পর হইতে স্বতন্ত্রই হইতেছি—আমাদের পার্থক্য বাড়িয়াই যাইতেছে।

এইজন্যই আমরা বাঙ্গালাদেশে বাস করি বলিয়া ও সকলে বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহি বলিয়া আমরা কিন্তু বাঙ্গালী nation হইতে পারিতেছি না। এক ভাষায় কথা কহিলেও আমি দেখিয়াছি যে,আমাদের ধমনীতে আর্য্য, দ্রাবিড়ীয়, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি নানা শ্রেণীর রক্ত চলিতেছে। জাতিভেদ প্রথা এরূপ প্রবল থাকায় সকল শ্রেণী মিশিয়া আমরা এক Nationএ পরিগণিত হইতে পারিতেছি না। এখন আমাদের সভাসমিতি হইতেছে। শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে, রেল, ষ্টীমার, ডাক, telegram প্রভৃতির সুবিধা হওয়াতে আমরা এখন কতক পরিমাণে দেশের Common interest বিষয়গুলি আলোচনা করিবার সুবিধা পাইতেছি। কিছুদিন পূর্ব্বে ইহার কিছুই ছিল না। তখন ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও কথা জানিতেন না, কায়স্থেরা স্বজাতির কথা ভিন্ন অন্য কিছুই জানিতেন না। আমাদের সব interest was confined to one caste, এইজন্য জাতিভেদের আর একটী বিষময় ফল ফলিয়াছে। আমাদের দেশের অধোগতির ইহা একটী প্রধান কারণ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মনে করিতেন, রাজ কার্য্য ও দেশ রক্ষা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য। সেই ক্ষত্রিয় জাতির অর্থাৎ রাজাদের যখন অধোগতি হইল, তখন অন্যকোন জাতি ক্ষত্রিয়ের কার্য্য নিজেদের কার্য্য মনে করেন নাই। তাঁহাদের নিজেদের জাতিগত ব্যবসা

লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। এক রাজা গিয়া অন্য রাজা আসিলেন—সমাজের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সব জাতিতেই রাজাকে কর দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়া, যে রাজা হইলেন—তাঁহাকেই কর দিতে লাগিলেন। রাজা আর্য্য হউন বা অনার্য্য হউন, হিন্দু হউন বা মুসলমান হইন, বা খ্রীষ্টান হউন, সমাজের তাহাতে কিছু আসিয়া গেল না। আমরাত nation নহি, আমরা এক একটা জাতির (caste) অন্তর্গত। আমাদের জাতীয় ব্যবসা আছে। তাহার কোন বিঘ্ন হইলেই হইল। আমাদের National interest কিছুই ছিল না। সমস্ত জাতির জন্য সে জন্য ভাবনাও ছিল না। শিবজী এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন—এইজন্য তিনি হিন্দুসমাজের আর কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া এই মহামন্ত্র প্রচার করিলেন যে, "ব্রাহ্মণ হউন, ক্ষত্রিয় হউন, বৈশ্য হউন, শূদ্র হউন, সকলেই মাতৃভূমির নিকট ঋণী। দেশের জন্য খাটা, দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া সকলের common interest." এই ভাবটী মহারাষ্ট্রা জাতিকে ভাল করিয়া ধরিল। একটী মহারাষ্ট্রা nationality গঠনের আরম্ভ হইল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সেই পুরাতন জাতিভেদ তাঁহার মৃত্যুর পর প্রবল হইয়া আবার ঐ nationality গঠনের পথে দাঁড়াইল। পাঞ্জাবেও এইরূপ একবার ঘটিয়াছিল। Sir Ibbetson তাঁহার Census Report of the Punjab, 1881, পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, শিকদের দশম গুরু Guru Gobinda "at first lived in retirement, then preached *khalsa,* "the pure the elect, the liberated" openly attacked all distinctions of caste, instituted a ceremony of initiation, he proclaimed it as a *pakul* or gate by which all might enter the society, he gave *parshad*, or communion (four castes should eat out of one dish) he taught the Brahman's thread must be broken. These he inspired with military ardour, with the hope of social freedom, and of national independence and with the abhorrence of the hated Mahomedan.

"Thus for the second time in history, a religion became a political power and for the first time in India a nation arose embracing all races and all classes and grades of society, and banded together in the face of a foreign foe. The Mahar-

attas and the Sikhs would appear to afford the only two intances of really national movements in India. কি কি কারণে শিখদের অবনতি হইল,তাহা আলোচনা করার স্থান এখন নয় বলিয়া আর ইহার উল্লেখ করিলাম না। জাতিভেদের কথা আলোচনা করিয়া আমরা ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের এই প্রথার পরিবর্ত্তন না হইলে আমরা একটা Nation হইতে পারিব না। আমাদের ভাষা এক হইলে আমাদের nationalityর ভাব বদ্ধমূল হওয়া একটী প্রধান সহায় বটে, কিন্তু জাতিভেদ না গেলে এক হওয়ার আশা কম। মনে করুন, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক সভায় বসিয়া বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সহিত দেশের কোন হিতকর কাজ করা স্থির করিলেন। কিন্তু সভা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া যখন বাড়ীতে পৌঁছিলেন, তখন তিনি "ব্রাহ্মণ" আহার ব্যববার, পুত্রকন্যার বিবাহ প্রভৃতি যে সব কার্য্য তাঁহার সম্পূর্ণ আপনার, আর তাহার সহিত ভূপেন্দ্র বাবুর সহিত কোন সম্পর্ক নাই। বাহিরের কাজে সম্পর্ক আছে বটে কিন্তু যাহাতে পরস্পরকে আত্মীয় করে, তাহাতে কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই। এইজন্য ১৮৮৯সালে Sir Comer Petheram, late Chief Justice of Bengal বলিয়াছেন যে—

"Above all, it should be borne in mind by those who aspire to lead the people of this country into the untried regions of political life, that all the recognized nations of the world have been produced by the freest possible intermingling and fusing of the different race stocks inhabiting a common territory. The horde, the tribe, the caste, the clan, all the smaller separate and often warring groups characteristic of the earlier stages of civilisation must,it would seem,be welded together by a process of unrestricted crossing before a nation can be produced. Can we suppose that Germany would ever have arrivied at her present greatness or have come to be a nation at all, if the numerous tribes mentioned by Tacitus, or the three hundred petty kingdoms of the last century, had been stereotyped and their social fusion rendered

impossible by a system forbidding intermarriage between the members of different tribes or the inhabitants of different jurisdictions. If the tribe in Germany had, as in India, developed into the caste, would German unity ever had been heard of? Everywhere in history we see the same contest going forward between the earlier, the more barbarous instinct of separation, and the modern civilizing tendency towards unity, but we can point in no intance where the former principle, the principls of disunion and isolation has succeeded in producing anything resembling a nation. History, it may be added, abounds in surprises, but I do not believe that what has happened nowhere else is likely to happen in India in the present generation. ঠিক এই প্রকার মত Risley সাহেবও তাঁহার পুস্তকে (The people of India) লিখিয়াছেন—"So long as the regime of caste persists, it is difficult to see how the sentiment of unity and solidarity can penetrate and inspire all classes of the community, from the highest to the lowest, in the manner that it has done in Japan, where if true caste ever existed, restrictions on intermarriage have long ago disppeared.

আমরা বাঙ্গালা দেশের Ethnology আলোচনা করিতে গিয়া দেখিতে পাইলাম যে, আমাদের nation হইবার পক্ষে জাতিভেদ একটী প্রধান বিঘ্ন। সামাজিক আচার ব্যবহার (social custom) এখন পর্য্যন্ত এক হইবার পক্ষে আমাদের সহায় হয় নাই। Railway, Steamer প্রভৃতির সাহায্যে বাঙ্গালা দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত যাওয়া আসা সহজ হওয়ায়, আমরা এখন নানা কার্য্যে বাঙ্গালা দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইতেছি ও নানা স্থানের লোকের সহিত মিশিতেছি, তাহাতে আমাদের আচার ব্যবহার অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তন আমাদের জাতীয় গঠন কার্য্যে সুবিধা করিয়া দিতেছে। কিন্তু উচ্চশ্রেণী হিন্দু ও নিম্নশ্রেণী হিন্দু এবং এদেশবাসী মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক আচার ব্যবহার এত বিভিন্ন রহিয়াছে

যে, তাহাতে আমরা একবারও মনে করিতে পারি না যে, আমরা শীঘ্র সকলে একভাবাপন্ন হইব। তবে এখন যতই বাঙ্গালা দেশের নানা প্রকারের আচার ব্যবহার এক হইয়া যাইবে, ততই আমাদের গড়িবার পক্ষে তাহা সাহায্য করিবে।

এখন ইতিহাসের কথা উঠিতেছে। আমাদের ইতিহাসও আমাদের সহায় না হইয়া বরং আমাদের এক হইবার পথের বিঘ্ন হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস যাহা কিছু আছে, তাহা কেবল হিন্দু মুসলমানের সংগ্রাম ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাহা দ্বারা এদেশে হিন্দু মুসলমান এক হইবার পক্ষে কোন সাহায্য হইবে না। আমাদের কোন কোন বন্ধু "প্রতাপ আদিত্য" উৎসব প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া দেশের অকল্যাণ ভিন্ন কোন উপকার করেন, আমার বিশ্বাস নয়। ইহার বিশেষ আলোচনা করা অনাবশ্যক।

শেষ আর কথার আলোচনা করিয়া আমার এই প্রবন্ধ শেষ করিব। তাহা এই—দেশে এক ধর্ম্ম থাকিলে nation গড়ার পক্ষে তাহা খুব সাহায্যকারী হয়। আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা এইরূপ দেখা যায়। হিন্দু পশ্চিম বাঙ্গালায় ৩৯২ লক্ষ, পূর্ব্ববাঙ্গালায় ১১৩ লক্ষ, মোট হিন্দু ৫ কোটী ৫ লক্ষ। মুসলমান পশ্চিম বাঙ্গালায় ৯০ লক্ষ, পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় ১৭৮ লক্ষ, মোট ২ কোটী ৬৮ লক্ষ। খ্রীষ্টান প্রায় আড়াই লক্ষ, বৌদ্ধ প্রায় পৌনে দুই লক্ষ। খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধদের কথা ছাড়িয়া দিলে হিন্দু ও মুসলমানদের কথা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, তিন ভাগের ১ ভাগ মুসলমান ও ২ ভাগ হিন্দু। এই দুইটী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের আদর্শ একেবারে এমন স্বতন্ত্র যে, কখনও যে ইহারা এক হইতে পারিবে, তাহা সহজে কল্পনাও করা যায় না। অথচ এই দুই ধর্ম্মাবলম্বী লোক এক বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতেছেন—ইহাদের উৎপত্তি প্রায় এক। ইহারা জাতীয় উন্নতির পথে কিন্তু একমত হইতে পারিতেছেন না। সব হিন্দু যে মুসলমান হইয়া যাইয়া এক জাতিতে পরিগণিত হইবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। পৃথিবীর অন্য অন্য স্থানে দেখা গিয়াছে যে, যেখানে মুসলমান রাজা হইয়াছেন, সেখানে দেশের সাধারণ লোক ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই ভারতবর্ষে কেবল তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল দুইটী স্থানে মুসলমান ধর্ম্মের প্রাধান্য দেখা যায়। প্রথম মালবর উপকূলে, দ্বিতীয় পূর্ব্ববাঙ্গালায়। মালবর উপকূলে আরবেরা ব্যবসা করিতে আসিয়া বসতি করিয়া সেখানে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। পূর্ব্ব-

বাঙ্গালায় কেন মুসলমান ধর্ম্ম এত প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন কারণ দর্শিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করেন যে, ঐ প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সেন রাজাদের সময় হইতে আবার যখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হইল, তখন তাহাদের সমাজে অতি নিম্ন স্থান দেওয়া হইল। এই সময়ে মুসলমান রাজাদের প্রতাপ সংস্থাপিত হওয়ায় তাহারা উচ্চশ্রেণী হিন্দুদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের Bengal Census Report এ Beverley সাহেব লেখেন যে, পূর্ব্ব বাঙ্গালার অনার্য্য জাতির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। হিন্দুরা ইহাদের কোন দিন মাথা তুলিতে দেন নাই। এখনও যাহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, তাহারা অস্পৃশ্য নমঃশূদ্র বা চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণিত হইতেছে। কাজেই যখন পূর্ব্ব বাঙ্গালায় মুসলমান রাজার প্রতাপ বাড়িল, তখনই ইহারা দলে দলে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এখনও সেইরূপ মান্দ্রাজপ্রদেশে ব্রাহ্মণদের কঠোর শাসনে নিম্নশ্রেণীর Pariah জাতির লোকেরা হাজারে হাজারে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। Lyall সাহেব তাঁহার Asiatic Studies নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, পাঠান ও মোগলেরা এদেশ জয় করিয়া বসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা নিজেরাই তেমন বিশ্বাসী মুসলমান ছিল না; কাজেই সেই ধর্ম্ম প্রচারে তাহাদের তেমন উৎসাহ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ তাহারা এদেশে আসিয়া দেশ জয় করিয়া কেবল নিজেদের সুখ সুবিধার কথা ভাবিয়াছিলেন, দেশ শাসনের ভার এদেশের লোকের উপর দিয়া নিজেরা কেবল আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়াছিলেন। দেশের অবস্থার কথা আলোচনা করার তাঁহাদের সময়ও ছিল না। কাজেই তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। কেবল পূর্ব্ব বাঙ্গালার নবাবেরা সাহা জালাল (Shah Jalal) বাবা আদম (Baba Adam) প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রচারকের ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে দেখা যায়। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু এখন আর মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা নাই। আর যে সমস্ত দেশ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, তাহার আশা নাই। খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাস করেন যে, একদিন সমস্ত পৃথিবী খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। ইহা একটা ধর্ম্মবিশ্বাস মাত্র, কাজের কথা নয়। বৌদ্ধ ধর্ম্ম একদিন এদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার লোপ যে কারণে হইয়াছে, তাহার আলোচনা না করিয়া ইহা আমরা বলিতে পারি যে, বৌদ্ধ

ধর্ম্ম পুনরায় দেশকে গ্রাস করিতে পারিতেছে না। Lyall সাহেব তাঁহার Asiatic Studies নামক পুস্তকে খ্রীষ্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম সমস্ত ভারতবর্ষের একমাত্র ধর্ম্ম হইতে পারে কিনা আলোচনা করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই :—

Seventeen centuries ago the outcome and conclusion of all these things in Europe and Asia Minor was Christianity, which absorved all the nations of the Empire as they insensibly melted away into the Roman name and people ... ... But history does not repeat itself on so vast a scale, the seasons and the intellectual condition of the modern world are unfavourable to religious flood tides, it is incredible that Islam or Buddhism should ever again invade or occupy a great and highly civilized country and the mind of Europe is turning to other things more exciting in these days than religious proselytism. It may be even doubted whether Brahmanism has to fear destruction at the hands of the three great missionary religions, though it is quite possible that more difficult and dangerous experience than wholsale religious conversion are before India."

আমরা যদি কোন এক ধর্ম্মাবলম্বী না হইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের এক nation হইবার পক্ষে একটা প্রধান অন্তরায় উপস্থিত দেখিতেছি। এই দেশে এত প্রকার ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক থাকায় আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাব কত বেশী, তাহা ভাল করিয়া আমরা প্রতিদিন অনুভব করিতেছি। দেশের সকলে এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলে nationality গঠনের সাহায্য হয়, ইহা ঠিক ; তবে ধর্ম্মমত বিভিন্ন হইলেও যে এক nation হওয়া যায়, এইরূপ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় কিছু কিছু দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ যে সহজে ঘটিবে, তাহার আশা কম। Sir Henry Cotton তাঁহার New India পুস্তকে লিখিয়াছেন যে"It is impossible to be blind to the general character of the relations between Hindus and Muhammadans, to the jealousy which

exists and manifests itself so frequently, even under British Rule, in local outbursts of popular fanaticism ; to the kine-killing riots and to the religious friction which occasionally accompanies the celebration of the Ram Lila or the Bakr-Id or the Muharram." Sir Theodore Morison, যিনি অনেক দিন আলি-কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি শিক্ষিত মুসলমানদের সহিত ভাল করিয়া মিশিয়াছেন। তিনিও লিখিতেছেন যে, "The possibility of fusion with the Hindus and the nation by this fusion of an Indian nationality, does not comment itself to Mahammadan sentiment. The idea has been brought forward only to be flouted ; the pride of Mahammadans revolts at such a scarfice of their individuality " একথা অতি ঠিক যে, যতদিন হিন্দু মুসলমানকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন—তাঁহার আচার ব্যবহারের স্বতন্ত্রতা দেখিয়া তাঁহাকে বিদেশীয় ও নিকৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী মনে করিবেন, এবং অপর দিকে মুসলমানও হিন্দুকে কাফের মনে করিয়া তাহাকে ঘৃণা করিবেন, হিন্দু দেবদেবীর উপাসক বলিয়া তাঁহার প্রতিমা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিবেন, যতদিন হিন্দু মুসলমানের গোবধে আপত্তি করিবে —অপরদিকে মুসলমানও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর শুকর বধে আপত্তি করিবেন, ততদিন—Passions of religious animosity will overpower the weaker sentiment of common nationality.

তবে কি আমাদের Nationality গঠনের কোন আশা নাই ? একথা আমি বলিতেছি না, হিন্দুদের অনেক পরিবর্ত্তিত হইতে হইবে, নতুবা তাঁহারা মুসলমানদের সহিত মিলিত হইতে পারিবেন না। শিক্ষার প্রভাবে মুসলমানেরা যে পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত মিলিতে পারেন, তাহা আমরা New Turkeyইর অবস্থা দেখিয়া জানিতে পারিয়াছি। আমাদের দেশে শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু ও মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে,ইহা ঠিক এবং এই উভয় দলেরই এক হইবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেছে, কিন্তু এই পরিবর্ত্তন এত অল্প ও এত ধীরে ধীরে তাহা উভয় সমাজে কার্য্য করিতেছে যে, তাহাতে বুঝিতে পারি না যে, কত দিনে দুই দল এক হইয়া এক Nationএ পরিণত হইবে।

এক দিকে না মিশিলে আমরা Nation গড়িতে পারিব না—তাহা বুঝি-

তেছি, অপর দিকে ইহাও বুঝি যে, সহস্র সহস্র বৎসরের সামাজিক ও ধর্ম্মের অবস্থার পরিবর্ত্তনও বড় সহজ নয়। শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশের হিন্দু সমাজের যে অবস্থা হইয়াছে,তাহাতে আমরা বুঝিতেছি, আমাদের যাহা করিলে ভাল হয়, তাহাও আমরা স্থির করিতে পারিতেছি না।

একটা ভয়ানক অশান্তি মধ্যে আমরা পড়িয়াছি—এই অবস্থার মতন কথা Tocqueville তাঁহার Democracy in America নামক পুস্তকে অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—"But epohs sometimes occur, in the course of the existence of a nation, at which the ancient customs of a people are changed, religious relief disturbed, and the spell of tradition broken, while the diffusion of knowledge is yet imperfect and the civil rights of the community are ill secured or confined within very narrow limits· The country then assumes a dim and dubious shape in the eyes of the citizens ; they no longer behold it in the soil which they inhabit, for that soil is to them a dull inanimate clod, nor in the usages of their forefathers,which they have been taught to took upon as a debasing yoke, nor in religions for of that they doubt ; nor in the laws which do not originate in their own authority· They intricate themselves within the dull precincts of a narrow egotism. They are emancipated from prejudice, without having acknowledged the empire of reason,they are animated neither by instinctive patriotism nor by thinking patiotism but they have stopped half way between the two in the midst of confusion and distress."

ইংরাজী শিক্ষার অভাবে ও ধর্ম্ম বিশ্বাস খুব কঠোর বলিয়া মুসলমানদের অবস্থা স্বতন্ত্র—তাঁহারা এইরূপ অশান্তির মধ্যে বাস করিতেছেন না।

জাতিভেদ, ধর্ম্মের পার্থক্য ও বিভিন্ন প্রকারের আচার ব্যবহার যে আমাদের nationality গঠনের অন্তরায়,তাহা আমরা বুঝিয়াছি, বিভিন্ন অবস্থার লোকের সহিত যত আমরা পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ত্যাগ করিয়া মিশিব, আমাদের আচার ব্যবহার ততই এক প্রকার হইয়া যাইবে, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা যতই পরস্প-

রের ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান ও উদারতা দেখাইবেন,ততই আমরা ধর্ম্ম বিশ্বাসের পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের common interest সম্বন্ধে সকলে এক মত হইতে পারিব ও জাতীয় জীবন গঠনে কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না। কিন্তু যতদিন বংশগত জাতিভেদ এদেশ হইতে লোপ না পাইবে, ততদিন আমরা একটা nationই হইতে পারিব না। ততদিন এদেশের উন্নতির পথ ভাল করিয়া খুলিবে না। এদেশের Ethnology পাঠ করিতে করিতে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। আমার ধারণা আপনাদের নিকট সংক্ষেপে উপস্থিত করিলাম। আমরা সকলে এই সভায় বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য সম্মিলিত হইয়াছি—এই ভাষা আমাদের Idea of Nationality গঠনে যে সাহায্য করে, তাহাও আমরা বুঝিতেছি। কিন্তু তাহার ভিতরও যে গুরুতর অন্তরায় উপস্থিত, আমি তাহার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমার বিশ্বাস মত আমি এই বিষয়টী আপনাদের বিচারার্থ উপস্থিত করিলাম। আপনারা যে আমার মতে মত দিবেন, তাহা আমি আশা করি না। তবে যদি আমার মত ঠিক কি না, তাহা অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইল, মনে করিব। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, অন্তরায়গুলির কথা উল্লেখ করা হইল, কি উপায়ে সেগুলি দূরীভূত হয়, তাহারও উল্লেখ করা উচিত ছিল। আমরে মনে হয়, এই সভার সে উদ্দেশ্য নয়, এবং আমার এমন শক্তি নাই যে, সে বিষয়ের আলোচনা করি।

শ্রীশশিভূষণ বসু।

উদ্ভিদের আহার।

প্রয়োজনীয় চলিত কথাগুলার মাঝে মাঝে পুনরুক্তি প্রার্থনীয়। উদ্ভিজ্জ-জীবনের কথার চেয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় কথা খুব কমই থাকিতে পারে। কারণ আমরা, বাঙ্গালীরা যে, যে অবস্থারই লোক হউক না কেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিজীবী লোক। কৃষি ব্যতীত বাঙ্গালীর অর্থাগমের আর কোনও উপায় নাই বলিলেও হয়। অতএব কৃষিকার্য্য-সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

জ্ঞান সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইলে উপকার। কৃষিবিদ্যা শিখিয়া যাহাকে ডেপুটী-মাজিষ্টরী করিতে হয়—বা উদ্ভিদ-বিদ্যায় এম-এ পাশ করিয়া যাহাকে কেরাণীগিরি করিতে হয়, তাহাদের একগাড়ী জ্ঞানের বোঝাতেও দেশের যে কল্যাণ না হইবে, যাহাকে নিজে দশ বিঘা জমির চাষের তত্ত্বাবধান করিতে হয়, কিম্বা যাহার পরীক্ষা করিবার উপযোগী সময় ও অর্থ এবং বাগান বা চাষের জমি আছে—তাহাদের অল্পজ্ঞানও পরীক্ষাসিদ্ধ হইয়া দেশের বহুবিধ উপকার-সাধনে সমর্থ হইবে।

আমাদের দেশে জমির উর্ব্বরতা শক্তি কমিয়া যাইতেছে, বৃদ্ধলোকদিগের নিকট শুনা যায়—যে আগে যেমন জমির ফলন ছিল, এখন আর সেরূপ ফলন নাই। আগেকার আম, ধান, বা অন্যান্য শস্য যেরূপ বড় হইত, এখন আর সেরূপ বড় হয় না, এখনকার আমগাছ আর আগের গাছের মত বেশী ফল দেয় না। এরকম বিলাপ বোধ হয় সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। ভূমির এই অনুর্ব্বরতার কারণ কি? কারণ এই যে, এদেশের মানুষগুলার ন্যায় এদেশের উদ্ভিদ্‌গুলারও আহারের কষ্ট হইয়াছে।

আমাদের দেশে দিন দিন ভূমির এরূপ অবনতি হইলেও অন্যান্য সভ্যদেশের ভূমির কিন্তু অবনতি হয় নাই—বরং অনেক স্থলে তাহাদের উর্ব্বরতা বৃদ্ধিই পাইয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা আদি সকল স্থানের জমিই এখানকার জমি হইতে অধিকতর উর্ব্বরা। আমাদের একজন ইউরোপীয় অধ্যাপক বলিয়াছিলেন যে, এদেশের জমির চেয়ে বিলাতের জমিতে অনেক বেশী ফসল পাওয়া যায়।

প্রাণিদিগের জীবনধারণের জন্য যেমন বায়ু, জল ও আহারের প্রয়োজন—উদ্ভিদদিগেরও জীবনধারণের জন্য তেমনই বায়ু, জল ও আহার্য্যের প্রয়োজন। জীবগণ নিশ্বাসের দ্বারা বায়ুমণ্ডলস্থ অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করে ও প্রশ্বাসের দ্বারা কার্ব্বন-ডাই-অকসাইড গ্যাসকে শরীর হইতে বিদূরিত করিয়া দেয়। উদ্ভিদগণও প্রাণিদিগের ন্যায় বায়ুমণ্ডল হইতে অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করে ও উহাতে কার্ব্বন-ডাই-অকসাইড গ্যাস পরিত্যাগ করে। যে পদার্থ প্রাণের বাস্তব আধার—যাহা উদ্ভিদ ও জীব উভয় দেহেই স্থূলতঃ একবিধ পদার্থ; তাহা অক্সিজেনের অভাবে জীবনধারণ করিতে সমর্থ নহে। এই পরম পদার্থের মধ্যে প্রতিনিয়ত যে সকল রাসায়নিক ক্রিয়া, ইহার অন্তর্ভুক্ত কণা সমূহের যে বিবিধ ঘূর্ণন ক্রিয়া সংঘটিত হইতেছে, যে সমুদায় বিচিত্র ক্রিয়ার ফলকেই আমরা "জীবনীক্রিয়া" বলিয়া অভিহিত করি; সেই সমস্ত ক্রিয়াই অক্সিজনের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় এবং অক্সিজেনের অভাবেই বিলুপ্ত হইয়া যায়; কাজেই প্রাণও তাহার বাস্তব নিবাস পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে।

জীবের ন্যায় উদ্ভিজ্জ-জীবনের পক্ষে পরম প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় পদার্থটী জল। যে পদার্থ প্রাণের বাস্তব আধার, সেই "প্রোটোপ্লাসম" জলের দ্বারা ওতপ্রোত-ভাবে পূর্ণ; জলের অভাবে জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব। উদ্ভিদের পক্ষে জলের প্রয়োজন আরও অধিক। উদ্ভিদের "প্রেটোপ্লাসম" জল হইতেই নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে—জল হইতেই ইহা তাহার অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং জলেতেই ইহা নিজ দেহোৎপন্ন মলস্বরূপ কাজেই বিষবৎ পরিত্যজ্য কার্ব্বন-ডাই-অকসাইড গ্যাস পরিত্যাগ করিয়া নিজ দেহের গ্লানি বিদূরিত করে।

জীবের ন্যায় উদ্ভিদেরও জীবনধারণার্থ তৃতীয় প্রয়োজনীয় পদার্থ আহার্য্য-দ্রব্য। জীব ও উদ্ভিজ্জদেহ যে বিবিধ জীবনী ক্রিয়ার ফলে নিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, আহার্য্য সামগ্রীর দ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ হইলেই—তবে জীবনীক্রিয়ার স্থায়িত্ব সম্পাদন হইতে পারে।

সর্ব্ববিধ সজীব পদার্থের খাদ্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—(১ম) প্রটীড—ডিম্বের শ্বেতাংশ সদৃশ পদার্থ (২) Carbohydrate শ্বেতসার বা চিনিসদৃশ পদার্থ (৩) তৈলময় পদার্থ। প্রথম শ্রেণীর পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় কারণ "প্রোটোপ্লাসম" বা প্রাণ-পদার্থ প্রধানতঃ উহা দ্বারাই সংগঠিত হয়। অন্য দুই শ্রেণীর পদার্থও প্রয়োজনীয়; কারণ উহাদের অভাবেও অধিক দিন জীবনধারণ করা অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত খাদ্যসমূহ যে সকল মৌলিক পদার্থের সমবায়ে প্রস্তুত,

সে সকল মূল পদার্থ জগতে প্রচুর পরিমাণে আছে; কিন্তু এমন ভাবে আছে যে, তদ্দ্বারা জীবের আহার্য্যের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে কোনও সুবিধা হয় না। কার্ব্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফস্‌ফরাস্, এই কয় পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে প্রটীড প্রস্তুত হয়। কার্ব্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগে শ্বেতসার সদৃশ পদার্থ ও তৈলময় পদার্থ প্রস্তুত হয়। বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্ব্বন আছে। জলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আছে, মাটি ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যে সালফার ফস্‌ফরাস্ আদি অপর মূল পদার্থসকল প্রচুর পরিমাণে আছে; কিন্তু এ সকলের প্রাচুর্য্য সত্বেও পৃথিবীতে এতলোক অনাহারে মরে কেন, আহারের নিমিত্ত জীবে জীবে ঘোর জীবনসংগ্রাম চলিয়াছে কেন? তাহার কারণ এই যে, জীব ঐ সকল পদার্থ নিজে ব্যবহার করিতে সমর্থ নহে। রাসায়নিক পণ্ডিতগণের সর্ব্বোচ্চ আশা এই যে, তাঁহারা কালে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বায়ু, জল ও মৃত্তিকার মূল পদার্থগুলিকে পরস্পরের সহিত রাসায়নিক সংমিশ্রণে মিশাইয়া বিবিধ খাদ্য প্রস্তুত পূর্ব্বক পৃথিবীর লোকের বুভুক্ষা নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেন, জগতে বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপত করিবেন। যাহা হউক, যতদিন না তাঁহারা এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেছেন, ততদিন যে আমাদিগকে বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট উপায়ের দ্বারাই জীবিকার্জ্জন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, অর্থাৎ ততদিন উদ্ভিদসমূহকে জীবের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিতে হইবে। দুর্ব্বল উদ্ভিদ্ নিজের বা নিজের সন্ততিবর্গের নিমিত্ত যে খাদ্যসম্ভার সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা প্রবল জীবের ভোগে আসিবে; পরে সেও আবার তাহার নিজের পালার সময় কোনও প্রবলতর জীবের আহার্য্যে পরিণত হইয়া জগতে জীবনসংগ্রামের ভীষণতার সাক্ষ্য দিবে। উদ্ভিদ কি প্রকারে সরল অজৈব (Simple Inorganic Compounds) পদার্থের সংমিশ্রণে খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহা উদ্ভিদ-বিদ্যা-সংক্রান্ত অতি ক্ষুদ্র পুস্তকও যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন। সবুজ উদ্ভিদসকল, নিজেদের সবুজ রং ও সূর্য্যরশ্মির সহায়তায় প্রথমতঃ বায়ুমণ্ডলস্থ কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলের রাসায়নিক সংমিশ্রণ করিয়া চিনি প্রস্তুত করে। চিনি হইতে শ্বেতসার ও তৎসদৃশ অন্য পদার্থ সহজেই প্রস্তুত হয়। এইরূপ সমস্ত দিন ধরিয়া উদ্ভিদের সবুজ পত্রাবলী সূর্য্যকিরণ-সাহায্যে চিনি প্রস্তুত করিতে থাকে। উক্ত চিনির কিয়দংশ শ্বেতসারে পরিণত হয়। উদ্ভিজ-জীবনের বাস্তব আধার পদার্থ প্রোটোপ্লাসম

কিয়দংশ চিনির সহিত মৃত্তিকা হইতে প্রাপ্ত সোরা, সালফেট, ফসফেট আদি পদার্থ মিশাইয়া প্রটীড প্রস্তুত করিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আমরা জমি হইতে যে ফসল লই তাহার কিয়দংশ বায়ু হইতে, কিয়দংশ জল হইতে, এবং অপর কিছু অংশ জমির দেহ হইতে সংগৃহীত হয়। উদ্ভিদের খাদ্য-মীমাংসার মধ্যে বাতাসের কথা আমাদের ধরিবার প্রয়োজন নাই—কারণ এই মহোপকারী পদার্থ জগতে এত প্রচুর মাত্রায় আছে যে, আমরা ইহার অসংখ্যবিধ ব্যবহারের কথা ভাবিবারই অবকাশ পাই না। বাতাস বাদ দিলে, আমাদের আর দুইটী বিষয় ভাবিবার থাকে। একটী জমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা, আর অপরটী জমির যে অংশ প্রতিবর্ষ বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহার ক্ষতি-পূরণ করা। পদার্থ কেহ গড়িতেও পারে না, কেহ নষ্ট করিতেও পারে না। অতএব জমির যে ক্ষতি হইতেছে, কোনও রূপে তাহার পূরণ হওয়া আবশ্যক, নচেৎ উহা অনুর্ব্বরা হইবে।

জমির এই ক্ষতিপূরণ দ্বিবিধ উপায়ে হইয়া থাকে। এক প্রকৃতির দ্বারা, অপর মানুষের দ্বারা। প্রকৃতির দ্বারা নিম্নলিখিত উপায়ে জমির ক্ষতিপূরণ হইয়া থাকে :—

(ক) বায়ুমণ্ডলে বজ্রাঘাত ও বিদ্যুৎপাত-সময়ে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন বায়ুদ্বয় মিলিত হইয়া নাইট্রিক অক্সাইডে পরিণত হয়। উহা বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হইয়া জমিতে নীত হয় ও তত্রত্য নাইট্রেটের অংশ বৃদ্ধি করে।

(খ) নিকটস্থ বা দূরস্থ জমির প্রয়োজনীয় লবণাক্ত অংশ বৃষ্টি বা বন্যার জলে দ্রবীভূত হইয়া আসিয়া অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর জমির উৎকর্ষসাধন করে। এই হিসাবে নাবাল জমির সুবিধাটাই অধিক। কারণ তাহাতে উচ্চতর জমী সকলের ধোয়ানীর জল আসিয়া উপনীত হয়। তবে বন্যা হইয়া যখন দেশ ভাসিয়া যায়, তখন উচ্চ জমিও নাবাল জমী হইতে সার-সংগ্রহে সমর্থ হয়।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জমির সারের স্বভাবতই কতকটা অপব্যবহার হইবেই ; কারণ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্থল সমুদ্র। জমী-ধোয়ানীর জল নদী প্রভৃতির দ্বারা সমুদ্রে আসিয়া উপনীত হইতেছে। সমুদ্রের লবণ পদার্থ বাড়িতেছে ; কিন্তু জমির প্রয়োজনীয় লবণ পদার্থ ক্রমশই কমিতেছে। সমুদ্রের জলে সাধারণ নুনের তুলনায় অন্য লবণ পদার্থের মাত্রা এত কম যে, সমুদ্র হইতে ঐ সকল পদার্থের পুনরুদ্ধারের আশা

অতীব ক্ষীণ। এস্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ লবণ উদ্ভিজ্জীবনের খুব কম ব্যবহারেই লাগে, শুধু তাহা নহে, অধিক লবণ উদ্ভিদের পক্ষে বিষবৎ অপকারী। লবণ ছাড়া নাইট্রেট, ফস্‌ফেট আদি যে সকল পদার্থ উদ্ভিজ্জ-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, সেই সকল পদার্থও যদি প্রচুর জলমিশ্র অবস্থায় উদ্ভিদের নিকট না প্রেরিত হয়, তবে উহারাও বিষবৎ অপকার করে। এইজন্যই অতিরিক্ত মাত্রায় সার দিবার ফলেও জমি মাঝে মাঝে খারাপ হইয়া যায়।

যে সকল ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় সার দেওয়া হইয়াছে অথবা যে জমিতে বেশী লবণ আছে, বৃষ্টির জল দিয়া ধৌত করিয়া সে জমির লবণের অংশ না কমাইতে পারিলে তাহাতে আর কোনও ফসল হইবে না। সুন্দরবনের লবণাক্ত জমি এইরূপে ধৌত করিয়া লবণহীন করা হয়, পরে উহা চাষের উপযোগী হয়। সেখানকার জমি ধৌত করিবার প্রণালী বেশ শিক্ষাপ্রদ। বন কাটিয়া জমি উদ্ধারের পর জমির চারিদিকে বাধ দেওয়া হয়—যাহাতে নদীর লোণা জল জমির মধ্যে আর প্রবেশ করিতে না পারে। বর্ষার সময় যখন ক্ষেত্র বৃষ্টির জলে পূর্ণ হয়, তখন একদিন ভাটার সময় বাধের কপাট খুলিয়া জমির জল নদীতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। জোয়ারের পূর্ব্বেই আবার বাধের কবাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ প্রত্যেক ধোয়ানিতে অনেকটা লবণ জমি হইতে বাহির হইয়া যায়। কয়েক বর্ষ এইরূপ ধোয়ার পর জমি লবণশূন্য হইয়া কৃষিকার্য্যের উপযোগী হয়।

(গ) স্বাভাবিক অবস্থায় জীব বা উদ্ভিদের দেহাবশেষ, বিষ্ঠামূত্রাদি জীবদেহ-নির্গত পদার্থ জমিতে পরিত্যক্ত, পচিত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া মাটীর সহিত মিশ্রিত হয়। অর্দ্ধ সভ্যাবস্থায় যখন লোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করিত ও নিজের জমি চসিত, তখন এই উপায় দ্বারা জমির যথেষ্ট লাভ হইত। তৎকালীন লোকের বিষ্ঠামূত্রাদি—এমন কি দেহাবশেষ পর্য্যন্ত ভূমিতেই নিক্ষিপ্ত হইত। ফলে ভূমি হইতে তখন যাহা কিছু আদায় করা যাইত, তাহার সমস্ত না হউক অধিকাংশ অংশ ভূমিতে প্রত্যর্পিত হইত। ভারতবর্ষের অনেক স্থানের জমি যে বহুসহস্র বর্ষ হইতে কৃষ্ট হইয়াও এখনো একেবারে অনুর্ব্বরা হইয়া পড়ে নাই—তাহার কারণ এই যে, তখন এত অধিকসংখ্যক নগর সৃষ্ট হয় নাই এবং খাদ্য দ্রব্যাদি একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইবার প্রথাও সুপ্রশস্ত হয় নাই। এক্ষণে নগরে বহুলোক বাস করে, যে জমি তাহাদের খাদ্য উৎপাদন

করে, তাহা হইতে বহুদূরে তাহাদের খাদ্যসামগ্রী নীত হয়। তাহাদের দেহাবশেষ, তাহাদের বিষ্ঠামূত্রাদি জমিতে আর প্রত্যর্পিত হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। ঐ সকল পদার্থ নিকটবর্ত্তী নদীতে প্রেরিত হয় এবং তথা হইতে উহা সমুদ্রে নীত হয়; এইরূপে সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত প্রতি বৎসর কোটী কোটী মুদ্রার সার জলসাৎ হইয়া যাইতেছে।

(ঘ) পূর্ব্বোক্ত উপায় সকল ব্যতীত আর এক উপায়ে জমির নাইট্রোজেনের অংশ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে এই বিষয়ে পণ্ডিতগণের সবিশেষ লক্ষ্য পড়িয়াছে। প্রাচীন পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে, শুধু রসায়নবিদ্যার চর্চ্চার দ্বারাই কৃষিকার্য্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্পূর্ণ হইবে; কিন্তু এক্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদগণের প্রকৃতি আলোচনায় আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, শুধু জমির রাসায়নিক অভাব পূরণ করিয়াই আমরা উহাকে উর্ব্বরা করিতে পারি না। জমিতে আমরা যে সকল দৃশ্যমান বড় বড় উদ্ভিদের চাস করিয়া থাকি, সেই সকল উদ্ভিদ ব্যতীত অনেক অতি ক্ষুদ্র দৃশ্য বা অদৃশ্য উদ্ভিদ আমাদের আমন্ত্রণের অপেক্ষা না রাখিয়াই জমি অধিকার করিয়া উহা পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিয়া থাকে। এই সকল অযাচিত অতিথির কেহ কেহ আমাদের পরম উপকারী, আবার কেহ কেহ আমাবের পরম শত্রু। আয়র্লণ্ড দেশে মাঝে মাঝে যে আলুর পীড়া (Potato disease) উপস্থিত হইয়া দুর্ভিক্ষ সমুপস্থিত করে, তাহা অনেকে সংবাদপত্রাদিতে পড়িয়া থাকিবেন। একবিধ ছাতা (Fungus) এই পীড়ার জন্মদাতা, এই ছাতা আলুগাছগুলিকে আক্রমণ করিয়া তাহার রসগ্রহণপূর্ব্বক নিজের দেহায়তন ও বংশ বৃদ্ধি করে। ইহাদের বীজসকল অতি সূক্ষ্ম, চর্ম্মচক্ষের অগোচর ও অত্যন্ত লঘু বলিয়া সহজেই স্থানান্তরিত হইতে পারে। যদি কৃষক দুর্ভাগ্যক্রমে সারের সহিত বা অন্য কোনও উপায়ে উক্ত ছাতার (Fungus) বীজ নিজের জমিতে লইয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহার আর ভদ্রস্থতা নাই। কয়েক বর্ষ ধরিয়া তাহাকে আলুর আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে; কিন্তু এই সকল উদ্ভীজপীড়া-উৎপাদনকারী "ছাতার" বিবরণ সংগ্রহে আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্থানাভাব। যে সকল ক্ষুদ্র উদ্ভিদ আমাদের ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সাধন পূর্ব্বক আমাদের অশেষ উপকার করিতেছে, আমরা এক্ষণে তাহাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

(১) জমিতে অতিক্ষুদ্র সবুজ শেওলা দেখা যায়। ইহারা অতি ক্ষুদ্র বলিয়া, তাহাদের সম্বন্ধে কিছু জানিবার ইচ্ছা আমাদের সহজে হয় না। আমরা

তাহাদের বিষয়ে কিছু জানিবার জন্য ব্যগ্র হই বা না হই, তাহারা যে বায়ু-মন্দলস্থ নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া নিজদের শরীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক পরোক্ষভাবে আমাদের উপকারসাধন করিতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নাইট্রোজেন উদ্ভিদ-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ। উদ্ভিদ্‌দেহ যে সকল পদার্থের সহযোগে গঠিত, তাহাদের মধ্যে কার্ব্বন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন সর্ব্বপ্রধান। এই সকল পদ্দার্থ উদ্ভিদ্‌-দেহে পর্য্যাপ্ত মাত্রায় পাওয়া যায়। এগুলি ব্যতীত আরও কতকগুলি মূলপদার্থ অল্পমাত্রায় উদ্ভিদ্‌-দেহে পাওয়া যায়। সেগুলির নাম যথা পোটাসিয়ম, গন্ধক, ফস্‌ফরাস, ক্যালসিয়ম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম। এ পদার্থগুলির প্রয়োজন সামান্য মাত্রায় হইলেও, ইহাদিগকে নগণ্য জ্ঞান করা যায় না; কারণ ঐ সকল পদার্থের অভাবেও কোন উদ্ভিদ বাঁচিতে পারে না। প্রথম শ্রেণীর মূল পদার্থগুলির মধ্যে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও কার্ব্বন, এই তিনটী মূল উদ্ভিদ, বায়ু ও জল হইতে গ্রহণ করে। নাইট্রোজেন নামক মূল পদার্থ বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও (কারণ বায়ুমণ্ডলের ৪ ভাগ নহৈট্রোজেন ও ১ ভাগ অক্সিজেন) বায়ুমণ্ডলস্থ এই বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন উদ্ভিদের কোন কাজে আসে না। যেমন অনন্ত জলময় সমুদ্রের মধ্যে অবস্থান করিয়া লোকে জলাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তদ্রূপ অনন্ত নাইট্রোজেনের সাগরের দ্বারা আবৃত হইয়াও উদ্ভিদ যদি নাইট্রোজেন-যুক্ত রাসায়নিক পদার্থ না পায়, তবে তাহাকেও প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ক্ষুদ্র শেওলা ও ক্ষুদ্রতর উদ্ভিজ্জানুগণ, যাহারা বায়ুমণ্ডলস্থ মৌলিক পদার্থ নাইট্রোজেনকে উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী রাসায়নিক পদার্থে পরিণত করিতেছে, তাহাদের কার্য্য উপেক্ষার যোগ্য নহে। বাক্টিরিয়া বা উদ্ভিজ্জাণুগণের মধ্যে কতকগুলি বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন আহরণ করিতেছে। আর অপর কতকগুলি ব্যাক্টিরিয়া, বিষ্ঠামূত্র এবং জীব ও উদ্ভিদের দেহাবশেষস্থ জটিল নাইট্রোজেনময় জৈব পদার্থকে ভাঙ্গিয়া বড় বড় উদ্ভিদের উপযোগী নাইট্রেটে পরিণত করিতেছে। বড় বড় উদ্ভিদ সকল রকম নাইট্রোজেন-যুক্ত রাসায়নিক পদার্থও ব্যবহার করিতে সমর্থ নহে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে জমিতে উক্তরূপ নাইট্রোজেন ব্যাক্টিরিয়ার অভাব আছে, তাহাতে প্রচুর সার দিয়াও বিশেষ কোন ফল লাভ হইবে না; কারণ সে সার বড় উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হইবে না।

পূর্ব্বোক্ত ব্যাক্টিরিয়াসমূহ ব্যতীত মটর জাতীয় বৃক্ষের মূলদেশ-নিবাসী এক-

জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া বায়ুমণ্ডলস্থ নাইট্রোজেনকে সাররূপে পরিণত করিবার পক্ষে একান্ত উপযোগী। জমিতে চিরকাল ধান-গোধূমাদি ফসল না দিয়া যদি উহাতে মাঝে মাঝে মটর, কলাই, মুগ, ছোলা বা ধঞ্চে জাতীয় ফসল দেওয়া হয়, তবে জমির উর্ব্বরতাশক্তি যে বর্দ্ধিত হয়, তাহা বহুকাল হইতেই জানা ছিল। বর্ত্তমান কালে উক্ত ঘটনার কারণ অবগত হওয়া গিয়াছে এবং পণ্ডিতগণের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হইয়া এসম্বন্ধে বহুল পরীক্ষা হইয়াছে ও হইতেছে। এই সকল পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে, মটরজাতীয় উদ্ভিদের মূলে মুসুরের মত এক প্রকার ছোট ছোট গুটী থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা উক্ত গুটী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উহাতে বহুতর ব্যাক্টিরিয়ার অস্তিত্ব দেখা যায়। এই সকল ব্যাক্টিরিয়াই জমির উর্ব্বরতাশক্তি-বৃদ্ধির কারণ। বালুকাময় ভূমিকে নাইট্রোজেনময় রাসায়নিক পদার্থ-শূন্য করিয়া তথায় মটরজাতীয় বৃক্ষের চাস করায় দেখা গিয়াছে যে, ভূমিতে নাইট্রোজেনের অভাব সত্ত্বেও মটর গাছের বৃদ্ধির কোনও ব্যত্যয় হয় নাই—মটর গাছ ও তদুৎপন্ন মটর-ফলে যেরূপ নাইট্রোজেনের অংশ পাওয়া উচিত, তাহা পাওয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, যে জমিতে উক্ত গাছের চাস করা গিয়াছিল ; যাহাতে চাসের পূর্ব্বে নাইট্রোজেন পদার্থের লেশমাত্রও ছিল না, তাহাতে এক্ষণে পর্য্যাপ্ত মাত্রায় নাইট্রোজেন পাওয়া হইবে ; কিন্তু পূর্ব্বের পরীক্ষা আরম্ভ করিবার আগে যদি জমিও মটরের গাত্র সংলগ্ন যাবতীয় ব্যাক্টিরিয়া ও তাহার বীজ ধ্বংস করিয়া লওয়া হয়, তবে জমিতে যে মটরের অঙ্কুর হইবে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত গুটী আদৌ থাকিবে না এবং সেই অঙ্কুরও নাইট্রোজেনের অভাবে অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইবে। তবে নাইট্রোজেনময় পদার্থ দিয়া উহাকে বর্দ্ধিত ও ফলবান করা যাইতে পারে। এই পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, গুটীমধ্যস্থিত ব্যাক্টিরিয়াই বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন আহরণের প্রধান কারণ।

প্রকৃতির অনুকরণ করিয়া মানুষও নিজেদের কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধান করিয়াছে ও করিতেছে। কৃষিকার্য্যের জন্য সর্ব্ব প্রথম প্রয়োজন—জল। দৈবমাতৃক দেশে বৃষ্টির জলেই কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহিত হয় ; কিন্তু বৃষ্টির জল মানুষের সুবিধা অসুবিধার কথা সব সময়ে ভাবিয়া চলে না। কাজেই যখন বৃষ্টি বেশী হয়, তখন বৃষ্টির জল সংগ্রহ করিয়া রাখা আবশ্যক ; যেন তাহা অসময়ে ব্যবহার করা যায়। এই অভাব পূরণ করিবার জন্য পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা ও ডোবার সৃষ্টি ; কিন্তু বৃষ্টি যখন বহুকাল না হয়, তখন উপায় ? দেশের নদীসমূহ যে প্রতিদিন

জীব ও উদ্ভিদের জীবনদায়িনী সুস্বাদু অনন্ত সলিলরাশি বহন করিয়া সাগরে ফেলিতেছে, এই জলরাশির অপচয় নিবারণ কি সম্ভবপর নহে? দরিদ্র, নিস্তেজ, উদ্যমহীন জাতি যখন শুষ্কক্ষেত্রের শুষ্ক শস্যের পানে চাহিয়া আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে থাকে; অর্থবান বলবান, উদ্যমী জাতি তখন নদীর জল খালে ফেলিয়া ও খালের জল ক্ষেত্রে ফেলিয়া শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রের পানে চাহিয়া যেন জগতকে মহিমাময় পুরুষকারের মাহাত্ম্য সন্দর্শনের জন্য আহ্বান করে। অনাবৃষ্টির সময় পশ্চিম ভারতের কৃষক সুগভীর কূপের জলে নিজেদের জমির তৃষ্ণা নিরারণ করিয়া থাকে; বাঙ্গালার ক্ষেত্রের পিপাসা কি বাঙ্গালার অগভীর আয়াসলব্ধ কূপের জলেও মিটিবে না?

বায়ুমণ্ডলে যে অনন্ত নাইট্রোজেনের ভাণ্ডার রহিয়াছে, সে নাইট্রোজেন কি নাইট্রেটে পরিণত হইয়া কৃষিকার্য্যের সহায়তা করিবে না? কৃষিবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এক্ষণে এই প্রশ্নের মীমাংসায় ব্যস্ত। শুনিয়াছি, আমেরিকার বিখ্যাত তড়িৎ-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত টেস্‌লা সাহেব এক তড়িৎযন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার সহায়তায় বাতাসের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক আলোকরেখা প্রেরণ করিয়া বায়ুমণ্ডলস্থ অম্লজান ও যবক্ষারজান বায়ুদ্বয়কে মিশ্রিত করিয়া নাইট্রিক অক্‌সাইড প্রস্তুত করা হয়। পরে তাহা হইতে নাইট্রিক অ্যাসিড ও নাইট্রেট প্রস্তুত হয়। এই যন্ত্র কতকালে যে এদেশের লোকের ব্যবহার আসিবে, তাহা বলা যায় না। কারণ তড়িৎ-প্রস্তুত-ক্রিয়া এখনও এখানে, সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

কিন্তু Leguminose Bactereaর সহায়তায় বায়ু হইাত নাইট্রোজেনময় পদার্থের আহরণ সহজেই হইতে পারে। এ বিষয়ে এদেশে সর্ব্বত্র প্রভূত পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। এই সকল পরীক্ষায় জমির অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আদৌ নাই। অনেক স্থলের কৃষকই অবগত আছে যে, ক্ষেত্রের ফসল মাঝে মাঝে বদলাইয়া দিলে ক্ষেত্রের উন্নতি হয়। পরিবর্ত্তন করিয়া যে ফসল দেওয়া হইবে, তাহা মটরজাতীয় হওয়া আবশ্যক। মঠরজাতীয় সারের জন্য চাস করিবার উপযুক্ত কতিপয় ফসলের নাম, যথা:—মটর, মসুর, কলাই, মুগ, খেসারী, অরহর, ছোলা, বর্ব্বটী, সীহ, শাঁক-আলু, বাবলা, অপরাজিতা, কালকাসিন্দা, আতসী, ধঞ্চে, জয়ন্তী ইত্যাদি। জমির উন্নতি শীঘ্র করিতে হইলে, ঐ সকল গাছ যখন বেশ সতেজ হইয়া বাড়িয়া উঠিবে, তখনই ফসলের অপেক্ষা না করিয়া তাহাদের কাটিয়া মাটীর সহিত মিশাইয়া দেওয়া উচিত। কোন কোন স্থলে দেখিয়াছি

যে, ধান কাটিয়া লইয়া যাইবার পূর্ব্বে জমিতে খেসারীর বীজ ছিটাইয়া দেওয়া হয়। ধান উঠিয়া যাইবার পর জমিতে এক দফা খেসারীর ফসল হইয়া যায়। এই প্রথা বিশেষ উপকারী বলিয়া বোধ হয়; খেসারীর গাছগুলিকে যদি জমির সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়, তবে আরও ভাল হয়। জমি খুব উর্ব্বর হয়, অথচ তাহাতে বিশেষ কিছু সার দিতে হয় না; এমন কতিপয় স্থানের জমিতে আমি অনেক বাব্‌লাগাছ দেখিয়াছি। বাব্‌লা মটরসুটী জাতীয় বৃক্ষ; আর বাব্‌লার আর একটা সুবিধা এই যে, ইহার চিকন পত্রাবলীর ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মি জমিতে অনায়াসেই প্রবেশ করিতে পারে। কাজেই বাব্‌লাগাছের আওতায় ফসলের কোন ক্ষতি হয় না, অথচ উহা দ্বারা সংগৃহীত নাইট্রোজেন-ময় পদার্থে শস্যের যথেষ্ট উপকার হয়।

দেশের যে সকল জমি অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বরা বলিয়া কৃষিকার্য্যার্থ এখনও ব্যবহার করা হয় নাই; সে সকল জমিকে কিপ্রকারে চাষের উপযোগী করা যাইতে পারে? জমি উচ্চ হইলে প্রথমেই তাহাকে কাটিয়া নীচু করিতে হইবে। নাবাল জমির বিবিধ সুবিধার কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। জমি কাটিয়া যে মাটি পাওয়া যাইবে; তদ্বারা বিবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধিত হইতে পারে। ইট প্রস্তুত হইতে পারে, গ্রামের রাস্তা প্রস্তুত হইতে পারে। ম্যালেরিয়ার জন্মভূমি—গ্রাম মধ্যস্থ ছোট খানা, ডোবা, গর্ত্ত আদি বুজান যাইতে পারে—অথবা বাসের জমিতে মাটী ফেলিয়া তাহা কতকটা উচ্চ করা যাইতে পারে। বাসের জমি যত উচ্চ হইবে, উহা ততই শুষ্ক হইবে ও বিবিধ রোগের মূলীভূত কারণস্বরূপ বিবিধ দূষিত ব্যাক্টিরিয়া-জননের অনুপযোগী হইবে; কারণ ব্যাক্টিরিয়া সেঁতসেঁতে স্থান ব্যতীত শুষ্কস্থানে বাস করিতে পারে না। আমরা জমিতে যে সব সার দিই, তাহাতে অনেক অসার পদার্থও থাকে; সেই সকল পদার্থ প্রতিবৎসর জমিতে পতিত হইয়া উহাকে ক্রমশঃ উচ্চ করিয়া ফেলিতেছে। এ বিপদ হইতে ক্ষেত্রকে রক্ষা করিতে হইলে, মাঝে মাঝে ক্ষেত্রের মাটী কাটিয়া স্থানান্তরিত করা আবশ্যক।

জমি নাবাল হইলেও, উহাতে পর্য্যাপ্তমাত্রায় সার না থাকাতে উহা শস্য-জননের অনুপযুক্ত হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় ক্ষেত্রের উপরের একস্তর মাটী বদলাইয়া, উহার স্থানে অন্যত্র হইতে আনীত একস্তর সারবান মাটী দেওয়া আবশ্যক। ডোবা, খাল, পুরাতন পুষ্করিণী, নদী, খাল বা বিলের তলদেশের মাটীতে সমস্ত দেশের সার গিয়া জমিয়া আছে এবং সর্ব্বত্রই এইরূপ

মাটীও যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই মাটী বদলাইবার কথায় কাহারও আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। ফরাসী দেশের কৃষকগণ কোনও জমি ছাড়িয়া যাইবার সময় উহার উপরের মাটী গাড়ি বোঝাই করিয়া লইয়া যায়; কারণ এই মাটী সে অনেক যত্নে ও পরিশ্রমে প্রস্তুত করিয়াছে, উহা সে পরের জন্য রাখিয়া যাইবে কেন। এদেশের লোকেও জানে যে, পুষ্করিণীর পাড়ের জমির খাজনা উচ্চহারে বিলি হয়। জমির উপরের ১ হাত বা ১॥ হাত যদি ভাল উর্ব্বরা মাটী থাকে, তবে তাহার নীচে কাঁকর বালি বা পাথর থাকুক না কেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

আর একটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। দুঃখিত রহিলাম, 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিতে পারিলাম না। অস্থি ও বিষ্ঠা,এই দুই বস্তু যে ভাল সারের মধ্যে গণ্য, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এই দুই সারের এক্ষণে বড়ই অপব্যবহার হইতেছে এবং কি প্রকারে এই অপচয় নিরাকৃত হইতে পারে; তদ্বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রার্থনীয়। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ভিক্টর হুগো তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসে যদি পারি নগরীর বিষ্ঠাসার সম্বন্ধে এক অধ্যায় স্থান দিতে পারেন, তবে আমার এই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেও এ বিষয়ের উল্লেখ মার্জ্জনীয় হইবে, বিবেচনা করি। পূর্ব্বপুরুষগণের আমলে যখন ড্রেন-পাইখানা, এমন কি, পাইখানারই প্রচলন ছিল না—বা খাদ্য-দ্রব্যাদি রপ্তানি হওয়ার প্রথা ছিল না, তখন এ সম্বন্ধে কোনও আলোচনার প্রয়োজন হয় নাই। এ প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, সার-সমস্যার দিক্ হইতে ধরিলে দেশ হইতে শস্যাদির রপ্তানি হওয়ার অপেক্ষা পাট তুলা প্রভৃতির রপ্তানি হওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয়; কারণ শস্যের সহিত দেশের জমির অনেক প্রয়োজনীয় সার বাহির হইয়া যায়; কিন্তু তুলা ও পাটে কার্ব্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, এই তিন মূল পদার্থ আছে। বলা বাহুল্য যে, এই কয়টী মূল পদার্থ বায়ু ও জল হইতে সংগৃহীত হয়। অস্থিসারের সম্বন্ধেও পূর্ব্বে কিছু আলোচনা করিবার প্রয়োজন ছিল না; কারণ হাড় ভাগাড়েই পড়িয়া থাকিত—সেখানে বায়ু, জল ও ব্যাক্টিরিয়ার শক্তিতে উহা ক্রমে ক্রমে পচিত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া ভাগাড়ের মাটীর সহিত মিশ্রিত হইত, পরে বন্যা ও বৃষ্টির সময়ে উহার জমিতে প্রত্যর্পিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত; কিন্তু এখন কয়েকবর্ষ হইতে দেখিতে পাই যে, ভাগাড়ের হাড় সংগৃহীত হইয়া স্তূপীকৃত হইতেছে এবং পরে উহা গাড়ি ও নৌকা বোঝাই হইয়া স্থানান্তরে রপ্তানি হইতেছে। ফসফরাস নামক

উদ্ভিদ-জীবনের পক্ষে পরম উপকারী পদার্থ-সংবলিত এই উৎকৃষ্ট সারের দেশ হইতে অকারণ নির্ব্বাসন (?) যে দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হাড়ের গুঁড়া জমিতে ছিটাইয়া দিলে, উহা তথায় পচিত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া জমির সহিত মিশ্রিত হয় এবং উহার উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। এই পচন-ক্রিয়াতে কিছু সময় লাগে বলিয়া ও হাড়ের গুঁড়া প্রস্তুত করা কষ্ট-সাধ্য বলিয়া যাঁহারা অস্থিকে শীঘ্র সাররূপে ব্যবহার করিতে চাহেন, তাঁহারা সালফিউরিক্ এসিডের সহায়তায় হাড়কে দ্রবীভূত করিয়া সুপার ফস্‌ফেট অফ লাইম-রূপে ব্যবহার করিতে পারেন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী ও অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয়দ্বয় 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কসে' সালফিউরিক এসিড প্রস্তুত-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া দেশবাসীর অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এক্ষণে আশা করি যে, তাঁহারা উক্ত এসিড আরও সুলভ ও সর্ব্বত্র সুপ্রাপ্য করিয়া বাঙ্গালার কৃষিকার্য্যে যুগান্তর আনয়ন করিবেন।

গোবর সম্বন্ধে একটী কথা না বলিলে প্রবন্ধটী অসম্পূর্ণ থাকিবে। ইন্ধনের জন্য গোবর ব্যবহার প্রথা বন্ধ করিয়া যদি শুধু সারের জন্যই ইহা ব্যবহার করা হয়, তবে তদ্দ্বারা দেশের কৃষিকার্য্যের প্রভূত উন্নতি হইবে। গোবর ইন্ধনস্বরূপ ব্যবহার করিলে, উহার নাইট্রোজেনের অংশ তাপ দ্বারা বিশ্লিষ্ট হইয়া পুনরায় বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশ্রিত হয়, কাজেই এই উৎকৃষ্ট নাইট্রোজেনের সার অন্যায়রূপে অপচয় প্রাপ্ত হয়। অতএব যাহাতে লোকে গোময় ইন্ধন-স্বরূপে ব্যবহার না করে ও যাহাতে উহার পরিবর্ত্তে কয়লার প্রচলন হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা দেশের কৃষির উন্নতিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।